বাংলাদেশের আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি

এবনে গোলাম সামাদ

বাংলাদেশের আদিবাসী
এবং
জাতি ও উপজাতি

এবনে গোলাম সামাদ

পরিবেশ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের আদিবাসী এবং জাতি ও উপজাতি
এবনে গোলাম সামাদ

প্রকাশক ☐ পরিলেখ
ঐশিক, আব্দুল হক সড়ক,
রাণীনগর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।
০১৭১৭৭২৫৬৮১; ০১৯১৩৩৬৪৫৪৫

প্রথম প্রকাশ ☐ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণ ☐ একুশে বইমেলা ২০১৬
গ্রন্থস্বত্ব ☐ জাহানারা বেগম
প্রচ্ছদ ☐ ইয়াহিয়া সেলিম
প্রচ্ছদের পোড়ামাটির নকশাকলা নেয়া হয়েছে
চাঁপাই নবাবগঞ্জের সুলতানী আমলের
খঞ্জনদিঘি মসজিদ'র দেয়াল থেকে।

অক্ষরসজ্জা ☐ এস এম ইসলাম
মুদ্রণ ☐ পদ্মা অফসেট প্রেস
মালোপাড়া,রাজশাহী

মূল্য ☐ দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

পরিবেশক ☐ # **বুক পয়েন্ট**, সোনাদিঘির মোড়,
রাজশাহী। ০১৫৫৮৮৬০৭৭০
বাতিঘর, চট্টগ্রাম।
০১৭৩৩০৬৭০০৫

Bangladesher Adibasi Abong Jati O Upojati by Abney Golam Samad. Published by Porilekh, Oishik, Abdul Huq Road, Raninagar, Ghoramara, Rajshahi, Bangladesh. February 2016, Cover: Yeahia Salim. Price: Tk. 250.00 only.

ISBN-978-984-8867-49-5

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সুহৃদ নাজিব ওয়াদুদ

ও

আমার ছাত্রপ্রতিম মঈন শেখ-কে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কিছু সাধারণ কথা

নৃ-তত্ত্ব বলতে বোঝায় মানব জ্ঞানের সেই শাখাকে, যার আলোচ্য বিষয় হল মানুষ ও তার সংস্কৃতির উদ্ভব বৃত্তান্ত। রাজনীতি শাস্ত্রে নৃ-তত্ত্ব প্রভাব ফেলেছে এবং ফেলছে। আর সেই সুবাদে একটা দেশের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায় পড়তে পারছে নৃ-তত্ত্বের ছাপ। নৃ-তত্ত্বে জাতি (People) বলতে বোঝায় এমন মানব সমষ্টিকে, যারা বাস করে একটি নির্দিষ্ট ভুখণ্ডে, যে ভুখণ্ডকে তারা মনে করে স্বদেশ (Homeland)। জাতির সঙ্গে স্বদেশের ধারণা ওতপ্রতভাবে গ্রথিত। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির কথা ভাবা যেতে পারে না। জাতি হতে হলে থাকতে হয় একটা স্বদেশ ভূমি অর্থাৎ আশ্রয়স্থল। উপজাতি (Tribe) বলতে নৃতত্ত্বে বোঝায় এমন জনসমষ্টিকে যাদের আছে একটা নিজস্ব ভাষা। কিন্তু ভাষাটি লিখিত নয়। সাঁওতাল, গারো, খাসিয়া প্রভৃতি জনসমষ্টির ছিল এবং আছে নিজ নিজ ভাষা। কিন্তু এসব ভাষার কোন বর্ণমালা ছিল না। এসব ভাষা ছিল কেবলই মুখের ভাষা (Speech) বা উক্তি। উক্তি, ভাষা (Language) হয়ে ওঠে তখনই, যখন তা পেতে পারে লিখিত রূপ। সাঁওতালী, গারো, খাসিয়া এখন পরিণত হয়েছে উক্তি থেকে ভাষায়। এসব ভাষা এখন লিখিত হচ্ছে রোমক বর্ণমালায়। বিদেশী খৃস্টান মিশনারীরা এসব ভাষাকে লিখিত পর্যায়ে উন্নিত করেছেন। এটা খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে হতে পেরেছে এর সূচনা। ইউরোপীয় খৃস্টান মিশনারীদের কাছে বর্তমান বাংলাভাষাও ঋণী। কারণ তারাই প্রথম করেছেন বাংলা ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু বাংলাভাষা এর অনেক আগেই হয়ে উঠেছিল একটি লিখিত ভাষা। এর ছিল আপন লিপি। বাংলাভাষী মানুষকে তাই নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলতে হয় জাতি। উপজাতি কথাটা তার ক্ষেত্রে মোটেও প্রয়োজ্য নয়। বাংলাভাষী মানুষকে তাই কোন নৃতাত্ত্বিক চিহ্নিত করতে চাননি উপজাতি হিসাবে। নৃতত্ত্বে প্রাক-অক্ষর (Preliterate) আর নিরক্ষর (Illiterate) শব্দ দুটি সমার্থক নয়। নিরক্ষর বলতে বোঝায় সেইসব মানুষকে, যারা একটি ভাষায় কথা বললেও ভাষাটিকে তারা লিখতে পড়তে জানে না। কিন্তু প্রাকঅক্ষর বলতে বোঝায় এমন জনসমষ্টিকে, যারা যে ভাষায় কথা বলে, সেটা লিখিত ভাষা নয়। জাতি ও উপজাতি নিয়ে আলোচনা করবার সময় মনে রাখতে হয় নিরক্ষর ও প্রাকঅক্ষরের মধ্যে পার্থক্য। যেটা আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত বিস্মৃত হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে, জাতি ও উপজাতি প্রসঙ্গে তাদের লেখা পড়ে। নৃ-তত্ত্বে যাদের বলা হয় আদিম জাতি (Primitive People), তারা হল এমন মানব সমষ্টি যারা পড়ে আছে বা কিছুদিন আগেও পড়ে ছিল প্রস্তর অস্ত্রের যুগে। এরা কেউ কোন প্রকার ধাতুর ব্যবহার জানত না। যেমন আস্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম জাতি। এরা ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আসার আগে পশু শিকার করত যে বর্শা দিয়ে তার ফলা ছিল তীক্ষ্ণ পাথরের। কিন্তু বাংলাদেশে কোন উপজাতিকে নৃতাত্ত্বিক অর্থে বলা

www.pathagar.com

যায় না আদিম। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের চেহারার কিছু সাদৃশ্য আছে আস্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের (Aborigine) সঙ্গে। কিন্তু এরা বহুদিন আগে থেকে ব্যবহার করছে লোহার তৈরি অস্ত্র। বনের গাছ কাটবার জন্যে ব্যবহার করছে লোহার তৈরি দা, কুড়াল। মাটিতে চাষাবাদ করবার জন্যে ব্যবহার করছে বলদে টানা লাঙল। যার ফাল হল লোহার। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের মধ্যে লোহার কামার নেই। কিন্তু তারা লোহা দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র কিনেছে তাদের চারপাশের বৃহত্তর জনসমাজের কর্মকারদের কাছ থেকে। আমাদের দেশে কোন উপজাতির ক্ষেত্রে তাই আদিম কথাটা প্রয়োগ করা হচ্ছে ভুলভাবে। যা সৃষ্টি করছে বিভ্রান্তি।

সব মানুষকে নৃতাত্ত্বিকরা স্থাপন করেন একই মানব প্রজাতিতে(Species)। যার বৈজ্ঞানিক নাম হল Homo sapiens। সব মানুষকে এক প্রজাতিতে স্থাপন করা হয়। কারণ, সর্ব প্রকার মানুষের মধ্যে যৌন মিলনের ফলে যে মানব শিশুর জন্ম হয়, তারা হয় সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক প্রজনন শক্তি সম্পন্ন। কিন্তু সব মানুষ এক প্রজাতিভূক্ত হলেও তারা সকলে দেখতে একরকম নয়। তাদের দেখে ভিন্ন মনে হয়। চেহারার দিক থেকে মানুষকে মোটামুটি চারটি প্রকারে (Varity) ভাগ করা হয়। এই প্রকারগুলিকে আবার ভাগ করা হয় উপ-প্রকারে। যাকে অনেকে বলেন মানব ধারা (Recial type)। চার বড় প্রকার হলঃ ককেশীয়, মঙ্গলীয়, নিগ্র এবং অস্ট্রালয়েড। ককেশীয়দের গায়ের রং সাধারণত হয় সাদা অথবা হালকা বাদামী। তবে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নয়। ককেশীয়দের দেহে লোমের পরিমাণ বেশি। তাদের মুখে যথেষ্ট দাড়িগোঁফ থাকে। তাদের মাথার চুল হল মসৃণ ও ঢেউ খেলানো। চোখ আয়ত। নাক সাধারণত হল চিকন ও তার অগ্রভাগ হল উন্নত। এদের ঠোঁট হল পাতলা। আর মুখের আদল হল সমকোণী অর্থাৎ খাড়া (Orthognathus)। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ পড়ে মানুষের এই প্রকারের মধ্যে।

মঙ্গলীয়দের গায়ের রং সাধারণত হয় পীতাভ। তাদের গালের হাড় হল উঁচু। যাকে বলে যায়গোমরফিক আর্চ (Gygomorphic arch), তা উঁচা হওয়ায় এদের মুখমণ্ডল হয় চওড়া। কপালের কাছে নাকের (Nasion) উচ্চতা অক্ষি কোটর থেকে বেশি হয় না। তাই এদের মুখমণ্ডল দেখে মনে হয় সমতল। এদের চোখের ওপর পাতায় থাকে বিশেষ ধরণের ভাঁজ (Epicanthic fold)। তাই এদের চোখ দেখে মনে হয় ছোট ও বাঁকা। এদের দেহে লোমের পরিমাণ হয় কম। পুরুষের মুখে দাড়ি-গোঁফ হয় না বললেই চলে। এদের মাথার চুল মসৃণ নয়, সোজা ও খড়খড়ে। এরকম মানুষ বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে বেশকিছু সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু মোটের ওপর বাংলাভাষাভাষী মানুষকে অর্থাৎ জাতিকে স্থাপন করা যায় না মঙ্গলীয় প্রকারে। তাদের ধরতে হয় ককেশীয় প্রকারভুক্ত হিসাবে। নিগ্রদের চুল হল পশমের মত পাক খাওয়া। এদের গায়ের রং খুব কালো। এদের ঠোঁট পুরু এবং উল্টানো। এদের নাকের অগ্রভাগ হল মাংসল। মুখমণ্ডল হল অগ্রপ্রসারিত (Prognathic face)। এরকম মানুষ বাংলাভাষাভাষী মানুষের মধ্যে খুব

www.pathagar.com

একটা চোখে পড়ে না। তবে সুন্দর বনের বিশেষ মেছো সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং যশোর অঞ্চলের বাঁশফোঁড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে এরকম মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলাদেশে মূল জনসমষ্টির মধ্যে নিগ্র প্রভাব থাকলে বলতে হবে খুব সামান্যই আছে।

অস্ট্রালয়েডদের গায়ের রং খুব কালো। তবে তাদের মাথার চুল নিগ্রদের মত পাকখাওয়া নয়। এদের মাথার চুল যথেষ্ট ঘন ও মোটা। ভ্রুর হাড়(Brow ridge) উঁচু এবং কপালের মধ্যভাগ বেশ কিছুটা নিচু। যার বিশেষ দৃষ্টান্ত হল অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা। এদের সঙ্গে চেহারার কিছুটা মিল পাওয়া যায় সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা, সবর এবং হো-দের মত উপজাতিদের। তাই এদেরকে অনেকেই বলেন ইন্ডো-আস্ট্রালয়েড (Indo-Australoid)। মানব প্রজাতির এই প্রকার বিভাগের কথা উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মনে রাখতে হয়। কারণ, বাংলাদেশে এখন সাধারণত যাদের উল্লেখ করা হচ্ছে উপজাতি হিসাবে তারা প্রধানত হল ইন্ডো-আস্ট্রালয়েড ও মঙ্গলীয় মানব প্রকারভুক্ত, ককেশীয় মানব প্রকারভুক্ত নয়। এ হল বাংলাদেশের মানুষের জীবতাত্ত্বিক রূপ।

মানব প্রকারের পর বিশেষভাবে বিবেচনায় আসে একটা দেশের মানুষের ভাষার কথা। বাংলাদেশের মানুষর পরিচয় বাংলাভাষা দিয়ে। এই উপমহাদেশের ভাষাগুলিকে বৃটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ গ্রিয়ারসন স্থাপন করেছেন প্রধানত চারটি ভাষা পরিবারে। এরা হল: ইন্ডো-ইউরোপীয়, দ্রাবিড়, চীনা- তিব্বতী (Sino-Tibetan), এবং অস্ট্রিক (Austric)। কিন্তু বর্তমানে অস্ট্রিক ভাষা পরিবার নিয়ে উঠেছে অনেক বিতর্ক। গ্রিয়ারসন সাঁওতাল, মুণ্ডাদের ভাষাকে স্থাপন করেছিলেন অস্ট্রিক পরিবারে। তিনি খাসিয়াদের ভাষাকেও স্থাপন করেন অস্ট্রিক ভাষা পরিবারে। কিন্তু বর্তমানে খাসিয়া ও সাঁওতাল ভাষার মধ্যে কোন যোগাযোগ আছে বলে মনেকরা হচ্ছে না। সাঁওতালি ও মুণ্ডাদের ভাষাকে ধরা হচ্ছে একটি পৃথক পরিবারভুক্ত ভাষা হিসাবে। গ্রিয়ারসন চীনা-তিব্বতী ভাষা পরিবারকে দু'টি বড় উপ-পরিবারে বিভক্ত করেছেন। যার একটিকে তিনি বলেছেন, টিবেটো-বার্মান (Tibeto-Burman), এবং আর একটিকে বলেছেন- শ্যামীজ-চায়নিজ (Siamese-Chinese)। টিবেটো বার্মান উপ-পরিবারে পড়ে বোড়, মেচ, কাছারি, গারো, টিপরা প্রভৃতি মানব সমষ্টির ভাষা। যাদের এক সময় বিশেষভাবে বলা হয়েছে উপজাতি। মানবধারা ও ভাষা পরিবারের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই পার্থক্য থাকতে দেখা যায়। যেমন- সাঁওতাল এবং ওঁরাওরা মানবধারার দিক থেকে হল এক। কিন্তু সাঁওতালরা কথা বলে মুণ্ডারী বা কোলবংশীয় ভাষায়। কিন্তু ওঁরাওরা কথা বলে দ্রাবিড় বংশীয় ভাষায়। বাংলাভাষাকে সাধারণত স্থাপন করা হয় ইন্ডো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারে। কিন্তু বাংলাভাষার ব্যকরণের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায় দ্রাবিড় ভাষা পরিবারভূক্ত ভাষার সাথে। যেমন বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠন করা চলে। দ্রাবিড় পরিবারভুক্ত ভাষাতেও

www.pathagar.com

ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠন করা চলে। কিন্তু ইন্ডো-ইউরোপীয় পরিবারভূক্ত ভাষায় এরকম করা চলে না। অথচ বাংলাভাষাকে স্থাপন করা হয় ইন্ডো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারে। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতির সঙ্গে দ্রাবিড় ভাষাভাষী মানুষের সংস্কৃতির অনেক সাদৃশ্য থাকতে দেখা যায়। যেমন, বাংলাদেশের মানুষ সাধারণত সিদ্ধ চালের ভাত খায়। দ্রাবিড় ভাষাপরিবারভূক্ত মানুষরাও আহার করে সিদ্ধ চালের অন্ন। একটা জাতিকে বিচার করতে হলে আসে মানবধারার প্রশ্ন। আসে ভাষার প্রশ্ন। আসে সনাতন খাদ্যাভ্যাসের প্রশ্ন।

একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে এক একটি খাদ্যশস্যকে নির্ভর করে। আমাদের সভ্যতা গড়ে উঠেছে মূলত খাদ্যশস্য ধানকে নির্ভর করে। বাংলাদেশে খাল-বিল, নদী-নালা, জলাশয়ের ধারে বন্যধান (Oryza sativa var fatua) আপনা থেকেই জন্মায়। এই বন্যধান থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভব হতে পেরেছে আবাদী ধানের (Oryza sativa)। অনেকে মনে করছেন, প্রচীনকালে ধানচাষ আরম্ভ হতে পেরেছিল বাংলাদেশে। এখন অনেক নৃতাত্ত্বিক মনে করেন, পশুচারিক মানুষ নয়, মৎস্যজীবী মানুষই প্রথম আরম্ভ করে কৃষিকাজ। মানুষ যেখানে মাছধরার ভাল সুযোগ পেয়েছে, সেখানে গড়েছে স্থায়ী জনপদ। আর এইসব স্থায়ী জনপদে প্রথম আরম্ভ হতে পেরেছে কৃষিকাজ। বাংলাদেশের বহু অঞ্চল গঠিত হয়েছে নদীবাহিত পলিমাটি জমে। এইসব জায়গায় প্রথম উপনিবিষ্ট হয়েছে মৎস্যজীবী মানুষ। যারা এক পর্যায়ে হয়ে উঠেছে আবার কৃষিজীবী। বাংলাদেশে যাদের এখন বলা হচ্ছে 'উপজাতি' তারা বাংলাভাষী মানুষের মত মাছ-ভাতের উপর অতটা নির্ভরশীল নয়। মাছ-ভাত এদেশের বৃহত্তর অ-উপজাতি বাংলাভাষী মানুষের সংস্কৃতির বিশেষ পরিচায়ক। এখনো নতুন চর অঞ্চলে যেয়ে উপনিবেষ্টিত হচ্ছে বাংলাভাষী মানুষ। ধর্মে যারা হচ্ছে অধিকাংশই মুসলমান। তারা চরাঞ্চলে গড়ে তুলেছে জনবসতি। করছে চাষাবাদ। আর আবাদ করছে প্রধানত ধানের। বাংলাদেশে যাদের বলা হচ্ছে উপজাতি, তাদের কাউকে এভাবে চরাঞ্চলে যেয়ে চাষাবাদ করবার উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে না। এ বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হচ্ছে এই জন্যে যে, বাইরের বিশ্বে প্রচার করা হচ্ছে এই বলে যে, বাংলাভাষী মুসলমান জোর করে দখল করছে উপজাতিদের জমি। কিন্তু তারা উপনিবিষ্ট হচ্ছে চরাঞ্চলে। তাই উপজাতিদের জমি দখলেন বৃত্তান্তকে বলতে হয় বানোয়াট।

একটি জাতি গড়ে ওঠে ইতিহাসের ধারায়, বিভিন্ন ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে। সাবেক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মুসলিম জাতীয়তাবাদকে নির্ভর করে। যার উদ্ভব হতে পেরেছিল এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনামলে বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে। পরে সাবেক পাকিস্তান ভেঙে উদ্ভব হতে পেরেছে বর্তমান বাংলাদেশের। রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব তাই বিশেষভাবে নির্ভর করছে মূলত বাংলাদেশের বাংলাভাষী মুসলমানের রাষ্ট্রিক চেতনা ও মন মানসিকতার ওপর। এই উপমহাদেশে সভ্য মানুষ ও

www.pathagar.com

বনে থাকা মানুষ পাশাপাশি বাস করে আসছে অনেক প্রাচীনকাল থেকে। সময়ের দিক থেকে কাউকেই বলা চলে না কে আদিবাসী। সভ্য মানুষ বনবাসী মানুষকে বনে বাস করতে বাধ্য করেনি। বনে থাকা মানুষ নিজেরা ইচ্ছা করেই থেকেছে বনে। কিন্তু সব দেশের ইতিহাস এরকম নয়। উত্তর আমেরিকার ফ্লোরিডাতে বাস করত সেমিনোলরা (Seminoles)। এরা ছিল কৃষিজীবী। বিলাত থেকে সাদা মানুষ ফ্লোরিডায় যেয়ে কেড়ে নেয় এদের জমিজমা। এরা বনে বাধ্য হয় পালিয়ে যেতে। আর হয়ে ওঠে বন্য বনবাসী মানুষ। আমাদের এরকম কোন ইতিহাস নেই।

আমি বাংলাদেশে সৃষ্ট 'উপজাতি সমস্যা' নিয়ে দৈনিক পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ লিখেছিলাম। যা বর্তমান পুস্তিকায় ছাপা হচ্ছে একত্রিত করে। আমি প্রবন্ধগুলি লিখেছিলাম উপজাতি সমস্যা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে। আর এখন এদের একত্র করে পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে সেই একই উদ্দেশ্যে। এসব প্রবন্ধে কিছু ঘটনা একাধিকবার উল্লেখ আছে। কারণ, প্রবন্ধগুলি ছাপা হয়েছিল বিভিন্ন সময়ে, পৃথক পৃথকভাবে; বইয়ের অধ্যায় হিসাবে নয়।

***

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০১৩ সালে। বর্তমান সংস্করণে অনেককিছু যোগ করে একে হালনাগাদ করা হলো। তবে মূল কাঠামোতে কোন রদবদল করা হয়নি। আগের মতই এই সংস্করণের মূল লক্ষ্য হলো নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের জাতিসত্তার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি।

২০১২ সালে প্রকাশিত হয় শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। বইটি তখন বর্তমান লেখকের হাতে পড়েনি। লেখক মনে করেন যে, এই বইতে এমন অনেক তথ্য আছে, যা আমাদের জাতিসত্তার বিশেষতা উপলব্ধিতে সাহায্য করে। বর্তমান বইয়ের পাঠকরা শেখ মুজিবের অসাপ্ত জীবন-কাহিনী পাঠ করলে উপকৃত হবেন। আমাদের জাতিসত্তার গঠনে ধর্ম পালন করেছে একটি বিশেষ ভূমিকা। ভাষা আমাদের জাতিসত্তা গঠনের একটি মূল্যবান উপাদান, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। শেখ মুজিব তাঁর জীবন-কথায় এটা স্বীকার করেছেন। শেখ মুজিব বাঙালি জাতির শ্রষ্ঠা নন, তিনি হয়েছেন বাঙালি জাতির মধ্যেই সৃষ্টি। নেতারা যেমন রচনা করেন ইতিহাস, তেমনি আবার তাদের উদ্ভব হয় ইতিহাসের ধারায়।

এবনে গোলাম সামাদ

নছিরন ভিলা
সিপাইপাড়া, রাজশাহী।
০৮ / ০২ / ২০১৬

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তিন পার্বত্য জেলা / ১৫
উপজাতি সমস্যা জটিল করা হচ্ছে / ২০
পাহাড়ি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা / ২৫
ইতিহাসের পটে আরাকান - বাংলাদেশ / ২৮
রোহিঙ্গা মুসলিম সমস্যা / ৩৫
উপজাতি নিয়ে রাজনীতি / ৪১
উপজাতি প্রসঙ্গে আরো কথা / ৪৯
উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে / ৫৭
আদিবাসী দিবস / ৬১
বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম / ৬৭
বাংলাদেশে বৌদ্ধ মুসলিম সম্পর্ক / ৭১
চাকমা রাজনীতিতে হিন্দুত্ব / ৭৭
মহেশখালী দ্বীপের আয়তন বাড়ছে / ৮৫
জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে / ৮৯
বাংলাদেশে বাংলাভাষী মানুষই আদিবাসী / ৯৩

বিবিধ প্রসঙ্গ

আর্য ও অনার্য / ৯৯
বর্ণাশ্রম / ১০১
বাঙালির উৎপত্তি / ১০১
অস্ট্রিক জাতি / ১০২
জাতি গঠনে ধর্ম / ১০৪
আমাদের ইতিহাসের আদিপর্ব / ১০৭

পরিশিষ্ট

আত্মদর্শন / ১১০

পরিশিষ্ট- ২

আমাদের জাতিসত্তার উৎস সন্ধানে / ১১৭

পরিশিষ্ট - ৩

শান্তি চুক্তি দেশের সংঘাত ডেকে আনছে / ১২৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইতিহাসের প্রেক্ষিতে তিন পার্বত্য জেলা

পত্রিকায় খবরে প্রকাশ, তিন পার্বত্য জেলা থেকে বর্তমান সরকার সৈন্য প্রত্যাহার করছে। কিন্তু এরকম প্রত্যাহার হতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই ক্ষতির কারণ। চাকমারা স্বাধীন হতে চাচ্ছে। সৈন্য অপসারণ তাদের স্বাধীন হবার স্প্রিহাকে উৎসাহ দিতে পারে। যার ফলে সৃষ্টি হতে পারে চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে গৃহ যুদ্ধের অবস্থা। অনেক চাকমা ভারতে যেয়ে নিয়েছেন অস্ত্রচালনায় প্রশিক্ষণ। ভারত চাচ্ছে তিন পার্বত্য জেলায় উপনিবেশ সৃষ্টি করতে। ভারত তার আপন স্বার্থে চাকমাদের দিয়ে ঘটাতে পারে অনেক অঘটন। দাবি করা হচ্ছে পার্বত্য তিন জেলার ইতিহাস বাংলাদেশের মূল ইতিহাস থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন। তাই এই তিন পার্বত্য জেলা বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার একটা ঐতিহাসিক ভিত্তিও রাখে। কিন্তু এই অঞ্চলের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা যে এই যুক্তির পিছনে তথ্য দিতে পারি, তা নয়। কারণ ইতিহাসের অনেক ঘটনার সাহায্যে প্রমাণ করা চলে যে, বাংলাদেশ ঐতিহাসিক ভাবেই দাবি করতে পারে এই অঞ্চলের উপর তার অধিকার।

আরাকানের ইতিহাস অণুসারে সে দেশের রাজা ব্রহ্মাদেশের (বর্মা) রাজার কাছে হেরে যেয়ে পালিয়ে আসেন গৌড়ের সুলতানের কাছে। গৌড়ে তখন রাজত্ব করছিলেন সুলতান জালাল উদ্‌দীন মুহম্মদ শাহ। আরাকানের এই রাজার নাম হল মেং সোআম্‌উন ওরফে নরমেইখ্‌লা। তিনি গৌড়ের সুলতানের সহায়তায় ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে ব্রহ্ম দেশের রাজাকে পরাজিত করে তার হৃত রাজ্য উদ্ধারে সক্ষম হন। কিন্তু গৌড়ের সুলতানের উপকারের বিনিময়ের কারণে তাকে হতে হয় গৌড়ের সামন্ত রাজা। আরাকানের উপর কার্যত প্রতিষ্ঠা পায় গৌড়ের নিয়ন্ত্রণ। চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসন করেছেন গৌড়ের একাধিক সুলতান। এটার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ অঞ্চলের প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে। পরে এক পর্যায়ে আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম দখল করেন। কিন্তু তিনি তার দখল বজায় রাখতে সক্ষম হন না। চট্টগ্রাম অঞ্চল আসে মুঘল নিয়ন্ত্রণে এবং মুঘল আমলে চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ইসলামাবাদ। এই অঞ্চলের উপর তাই ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে বর্তমান বাংলাদেশ তার একটা ঐতিহাসিক যোগসূত্র অনেক সহজেই প্রমাণ করতে পারে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইজারা পায় নবাব মীর কাসেমের কাছ থেকে ১৭৬০ সালে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইজারা পায়, তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে কোন জেলা ছিল না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি হয় ১৮৬০ সালে বৃটিশ শাসন আমলে; তার আগে নয়। বৃটিশ শাসন আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকেছে তখনকার বাংলা প্রদেশেরই অংশ। এর আগে ১৮২২ সালে পাশ হয় ১০নং রেগুলেশন। যাতে বলা হয়, বাংলা প্রদেশের সব জেলার মানুষ যথেষ্ট সভ্য নয়।

www.pathagar.com

যেসব জেলার মানুষ যথেষ্ট সভ্য নয়, তাদের শাসন ও সংরক্ষণ প্রণালী হতে হবে বাংলা প্রদেশের সভ্য অগ্রসর জেলা থেকে ভিন্ন। অতীতে এক সময় বাংলার যেসব জেলার মানুষকে ধরা হয় কম সভ্য তারা হল তখনকার রংপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। রংপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে (মহল) বলা হত নন-রেগুলেশন জেলা। এসব জেলার শাসনভার ন্যাস্ত ছিল একজন করে ডেপুটি কমিশনারের উপর। যারা এইসব জেলা শাসন করতেন, অন্য জেলার থেকে পৃথক আইন অনুসরণ করে। পরে রংপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিংকে ঘোষণা করা হয় অন্য জেলার মতই সাধারণ জেলা এবং তারা শাসিত হতে থাকে অন্য জেলার মত একই আইনে। কেবল মাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম থাকে নন রেগুলেশন জেলা হয়। নন-রেগুলেশনের ধারণাটা কোম্পানীর শাসনামলে সৃষ্টি হতে পেরেছিল জেলাগুলির মানুষ সভ্যতার কোন পর্যায়ে আছে, সেটাকে বিবেচনায় রেখে। অনেকে বলছেন, ইংরেজ আমলে যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রামের একটা পৃথক সত্ত্বা স্বীকৃত হয়েছিল, তাই এখনও সেই পার্থক্যটাকে বজায় রাখা উচিত। কিন্তু আজকের পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীরা সাধারণভাবে বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মানুষের থেকে আর আগের মত কম সভ্য নয়। তাই তাদেরকে এখন আর পৃথক ভাববার যুক্তি কোথায়? চাকমারা যে ভাষায় কথা বলেন তা হল চট্টগ্রামের বাংলা ভাষারই একটা বিশেষ রূপ। ভাষার দিক থেকে যে তারা অন্যদের তুলনায় ভিন্ন হয়ে আছেন তা নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণ আদর্শ বাংলাই এখন হয়ে উঠেছে তাদের শিক্ষা ও ভাব প্রকাশের ভাষা। চাকমারা এখন সাহিত্য চর্চা করছেন আদর্শ চলতি বাংলায়। যা বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা নয়। চাকমাদের সম্পর্কে একটু বিশদ হওয়া প্রয়োজনঃ চাকমারা দাবী করেন, তারা সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার আদিবাসী। কিন্তু ইতিহাস এই দাবির সমর্থন জোগায় না। ১৭৭৩ সালে চাকমাদের নেতা শেরমস্ত খাঁ আরাকান থেকে পালিয়ে এসে মুঘল অনুগত্য গ্রহণ করেন। এসময় থেকে প্রথম চট্টগ্রামে আরাকান থেকে আসা শুরু হয় চাকমাদের; এর আগে থেকে নয়। শেরমস্ত খাঁ নামটা মুসলমানী। তার নাম কেন মুসলমানী হল, সেটা বুঝতে হলে জানতে হবে আরাকানের ইতিহাস সম্বন্ধে। আরাকানের ইতিহাসে দেখা যায়, আরাকানের অনেক রাজার দু'টি করে নাম থাকতে। একটি নাম আরাকানী, আর একটি নাম মুসলমানী, অর্থাৎ আরবী ফারসীতে। আমরা বলেছি, আরাকান রাজা, ব্রহ্মের রাজার কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে আসেন গৌড়ের সুলতানের কাছে। পরে তিনি গৌড়ের সুলতানের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে আরাকান রাজা পুণর্দখল করতে পারেন। আর এরপর থেকেই আরম্ভ হয় আরাকানী রাজাদের একটি নাম আরাকানী ভাষায় এবং সেই সঙ্গে আরেকটি নাম আরবী ফারসী ভাষায় রাখা। এই প্রথা চলেছিল বেশ কয় পুরুষ ধরে। মনে হয় এই প্রথার প্রভাব চাকমা সর্দারদের উপরও এসে পড়েছিল। আরবী ফারসী নাম তাদের কাছে বিবেচিত হতে পেরেছিল

www.pathagar.com

মর্যাদার প্রতীক হিসাবে। চাকমা সর্দাররা সকলেই মুঘল শাসনের উপর অনুগত্য দেখিয়েছেন। মুঘল শাসকদের তারা খাজনা দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপন্ন তুলার মাধ্যমে। কিন্তু আজ চাকমারা বলছেন তাদের রাজারা ছিল আসলে স্বাধীন। যেটা যথাযথ ইতিহাস নয়। চাকমা সর্দাররা মুঘোল শাসকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন ফারসী ভাষার মাধ্যমে; বাংলা ভাষার মাধ্যমে নয়। কিন্তু চাকমারা ক্রমে চট্টগ্রামের বাংলা শিখতে বাধ্য হয় চট্টগ্রামবাসীর সঙ্গে হাটে-বাজারে চলতে গিয়ে। ব্যবসা বাণিজ্য করতে গিয়ে। ক্রমে চট্টগ্রামের বাংলাই হয়ে উঠে তাদের আপন ভাষা। চাকমা সর্দার ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে পেতে পারেন রাজা উপাধি এবং সামান্য কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা। কিন্তু তিনি কোনভাবেই সার্বোভৌম শাসক ছিলেন না। যে কারণেই হোক চাকমা সরদার বা রাজারা ইংরেজ আমলে নিজেদের নাম রাখতে শুরু করেন হিন্দু কায়দায়। তারা মনোভাবের দিক থেকে বেশ কিছুটা হয়ে উঠেন হিন্দু ভাবাপন্ন। চাকমা রাজবংশে শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৯৩৮ সালে চাকমা রাজকুমার কোকনদা রায় সর্বপ্রথম এম.এ পাশ করেন। তিনি তার এম.এ করেন বাংলায়। ১৯৪৭ সালে হয় পাকিস্তান। পার্বত্যচট্টগ্রাম জেলা যুক্ত হয় সাবেক পাকিস্তানের সঙ্গে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সাবেক পাকিস্তানে যুক্ত হয়েছিল র‍্যাডক্লিফ-এর রোয়েদাদ অনুসারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল সাবেক পাকিস্তান জোর করে সৈন্য পাঠিয়ে দখল করে নি। তাই এটা কোন অধিকৃত অঞ্চল বলে বিবেচিত হতে পারে না। আজকের বাংলাদেশ হয়েছে সাবেক পাকিস্তান ভেঙ্গে। আর তাই ঐতিহাসিকভাবেই সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হতে পেরেছে বর্তমান বাংলাদেশের অংশ। বাংলাদেশের সংবিধান বলে, বাংলাদেশের সব নাগরিকের সমান অধিকার। কিন্তু চাকমারা দাবি তুলছেন সমতল থেকে কেউ যেয়ে তিন পার্বত্য জেলার কোন অঞ্চলে জমি কিনতে পারবে না। যেটা হল আমাদের সংবিধান বিরোধী। পার্বত্য তিন জেলার অধিবাসীরা যেমন বাংলাদেশের যেকোন অঞ্চলে যেয়ে বাস করবার অধিকারী তেমনি একইভাবে অধিকার থাকতে হবে বাংলাদেশের যে কোন জেলা থেকে বাংলাদেশের যেকোন নাগরিকের পার্বত্য তিন জেলার যে কোন স্থানে বসত করবার; জমি কিনবার, বাড়িঘর বানাবার। ভারতে এখন কোন নন-রেগুলেটরী জেলা আছে বলে আমাদের জানা নেই। যদিও আজ যা ভারত রাষ্ট্র, সেখানেও ইংরেজ আমলে ছিল নন-রেগুলেটরী জেলা। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়, ইংরেজ আমলের বিহারের ভাগলপুর বিভাগের সাঁওতাল পরগনা জেলার কথা।

উপজাতি কথাটার উদ্ভব হয়েছিল ইংরেজ আমলে। উপজাতি বলতে বোঝাতো এমন জনগোষ্ঠি যাদের ছিল না কোন লিখিত ভাষা। যাদের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল বনে-জঙ্গলে ফলমূল আহরণ ও বন্যজন্তু শিকার। আর খালে-বিলে মাছ ধরা। এরা কেউ কেউ মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বীজ বপন করে কিছু কিছু ফসল উৎপাদন করত। কিন্তু এরা কেউই করত না গরুতে টানা লাঙল দিয়ে চাষাবাদ। অর্থাৎ এদের জীবনযাত্রা

www.pathagar.com

পড়েছিল যথেষ্ট আদিম পর্যায়ে। কিন্তু বাংলাদেশে এরকম আদিম পর্যায়ের কোন জনসমষ্টি এখন আর পড়ে নেই। উপজাতি কথাটা এদিক থেকেও হয়ে উঠেছে অপ্রয়োজ্য। এদের সংস্কৃতির ধারা হয়ে উঠছে বৃহত্তর জনসমাজেরই মত। ইংরেজ আমলের সরকারি বিবরণ অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বাস করত এইসব উপজাতিঃ চাকমা, মারমা, ত্রিপুরী, মুরং, তঞ্চঙ্গা, খামি, রিয়াং, খায়াং, বন, পাঙ্খ এবং লুসাই (মিজো)। এর মধ্যে প্রধান হল চাকমা, মারমা, ত্রিপুরী ও মুরং। পাকিস্তান হবার পর প্রথম আদমশুমারী হয় ১৯৫১ সালে। এতে দেখা যায় চাকমাদের সংখ্যা হল ১২৫০০০; মারমাদের সংখ্যা হল ৭০০০০; ত্রিপুরীদের সংখ্যা হল ৪০০০০; আর মুরংদের সংখ্যা হল ১৬০০০। বাদবাকি উপজাতিদের সংখ্যা হল মাত্র কয়েক হাজার করে। এই সব উপজাতি এক ভাষায় কথা বলে না। পার্বত্য চট্টগ্রামে সাধারণ ভাষা হল, চট্টগ্রামের অনুরূপ আঞ্চলিক বাংলা।

সাবেক পাকিস্তান আমলে ১৯৫৯ সালে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কাপ্তাই বাঁধ তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়। এই বাঁধ নির্মাণের ফলে রাঙ্গামাটিতে চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় ২৫৬ বর্গমাইল এলাকায় এক বিরাট কৃত্রিম হ্রদ সৃষ্টি হয়। আর এর ফলে প্রায় লক্ষাধিক চাকমার জমিজমা, বাড়িঘর ডুবে যায়। তারা পরিণত হয় উদ্বাস্তুতে। এই উদ্বাস্তুদের একটি অংশ যেয়ে আশ্রয় নেয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। সেখানে তারা নিতে থাকে সামরিক প্রশিক্ষণ। দাবি ওঠে স্বাধীন উপজাতি দেশ গড়ার। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার সব উপজাতি তাদের সাথে একমত হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা ও মারমাদের মধ্যে রয়েছে প্রবল বিরোধ। আর সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলে কেবল যে উপজাতিরাই বর্তমানে বাস করে এমনও নয়। এখানে এখন বাস করেন বহু বাংলাদেশী মুসলমান। কিন্তু তথাপি এর আগে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার চাকমা নেতা শান্তু লারমার সঙ্গে করেন বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী এক বিশেষ ধরনের চুক্তি। এখন মনে হচ্ছে তখনকার কৃত চুক্তিকেই বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার রূপদান করতে চাচ্ছে, তিন পার্বত্য জেলা থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে। যেটা ছিল সেই চুক্তির একটা অংশ। আর এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে পারে একটা রক্তক্ষয়ি এলাকায় পরিণত। শ্রীলংকায় প্রভাকরণের নেতৃত্বে সেখানে ভারতের তামিলনাড়ু থেকে যেয়ে উপনিবিষ্ট তামিলরা স্বাধীন তামিল ভূমির জন্যে শুরু করে লড়াই। বাংলাদেশেও শন্তু লারমার নির্দেশে তেমন লড়াই যে শুরু হবে না, সেটা কে বলতে পারে? আমরা লড়াই ও রক্তপাত এড়িয়ে যেতেই ইচ্ছুক। কিন্তু বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার দেশকে যেন ঠেলে দিতে চাচ্ছে সেদিকেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম আগে ছিল একটা জেলা। কিন্তু ১৯৮৩ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের তিনটি মহকুমাকে তিনটি জেলায় পরিণত করা হয়েছেঃ খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বন্দরবন। কেবল রাঙ্গামাটিতেই রয়েছে চাকমাদের প্রাধান্য। খাগড়াছড়িতে বাস করেন অনেক ত্রিপুরী আর মারমা। বন্দরবনে রয়েছে

www.pathagar.com

মারমাদের বিশেষ প্রাধান্য। এই তিন পাহাড়ি জেলার এই তিন উপজাতির মধ্যেও থাকছে সংঘাত ঘটার সম্ভাবনা। এই তিন জেলার একত্রে ভৌগলিক ক্ষেত্রফল হলো বাংলাদেশের ক্ষেত্রফলের দশ ভাগের এক ভাগ। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়ে তাই আমরা না ভেবেই পারছি না। বিরোধী দলের উচিত সংসদে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠানো। জানতে চাওয়া উচিত তিন জেলার পরিস্থিতি সম্পর্কে। আর সংসদের বাইরে গড়ে তোলা উচিত হবে আওয়ামী লীগের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রবল গণ আন্দোলন। দেশ রক্ষার শেষ দায়িত্ব সেনা বাহিনীর। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা অপসারণ দেশের সমগ্র প্রতিরক্ষাকে মনে হয় দুর্বল করতেই চাচ্ছে। বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের রয়েছে ২৮৩ কি.মি.-এর কাছাকাছি সাধারণ সীমান্ত। বন্দরবনে বাস করে এমন অনেক উপজাতি যারা মিয়ানমারের 'চীন' বলে পরিচিত স্বায়ত্বশাসিত প্রদেশেও বাস করে। এইসব উপজাতি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে সহজেই করতে পারে আনাগোনা। সেনা প্রত্যাহার করে নিলে বাড়তে পারে মিয়ানমার থেকে উপজাতিদের আসতে পারা। তারা তাদের এখানকার স্বজাতিদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে শুরু করতে পারে লুণ্ঠন। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘটতে পারে খুবই অবনতি।

***

www.pathagar.com

উপজাতি সমস্যা জটিল করা হচ্ছে

সেটা ১৯৪৮ সাল। সবে পাকিস্তান হয়েছে। এদেশের বৃহত্তর জন সমাজের মনে তখন বিশেষভাবে বিরাজ করছে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ। তারা তখন ভাবছিলেন পাকিস্তান অর্জিত হয়েছে আর এই অর্জনকে স্থায়ী করতে হবে। ইলা মিত্র ও তার স্বামী নাচোল থানায় ঘটান সাঁওতাল বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ সেদিন পেতে পারেনি স্বাভাবিক কারণে এদেশের বৃহত্তর জন সমষ্টির কোন সমর্থন। বৃহত্তর জন সমাজের সমর্থন ছাড়া কোন আন্দোলন সাফল্য পেতে পারে না। সাঁওতালরা নাচোল থানা দখল করেছিল, মেরে ফেলেছিল ৩ জন পুলিশসহ থানার দারোগাকে। কিন্তু পরে সাধারণভাবে সাঁওতালদের উপর নেমে এসেছিল পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ; থানা পুণরুদ্ধারের জন্যে। যা ছিল খুবই স্বাভাবিক। সাঁওতালদের আগে এ-দেশে কেউ শত্রুপক্ষ ভাবেনি। কিন্তু তখন থেকে সাঁওতাল ও দেশের বৃহত্তর জনসমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় বিদিষ্ট সম্পর্ক।

উপজাতি সমস্যা আগে এদেশে ছিল না। এটা সৃষ্টি হওয়া শুরু হয় পাকিস্তান হবার পর। এদেশের বামপন্থীরা চান উপজাতিদের নিয়ে আন্দোলন করে দেশে বিপ্লব ঘটাতে। যেটা ছিল খুবই ভ্রান্তনীতি। কারণ, উপজাতি জাতি নয়। এদেশে মুসলিম জনমানসকে তথা কথিত বাম রাজনীতি কখনই উপলব্ধি করতে চায়নি। বাম রাজনীতির ফলে উপজাতি সমস্যার বেড়েছে জটিলতা। আসেনি কোন ব্যবহারিক সমাধান। আমি খুব বিস্মিত হয়েছিলাম একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। রাজশাহী জজকোর্টে ইলামিত্রের পক্ষের উকিল বলেছিলেন, ইলামিত্র হচ্ছেন শিক্ষিত ভদ্র ঘরের মেয়ে। ভদ্র পরিবারের গৃহবধূ। তিনি নিজেও যথেষ্ট শিক্ষিতা। পক্ষান্তরে সাঁওতালরা হল বর্বর আদিম স্বভাব সম্পন্ন। তাদের মধ্যে থেকে গেছে বন্য হিংস্র প্রবণতা। তারা যা করেছে, ইলামিত্র তার জন্যে আদৌ দায়ী নন। তাই তাকে কোন শাস্তি দেওয়া সমীচীন হবে না। তিনি নিরাপরাধ। পরে 'নাচোলের রাণী' নামে সিনেমা হয়েছে আর ইলামিত্রকে দেখানো হয়েছে সাঁওতালদের নেত্রী হিসেবে। বাংলার উত্তরাঞ্চলে গভীর হয়েছে সাঁওতাল সমস্যা। বাংলাদেশ সরকার সিনেমাটিকে পুরুস্কৃত করেছে। এরকম পুরস্কার দেশের বৃহত্তর জনসমাজের জন্যে হয়েছে কতটা মঙ্গলকর সেটা বিতর্কেরই বিষয়। আওয়ামী লীগ সরকার যেন এখন জাতির চাইতে উপজাতির স্বার্থকেই বড় করে দেখছে, কতকটা বামপন্থীদের মত। সে ভাবছে উপজাতিরা পক্ষে থাকলে সে পেতে পারবে একটা লড়াকু শক্তিকে পক্ষে। উপজাতি পাইকরা পারবে আওয়ামী লীগের প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করতে। কিন্তু তাদের এই চিন্তা যে ভুল; অন্যদেশের সমকালীন ইতিহাস থেকে দেওয়া যেতে পারে তার বিশেষ নজির। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেবেছিল, ভিয়েতনামের পার্বত্য উপজাতিদের হাত করে ভিয়েতনাম লড়াইয়ে

www.pathagar.com

জিতবে। কিন্তু তাদের সেই প্রয়াস সাফল্য পেতে পারেনি। এখনো ভিয়েতনামের অনেক উপজাতিকে ভিয়েতনামের বৃহত্তর জনসমাজের আক্রোশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে অতি দুর্গম অরণ্যে। কয়েক বছর আগে একটি ফরাসী টেলিভিশন থেকে দেখানো হয়েছিল এদের জীবন যাত্রার করুন চিত্র। মার্কিনীরা কোনভাবেই এদের সাহায্য করতে পারছে না, আর যেন চাচ্ছেও না। এদের অবস্থা হয়ে পড়েছে তাই যথেষ্ট সঙ্গীন। অন্যদিক থেকে বিচার করলে বলতে হবে, কোন দেশের কোন দল যদি বৃহত্তর জনসমষ্টিকে অবজ্ঞা করে উপজাতি নিয়ে মাতামাতি করে, তবে তা হারাতে বাধ্য ব্যাপক গণসমর্থন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবার ঘোষণা দিয়েছে। এতে করে এদেশের জনমানসে সৃষ্টি হতে পেরেছে আওয়ামী লীগ বিরূপতা। সংশয় জেগেছে আওয়ামী লীগ নেতানেত্রীর মৌলিক দেশপ্রেম নিয়ে। বাংলাদেশের দুইটি বড় উপজাতি হল সাঁওতাল ও চাকমা। সাঁওতালরা সাধারণত বাস করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বরেন্দ্র ভূমিতে। পক্ষান্তরে চাকমারা বাস করে রাঙ্গামাটি জেলায়, যার অবস্থিতি উত্তরাঞ্চল থেকে অনেক দূরে। সাঁওতালরা হল এক বিশেষ মানব ধারার মানুষ। ১৯৩০ সালের আদমশুমারের রিপোর্টে যাদের উল্লেখ করা হয়েছে প্রটো-অস্টালয়েড হিসাবে(আমারা এদের উল্লেখ করতে চাই ইন্ডো-আস্ট্রালয়েড বলে)। অন্যদিকে চাকমারা হল মোঙ্গলীয় মানবধারাভুক্ত। এই দুই উপজাতির মধ্যে নেই কোন রক্তের বন্ধন। সাঁওতালরা কথা বলে মুন্ডা পরিবারভুক্ত ভাষায়। কিন্তু চাকমারা কথা বলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাংলার একটা বিশেষ ধারায়। ভাষাগত কোন মিল নেই এই দুই উপজাতির মধ্যে। যদি কেবল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের কথাই ধরা যায়, তবে বলতে হয় যেখানে আছে প্রায় চৌদ্দটি উপজাতি। যারা এক ভাষাভাষী নয়। যারা একে অপরের ভাষা বুঝতে পারে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সাধারণ ভাব প্রকাশের ভাষা বহুদিন হলোই হয়ে উঠেছে বাংলা। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি সমূহের মধ্যে তিনটি হল প্রধানঃ চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরী। চাকমা ও মারমাদের মধ্যে সদ্বভাব নেই। এদের মধ্যে বিরাজ করছে ঘৃণার সম্পর্ক। আওয়ামী লীগ সরকার যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সৈন্য সরাতে চাচ্ছে, তাতে সৃষ্টি হতে পারে চাকমা-মারমা রক্ত খরা সংঘাত। চাকমা ও মারমারা কোন দিনই ছিল না এক মনোভাবাপন্ন। চাকমারা যেখানে থেকেছে ভারত ঘেঁষা হয়ে, মারমারা সেখানে আত্মীয়তা অনুভব করেছে মিয়ানমারের সঙ্গে।

এবারে আসা যাক, কিছু পুরানো ইতিহাস প্রসঙ্গে। মুঘল আমলে, সুবে বাংলা অনেকগুলি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। যাদের প্রত্যেককে বলা হত, সরকার। সরকারের প্রশাসন চলত ফৌজদারের নিয়ন্ত্রণে। চট্টগ্রাম মুঘল আমলে ছিল ফৌজদারের নিয়ন্ত্রণে একটি সরকার। নবাব মীর কাসেমের সময় ১৭৬০ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী জোর করে এই সরকারের ইজারা বন্দোবস্ত আদায় করে নেয়,

www.pathagar.com

নবাব মির কাশেমের কাছ থেকে। এর ১০০ বছর পর ১৮৬০ সালে গঠিত হয় Chittagang hill tract বা চট্টগ্রামের পার্বত্য মহল। বৃটিশ শাসন আমলে যখন অন্য জেলা শাসন করতেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল ডেপুটি কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে। এখন আমরা ডেপুটি কমিশনার বলতে যা বুঝি, তখন ঠিক তা ছিল না। ডেপুটি কমিশনার একাধারে প্রশাসক অপর দিকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের বিচারক। চট্টগ্রামের পাবর্ত্য মহলকে অন্য জেলা থেকে এভাবে পৃথক করে রাখার একটা কারণ ছিল, বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারীদের অলিখিত অনুরোধ। মিশনারীরা চেয়েছিলেন চট্টগ্রামের পার্বত্য মহলে অবাধে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে। আর এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগীতা পেতে। এ অবস্থা চলেছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হবার আগ পর্যন্ত। চট্টগ্রামের পার্বত্য মহল ছিল জনবিরল অঞ্চল। ঘন বনভূমি পরিপূর্ণ। পাকিস্তান হবার পর আসাম থেকে আসতে থাকে অনেক মুসলিম শরণার্থী। যাদের খাস জমি পত্তনি দেওয়া হতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামে। আর তারা পার্বত্য অঞ্চলে যেয়ে বন কেটে গড়তে থাকে জনপদ। এখন পার্বত্য চট্টগ্রামে কেবল উপজাতিরা যে বাস করে তা নয়। বাস করে বাংলাভাষী মুসলমান। উপজাতিরা এখন সেখানে সংখ্যায় এদের তুলনায় হয়ে পড়েছে অনেক কম। এই অঞ্চল সম্পর্কে যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে বিবেচনায় রাখতে হবে এই বাস্তবতাকে। যেটা রাখা হচ্ছে বলে মনে হয় না। চট্টগ্রামের পাবর্ত্য মহলকে ভেঙে ১৯৮৩ সালে করা হয়েছে তিনটি জেলা। এর মধ্যে চাকমাদের বসতী হল প্রধানত রাঙামাটিতে। আর মারমাদের বসতি হল বান্দরবন এবং খাগড়াছড়িও। ত্রিপুরীরা প্রধানত বাস করে খাগড়াছড়িতে। মারমা ও ত্রিপুরীরা মানতে নারাজ চাকমাদের কর্তৃত্ব।

বৃটিশ আমলে এদেশে বিদেশী খ্রিস্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারে মেনে চলতে হয়েছে অনেক অলিখিত বাধা বিপত্তি। কারণ বৃটিশরা জানত ধর্ম প্রচার নিয়ে সৃষ্টি হতে পারে গোলযোগ। আর তার ধাক্কা এসে লাগতে পারে বৃটিশ প্রশাসনের গায়ে। ১৮৫৭ সালে সেনা অভ্যুত্থান ঘটেছিল অনেক কারণেই। তার মধ্যে একটি কারণ ছিল রাইফেলের কার্তুজে চর্বির প্রলেপ। যে চর্বির প্রলেপ দাঁত দিয়ে কেটে কার্তুজ ঢুকাতে হত তখনকার রাইফেলে ছুঁড়বার আগে। প্রচারিত হয় এই চর্বির প্রলেপে আছে শুকর ও গরুর চর্বির বিশেষ মিশ্রন। যা হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের ক্ষিপ্ত করে তোলে তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করে। এরপর থেকে ইংরেজরা তাই চায় ধর্ম বিরোধকে এড়িয়ে রাজত্ব করতে। তারা চায় না মিশনারীরা এমন কিছু করুক যাতে এদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়। মানুষ এদেশে না খেয়ে মরলে কোন বিদ্রোহ হবে না। তবে তাদের ধর্ম চেতনায় আঘাত করলে হবে বিদ্রোহ। তাই বৃটিশ শাসন আমলে মিশনারীদের সুযোগ সুবিধা দিলেও তাতে থেকেছে নিয়ন্ত্রণ। পাকিস্তান আমলেও খৃস্টান মিশনারীদের ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিদেশী মিশনারীরা যেন হয়ে

www.pathagar.com

উঠছেন অনেকটাই বেপরোয়া। পাকিস্তান হবার পর দলে দলে সাঁওতাল, গারো এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের কিছু ক্ষুদ্র উপজাতিদের খ্রিস্টান করা সম্ভব হয়েছে। আগে যা সম্ভব হয়নি। উপজাতিদের এই খ্রিস্টান হবার ফলে উপজাতি সমস্যা বেড়েছে। আগে কেবল ছিল উপজাতি সমস্যা, এখন তার সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে ধর্মীয় সমস্যা। বলতে হয় এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে কিছুটা সভ্যতার সংঘাতের ধারনা। মুসলিম বনাম ইউরো-খৃস্টান বিশ্বের সংঘাতের ধারণা। ২০০১ সালে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু লারমা) গঠন করেন বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। এই ফোরাম গঠনের জন্যে যখন তিনি রাজশাহী আসেন, তখন তার সঙ্গে দেখা করেন একাধিক সাঁওতাল প্রধান, যারা অধিকাংশই ছিলেন খ্রিস্টান। বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের মধ্যে মার্কিন ক্যাথলিক খ্রিস্টান মিশনারী রিচার্ড টিম বিশেষভাবে খ্যাত। তিনি তার লেখা কোন একটি প্রবন্ধে বলেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলীম অধ্যুষিত অঞ্চল ছিল না। বৃটিশ শাসকরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে যাবার আগে জিন্নাহ সাহেবকে খুশি করবার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে যুক্ত করে সাবেক পাকিস্তানের সঙ্গে। এটা ছিল একটা বড় রকমের ভুল। এই ভুল শোধরাবার সময় সমাগত হয়েছে। সন্তু লারমা নিজেকে কেবল চাকমা নেতা বলেই মনে করেন না। তিনি নিজেকে মনে করেন গৌতম বুদ্ধেরও প্রতিনিধি হিসেবে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার ঠিক পরে পরে এদেশে গঠিত হয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। যা একটি খুব দূরভিসন্ধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে এদেশের বৃহত্তর জনসমাজের মানুষের কাছে। হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃস্টান ঐক্য পরিষদের কার্যকলাপ উপজাতি সমস্যাকে জটিল করে তুলছে। রাজশাহীতে ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আছে। যার নাম হল, কারিতাস। কারিতাসের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ। কিন্তু এর অনেক কার্যকলাপ আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে মাঝে মাঝে যে সব বুলেটিন প্রকাশিত হয় তারই একটিতে আমি পড়েছিলাম রিচার্ড টিমের লেখাটি। এতে জিন্নাহ সম্পর্কে ছিল বিশেষ অশোভন মন্তব্য। জিন্নাহকে খুশি করবার জন্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সাবেক পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল এর কোন নজির তিনি প্রদান করেন নি। বরং আমরা শুনেছি, জিন্নাহ সাহেব রাজি হয়েছিলেন সাবেক পাঞ্জাবের মুসলিম প্রধান গুরুদাসপুর জেলাকে ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রহণ করতে। তাই নেহেরু এই ক্ষেত্রে কোন জোরালো আপত্তি তোলেন নি। গুরুদাসপুর জেলাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে দেওয়া ছিল একটা ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্ত। গুরুদাসপুর জেলা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে কাশ্মির সমস্যার সৃষ্টি হত না। কিন্তু জিন্নাহ বুঝতে পারেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে না আসলে চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। আর তার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি। তাই তিনি নিয়েছিলেন এই সিদ্ধান্ত। দোটানার মধ্যেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন গুরুদাসপুর ছেড়ে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্তকে।

www.pathagar.com

সাঁওতাল ও গারদের মধ্যে ক্যাথলিক মিশনারীরা সবচেয়ে সাফল্য পেতে পেরেছে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম প্রচারে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে খ্রিস্টধর্ম প্রচারিত হতে পারছে প্রধানত প্রটেস্টান্ট, ব্যাপটিস্ট খ্রিস্টান মিশনারীদের কর্মতৎপরতার ফলে। কুকি ও লুসাই উপজাতির প্রায় সকলেই এদের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এদের কাছ থেকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করছে পাঙ্খ ও বনযোগী উপজাতির লোকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের চাইতে ব্যাপটিস্ট মিশন এখনও রাখছে অনেক জোরালো ভূমিকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের ধার ঘেঁষে ভারতের মিজরাম। মিজরাম, মিজোদের আবাসভূমি। লুসাইরা এখন নিজেদের বলে মিজো। মিজোরা প্রায় সকলেই এখন হয়েছে খ্রিস্টধর্মে দিক্ষিত। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা শতকরা এক ভাগের সামান্য কিছু বেশি হল উপজাতি। কিন্তু এরা সকলেই বাস করছে সীমান্ত এলাকায়। সীমান্তের এপারে ওপারে অনেক ক্ষেত্রেই রয়েছে একই উপজাতির বাস। মিজোরা অবশ্য এখন আর উপজাতি বলে বিবেচিত নয়। মিজোরাম এখন ভারতের একটি প্রদেশ। গারোরা যেমন বাংলাদেশে বাস করেন, তেমনি বাস করেন ভারতের মেঘালয় অঙ্গরাজ্যে। তারা সেখানে সংখ্যায় যথেষ্ট গণনযোগ্য। গারো এবং খাসিয়ারা সেখানে এখন আর বিবেচিত নন উপজাতি হিসাবে। তারা এখন একত্রে গঠন করেছেন মেঘালয় প্রদেশ। যার রাজধানী হচ্ছে সিলং। যা এক সময় ছিল সাবেক আসামের রাজধানী। বাংলাদেশের সাঁওতালরা উপনিবিষ্ট হয়েছেন প্রধানত বরেন্দ্র অঞ্চলে। ভারতের বরেন্দ্র অঞ্চলেও যথেষ্ট খ্রিস্টান সাঁওতালের বাস। কেউ বলতে পারেন না এই সমগ্র অঞ্চলের সাঁওতালরা ভবিষ্যতে এক সময় একটা স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র গড়বার কথা ভাবতে যাবেন কি না, বিদেশী খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকদের দ্বারা উপদিষ্ট হয়ে।

***

www.pathagar.com

পাহাড়ি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

পত্রিকার খবরে প্রকাশ, সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে উপজাতিদের নাকি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা হিসাবে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দেবার বিষয়টি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। জানি না ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার কী ধরণের সজ্ঞা প্রদান করা হচ্ছে। কারণ, ইংরেজ আমলের হিসাবে সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আছে কম করে ১০টি উপজাতি। যাদের প্রত্যেককে মেনে নিতে হবে এক একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা হিসাবে। সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উপজাতিদের মধ্যে চাকমা এবং মারমা (আরাকানি মগ) প্রধান। এই দুইয়ের মধ্যে কোন রাজনৈতিক সদ্ভাব নেই। এদের মধ্যে ভবিষ্যতে সংঘাত অনিবার্য হতে পারে। ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কোন রাজনৈতিক সমাধান আনতে পারবে না। বরং রাজনৈতিক সমস্যাকে আরো জটিল করে দিতেই পারে। উপজাতি বা ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বাসমূহ একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে পারে বড় রকমের সংঘাতে। আমরা আফ্রিকায় দেখতে পাচ্ছি একটি উপজাতির সঙ্গে আর একটি উপজাতির সংঘাত বাধতে। সারা কৃষ্ণ আফ্রিকায় শুরু হতে পেরেছে নিদারুন উপজাতি সংঘাতের রাজনীতি। বাংলাদেশে ঠিক অতটা না হলেও হতে পারে উপজাতিদের মধ্যে রক্তক্ষরা সংঘাত। অন্যদিকে ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বার সাংবিধানিক স্বীকৃতি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের জন্যে হয়ে উঠতে পারে বিশেষ ক্ষতিকর। বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে বড় উপজাতি হচ্ছে সাঁওতালরা। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক অংশে বহু সাঁওতালের বাস। তারাও এই সঙ্গে চাইতে পারে পৃথক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মর্যাদা। আর এর সূত্র ধরে উঠতে পারে পৃথক সাঁওতাল আবাসভূমির কথা। বাংলাদেশের সাঁওতালরা দলে দলে খৃস্টান হচ্ছেন। বিদেশি খৃস্টান মিশনারিরা তাদের পৃথক দেশের দাবিকে উস্কে দিতেই পারেন। তাই বিষয়টি আমাদের বিশেষভাবে ভাবিত করে তুলছে। কেন ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার এই ধারণাটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারলো, সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। সাঁওতালদের একটা বিশেষ ভাষা আছে; আছে পৃথক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। কিন্তু বাংলাদেশে সাঁওতালরা এখন সকলেই ভালো বাংলা বলতে পারেন। কেবল তাই না, বাংলাদেশের সাঁওতালী ভাষায় ঢুকে পড়েছে বহু বাংলা শব্দ। সাবেক সাঁওতালী ভাষা তাই বিশুদ্ধভাবে বিরাজ করছে না। সাঁওতালরা এক সময় বাস করতেন বনে। তাদের জীবিকার উপায় ছিল বন্য ফলমূল আহরণ ও পশু-পাখি শিকার। পরে তারা বাঙালিদের কাছ থেকে শিখেছেন লাঙলের সাহায্যে চাষাবাদ। এখন অধিকাংশ সাঁওতাল জীবিকার দিক থেকে হয়ে পড়েছেন এদেশের বৃহত্তর বাংলাভাষী জনসমাজের মতই কৃষিজীবী। বৃটিশ শাসনামলেই সাঁওতালরা হয়ে পড়েছিলেন এদেশি চাল চলনে অভ্যস্থ। কিন্তু মিশনারীদের কল্যাণে তাদের মধ্যে উপ্ত হতে চলেছে বিশেষ সাঁওতালী জাতীয়তাবাদ। যেটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে পারবে সাংবিধানিকভাবে তাদের ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করলে। আমরা তাই

www.pathagar.com

মনে করি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার স্বীকৃতি হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিশেষ পরিপন্থি। পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস আমাদের অনেকেরই যথাযথভাবে জানা নেই। তাই এ বিষয়ে কিছু সাধারণ তথ্য প্রদান করা মনে হয় প্রাসঙ্গিক হবে। মুঘল আমলে বাংলাদেশ ছিল অনেকগুলি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত। যাদের বলা হত 'সরকার'। চট্টগ্রাম অঞ্চল ছিল এরকম একটি সরকার। এ সরকার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ চুক্তি বলে হস্তগত করে নবাব মীর কাশেমের কাছ থেকে ১৭৬০ খৃস্টাব্দে। এরপর ১৮৬০ সালে বৃটিশ ভারতের সরকার তদানীন্তন চট্টগ্রাম জেলাকে বিভক্ত করে সৃষ্টি করে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা বা মাহাল। কিন্তু পরে আবার এই জেলাটিকে একটি বিশেষ ধরণের মহকুমায় পরিণত করা হয়। এই মহকুমাকে আবার একটি কৃথক জেলায় পরিণত করা হয় ১৯০০ খৃস্টাব্দে। সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ১৯৪৭ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয় চট্টগ্রাম জেলার সংলগ্ন অংশ হবার কারণে। চট্টগ্রাম ছিল মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রাম তা ছিল না। কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় পার্বত্য চট্টগ্রামকে সংযুক্ত করা হয় পাকিস্তানের সঙ্গে। আর কংগ্রেস নেতারা তেমন প্রতিবাদ করেন না এই সংযুক্তির। এর একটি কারণ ছিল, জিন্নাহ সাহেব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলাকে ছেড়ে দেন ভারতের কাছে। যদিও গুরুদাসপুর জেলা ছিল মুসলিম অধ্যুষিত। জিন্নাহ সাহেব ছিলেন দুরদর্শী নেতা। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামকে গুরুত্ব দেন বেশি। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, এর জন্যে নিরাপত্তা বাড়বে চট্টগ্রাম বন্দরে। যা ছিল তদানীন্তন পূর্ববাংলার একমাত্র বন্দর। যার ওপর নির্ভরশীল ছিল পূর্বপাকিস্তানের সম্পূর্ণ বর্হির বাণিজ্য। সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে জোর করে কেউ পাকিস্তানের সঙ্গে জুড়ে দেয় নি। বিষয়টি নিষ্পত্তি হতে পেরেছিল খুবই শান্তিপূর্ণভাবে। এর জন্যে সৃষ্টি হতে পারে নি কোন সংঘাত। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল একটি জনবিরল অঞ্চল। পাকিস্তান হবার পর আসাম থেকে আগত অনেক মুসলিম উদ্বাস্তু উপনিবেশিত হয়েছেন সেখানে। এছাড়া চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে বহু মানুষ গিয়েছেন এই অঞ্চলে। হয়েছেন উপনিবিষ্ট। বর্তমানে ওই অঞ্চল আর কেবল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নয়। সেখানে বহু বাংলাভাষী মুসলমান বাস করছেন। যাদের অধিকারকে সাংবিধানিকভাবে হরণ করা যেতে পারে না। পাহাড়ি আর সমভূমির অধিবাসীদের মধ্যে সংবিধানিক পার্থক্য করা যেতে পারে না। কারণ এরা সকলেই হলেন, এক রাষ্ট্রের নাগরিক। ১৯৮৪ সালের পর পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটি জেলায় পরিণত করা হয়েছে। এই তিনটি জেলা হল ঃ খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বন্দরবন। রাঙামাটিতে হল চাকমা প্রাধান্য। পক্ষান্তরে বান্দরবন অঞ্চলে প্রাধান্য হল মারমা বা আরাকানি মগদের। খাগড়াছড়িতে কোন উপজাতিরই ঠিক একক প্রাধান্য নেই। খাগড়াছড়িতে বহু বাংলাভাষি মুসলমানের বাস। সম্ভবত তারাই সেখানে এখন সংখ্যাগুরু। এখানকার অবস্থা রাঙামাটি ও বন্দরবনের মত নয়। কিন্তু এখন চাকমা নেতাদের কথা থেকে মনে হচ্ছে, তারা যেন চাচ্ছেন সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে তাদের নেতৃত্বে একটা পৃথক দেশে পরিণত করতে। যেটা হতে দেয়া যায় না। উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষাদিক্ষায় চাকমারা হলেন সবচেয়ে অগ্রসর।

www.pathagar.com

চাকমাদের এখন নিজস্ব কোন ভাষা নেই। তারা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলেন, বৃটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ গিয়ার্সন তাকে চিহ্নিত করেছেন বাংলারই একটি উপভাষা হিসাবে। যা হল চট্টগ্রামের বাংলার খুব কাছাকাছি। যেহেতু যথেষ্ট আগেই চাকমারা হয়ে উঠেছেন বাংলাভাষী, তাই বাংলাভাষার মাধ্যমে লেখা পড়া শিখে তারা হতে পেরেছেন, অনেক সহজেই অনকে অগ্রসর। যেটা অন্য আর সব উপজাতিদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অথচ এখন চাকমারা দাবি করছেন, তাদের ভাষা নাকি বাংলা থেকে খুবই ভিন্ন। ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে যে দাবিকে মেনে নেবার কোন যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। চাকমারা রাজনৈতিকভাবে বাংলাভাষীদের দ্বারা যে নিপীড়িত হচ্ছেন এমন নয়। কিন্তু তথাপি উঠছে চাকমা স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বার দাবি। আর বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সেটাকে স্বীকার করে নিয়ে চাচ্ছেন সংবিধানে পরিবর্তন আনতে। যে পরিবর্তন সমগ্র দেশের জন্য হয়ে উঠবে একটা বড় রকমের সমস্যারই কারণ। ইংরেজ আমলের আদমশুমরি রিপোর্টে উপজাতি বলতে বুঝিয়েছে, এমন ক্ষুদ্র লোকসমষ্টিকে, যাদের জীবনধারা থেকেছে আরণ্যক। যারা থেকেছে অর্ধ যাযাবর। যাদের জীবিকার উপায় থেকেছে প্রধানত বন্য ফলমূল আহরণ ও পশুপাখি শিকার। যারা কিছুকিছু কৃষিকাজ করেছে মাটিতে গর্ত করে বীজ বপন করে। যারা কখনই লাঙল দিয়ে চাষাবাদে অভ্যস্থ ছিল না। কিন্তু এখন বাংলাদেশের উপজাতিরা আর সেই আদিম আরণ্যক জীবনে পড়ে নেই। এর একটি কারণ হল, বাংলাদেশে নেই আর আগের মত বন। আর তাই বন্য জীবন যাপন করা যাচ্ছে না বাস্তব কারণেই। এছাড়া উপজাতিদের মধ্যে ঘটেছে শিক্ষার প্রসার। পড়েছে বৃহত্তর জনসমষ্টির সভ্যতার প্রভাব। যা তাদের আদিম সংস্কৃতি থেকে বিশেষভাবে ভিন্ন করেই তুলেছে এবং তুলছে। অনেকে ইংরেজ আমলের উপজাতি কথাটাকে বাদ দিয়ে আদিবাসী শব্দটা গ্রহনের পক্ষে। বাংলায় উপজাতি কথাটা ব্যবহার আরম্ভ হয় ইংরেজি Tribe শব্দটির প্রতিশব্দ হিসাবে। আদিবাসী শব্দটি নৃ-তত্ত্বে ব্যবহৃত হয় প্রধানত Aborigine শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে। ইংরিজিতে Aborigine শব্দটা প্রয়োগ করা হয় প্রধানত অষ্ট্রেলিয়ার আদিম কালো মানুষদের বর্ণনা করতে যেয়ে। আমেরিকান রেড ইন্ডিয়ানদের ক্ষেত্রেও Aborigine শব্দটার কিছু প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। কারণ এসব মানুষ সবাই হল ঐসব অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। ইউরোপ থেকে অনেক পরে সাদা মানুষ গিয়ে দখল করেছে তাদের দেশ। উপনিবিষ্ট হয়েছে সেখানে। কিন্তু বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজ এখানকারই মানুষ। তারা ঠিক এভাবে বাইরে থেকে আসা নয়। এবং তারা জোর করে কোন জাতিকে বাধ্য করেনি ঘন অরণ্যে যেয়ে বসবাস করতে। তারা কেড়ে নেয় নি কারো জমি। যেমন সাদা মানুষ আমেরিকায় যেয়ে কেড়ে নিয়েছে অনেক রেড ইন্ডিয়ানদের জমি। তাই আদিবাসী কথাটা সংবিধানে প্রয়োগ করা কতটা যুক্তিসিদ্ধ হবে সেটা নিয়েও থাকছে প্রশ্ন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আদিবাসী শব্দটা হয়ে উঠেছে খুবই বিভ্রান্তিকর। এটাকে ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

***

www.pathagar.com

ইতিহাসের পটে আরাকান - বাংলাদেশ

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মানবধারা ও ভাষার প্রসঙ্গ আসে। একটি অঞ্চলের মানব সমষ্টির মধ্যে থাকতে পারে বিভিন্ন মানবশাখাভুক্ত মানুষ। আর তাদের মধ্যে থাকতে পারে ভাষারও পার্থক্য। মানবশাখা ও ভাষার সাহায্যে একটা দেশের মানব সমষ্টির ইতিহাসকে অনেক পরিমাণে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আর তা করাও হয়ে থাকে। আরাকানের অধিকাংশ মানুষ হল মঙ্গলীয় মানব শাখাভুক্ত। এদের গণ্ডের হাড় হল উঁচু। নাকের গোড়া অক্ষিকোটর থেকে যথেষ্ট উঁচু নয়। তাই মুখমন্ডল দেখে সাধারণভাবে মনে হয় সমতল। যেটা আমাদের অধিকাংশের মুখমণ্ডল দেখে মনে হয় না। আরাকানে বসবাসকারী মঙ্গলীয় শাখাভূক্ত মানুষকে বাংলাভাষায় সাধারণভাবে বলা হয় মগ। এক সময় মিয়ানমারের অধিবাসীদেরও বাংলাভাষায় বলা হয়েছে মগ(মঘ) বা মঙ। খৃস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকান থেকে মগ জলদস্যুরা এসে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে যথেষ্ট লুটতরাজ করেছে। এরা এসময় হাত মিলিয়েছিল পুর্তগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে। যারা ঘাটি গেড়েছিল চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপে। পুর্তগীজরা চট্টগ্রামে গড়েছিল বন্দর। যাকে তারা বলত পর্তগ্রন্দ(Porto grande) বা বড় বন্দর। এ সময় মুঘল সম্রাট কার্যত হারিয়ে ফেলেছিলেন চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ। মগ ও পুর্তগীজ জলদস্যুরা শতশত মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেছে দাস রূপে। এসময়ের দাস ব্যবসার বর্ণনা দিতে যেয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার তাঁর বংলার ইতিহাসের দ্বিতীয় খন্ডে লিখেছেন যে,– এইসব মানুষের হাতের তালু ছিদ্র করা হত। ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে বেতের সাহায্যে একজনের হাত আর একজনের হাতের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা হত যাতে তারা পালিয়ে যেতে না পারে। এসব মানুষদের রাখা হত বড় বড় নৌকার পাটাতনের নিচে। পাটাতনের কাঠ তুলে মাঝে মধ্যে কিছু চাল ফেলে দেয়া হত এদের খাবার জন্যে। বহু মানুষ মারা যেত এরকম অবস্থায়। এ ছিল দাস ব্যবসার নিষ্ঠুর চালচিত্র। বাংলা ভাষায় মগদের অত্যাচারের স্মৃতি বিশেষভাবে টিকে আছে 'মগের মুলুক' কথাটার মধ্যে। আজ আরাকানে রোহিঙ্গাদের ওপর অত্যাচারের কথা পত্রিকায় পড়তে পড়তে মনে হচ্ছে সেই অতীতের মগের মুলুকেরই কথা।

আমরা এক সময় যাকে বলতাম আরাকান, ১৯৬৪ সালে তার নাম বদল করে রাখা হয়েছে রাখাইন প্রে। আগে আমরা বাংলা ভাষায় যাকে বলতাম 'ব্রহ্মদেশ' এবং ইংরেজিতে বলতাম বার্মা, ১৯৮৯ সালে তার নাম বদলে রাখা হয়েছে মিয়ানমার(Myanmar)। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ম্রনমা বা বর্মী ভাষায় 'র' লেখা হলেও উচ্চারণ করা হয় না। তাই মিয়ানমার না বলে দেশটার নাম 'মিয়ানমা (Myanma)' বলা হয়। মিয়ানমা নামটি এসেছে ম্রনমা শব্দ থেকে। আমরা

www.pathagar.com

যাদের বলি বর্মী, তারা নিজেদের বলে ম্রনমা। ম্রনমা শব্দটি আবার এসেছে 'মিয়ো' (Myo) শব্দ থেকে। মিয়ো শব্দের অর্থ হল মানুষ। মিয়েনমা নামের মধ্যে আছে ম্রনমা জাতির জাতীয় অহংকার। ম্রনমা মানুষ, অন্যরা মানুষ নয়। কিন্তু আমরা যে দেশকে এখন বাংলায় বলছি মিয়ানমার, সেখানে যে কেবল ম্রনমা জাতি বাস করে এমন নয়। বাস করে আরো অনেক জাতি। যেমন- শান, কাচিন, কারেন। আরাকানের রাখাইনরা নিজেদেরকে ঠিক ম্রনমা ভাবে না। যদিও তাদের ভাষার সঙ্গে পুরানো ম্রনমা ভাষার আছে যথেষ্ট মিল। ১৯৪৮ সালে বর্মায় বৃটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে রাখাইন, সান, কাচিন ও কারেনরা বিদ্রোহ করেছিল স্বাধীন হবার লক্ষে। কিন্তু এই বিদ্রোহকে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। তবে এদের দিতে হয় যথেষ্ট স্বায়ত্তশাসন। অবশ্য এই স্বায়ত্তশাসন দেবার পরেও যে মিয়ানমারে জাতিসত্ত্বার সমস্যা পুরোপুরি মিমাংশিত হতে পেরেছে তা নয়। বৃটিশ শাসনামলে অনেক কারেন গ্রহণ করেছে খৃস্টান ধর্ম। তারা তাই তাদের বিদ্রোহে পেতে পারছে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ সহানুভূতি। আরাকানে রাখাইন বিচ্ছিন্নতাবাদ যে একেবারেই বিলুপ্ত হয়েছে তাও নয়। রাখাইনরা ম্রনমাদের মত মঙ্গলীয় মানবশাখাভুক্ত মানুষ। তাদের ভাষার সঙ্গে আছে প্রাচীন ম্রনমা ভাষার মিল। তারা ধর্মে ম্রনমাদের মতই হীনযান বৌদ্ধ (থেরাবাদি বৌদ্ধ)। কিন্তু তথাপি তাদের অনেকের মধ্যে এখনো কাজ করে চলেছে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পৃথক হবার ইচ্ছা। বর্তমানে আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেটার সঙ্গে রাখাইনরা যতটা না জড়িত তার চাইতে বেশি জড়িত হচ্ছে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সেনা বাহিনী; যারা প্রধানত খাঁটি ম্রনমাদের দ্বারা গঠিত। মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকার চাচ্ছে রাখাইনদের মনে রোহিঙ্গা বিদ্বেষকে বাড়িয়ে দিয়ে সেখানে মিয়ানমারের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি করতে। আর এক কথায় রাখাইনদের মিয়ানমার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রাখতে। এ হল এক বিশেষ ধরণের রাজনীতি। আর রাখাইন ও রোহিঙ্গা সমস্যা তীব্র হবার একটা প্রধান কারণ। আরাকানে যা কিছু ঘটছে তার জন্যে রাখাইনরা না যতটা দায়ী তার চাইতে অধিক দায়ী বার্মার কেন্দ্রীয় সরকারের এই বিশেষ নীতি। যা পরিবর্তিত না হলে আরাকানে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান আসা কঠিন হয়েই থাকবে। আরাকানের ইতিহাসে দেখা যায়, বার্মার মূল ভূখণ্ডের একজন রাজা ৮০৭ হিজরীতে (১৪০৪খৃ) আরাকানের রাজা মেং সোআ ম্উনকে পরাজিত করে আরাকান অধিকার করেন। আরাকানের এই পরাজিত রাজা , মেং সোআ ম্উন (অথবা নর মেইখ্লা) আরাকান থেকে পালিয়ে এসে গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ'র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জালাল উদ্দিন আরাকানের রাজাকে সেনাপতি ওয়ালী খাঁন'র নেতৃত্বে ২০ হাজার সৈন্য প্রদান করেন, আরাকান রাজ্য জয় করে মেং সোয়া মউনকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সেনাপতি ওয়ালী খান ৮৩৪ হিজরীতে (১৪৩০খৃ) বার্মার রাজাকে পরাজিত করে আরাকান জয় করেন। কিন্তু তিনি মেং সোআ মউনকে রাজা না করে নিজেই আরাকানের রাজা হয়ে বসেন। মেং সোয়া মউন কোনমতে আবার গৌড়ে

www.pathagar.com

পালিয়ে আসতে সমর্থ হন। সুলতান জালাল উদদীন এবার সিদ্ধি খান নামে আর একজন সেনাপতির অধিনে মেং সোআ মউনকে ৩০ হাজার সৈন্য প্রদান করেন। এবার ওয়ালী খান যুদ্ধে পারজিত হয়ে পালিয়ে যান। ওয়ালী খানের সৈন্যগণ সিদ্ধি খানের দলে যোগ দেন। এই সমুদয় সৈন্য থেকে যায় আরাকানে। আরাকানে থেকে যাওয়া গৌড়ের এই মুসলীম সৈন্যদের বংশধররাই হলেন প্রকৃত রোহিঙ্গা মুসলমান। মেং সোআ মউন আরাকানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। যার নাম দেন ম্রোহং বা রোহং। রোহঙ্গের অধিবাসী মুসলমানদের তাই নাম হয় রোহিঙ্গা। এছাড়া আরাকানের অনেক রাজা সেদেশে চট্টগ্রাম থেকে অনেক মুসলমানকে নিয়ে যান চাষাবাদ করবার জন্যে। তাদের প্রদান করেন জমি। এরাও ক্রমেই পরিচিতি পান রোহিঙ্গা হিসাবে। রোহং শহর চট্টগ্রামের কোথিত বাংলায় উচ্চারিত হতে থাকে রোয়ং। আরাকান ও রোয়ং এক পর্যায়ে হয়ে ওঠে সমার্থক। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে রাজধানী রোয়ং উল্লেখিত হয়েছে রোসাঙ্গ নগর হিসাবে। গোটা দেশটাকেও বাংলাভাষায় এক সময় হত রোসাঙ্গ। আরাকানের রাজসভায় বাংলা ভাষা পেয়েছে বিশেষ মর্যাদা। আরাকানের রাজসভায় হতে পেরেছে বিশুদ্ধ বাংলাভাষা সাহিত্যের চর্চা। আরাকানের বিখ্যাত বাংলাভাষী কবি দৌলত কাজী তার 'সতী ময়না মাতি' কাব্যগ্রন্থে লিখেছেন–

কর্ণফূলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ-অবতারী ॥
তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রী সুধর্মা রাজা ধর্মে অবতার ॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভূবন।
পুত্রে সমান করে প্রজার পালন ॥

এখানে দেখা যাচ্ছে দৌলত কাজী বলছেন, রাজা সুধর্মা হচ্ছেন মগধ বংশের রাজা। অনেকের মতে মগ শব্দের উদ্ভব হয়েছে মগধ শব্দ থেকে। মগধ হল দক্ষিণ বিহার। বর্তমানে যা বিহারের পাটনা ও গয়া জেলা।এখান থেকে সুধর্মার পূর্বপুরুষরা গিয়েছিলেন আরাকানে। এরকম কথা অনেকে অনুমান করেন। আরাকানের রাজ সভার আর একজন বিখ্যাত কবি আলাউল(আলাওল) তাঁর রচিত 'পদ্মাবতী' কাব্যে লিখেছেন–

নানা দেশে নানা লোক শুনিয়া রোসাঙ্গ ভোগ
আইসেন্ত নৃপ ছায়াতল।
আরবী মিশরী শামী তুর্কী হাবসী রুমী
খোরাসানী উদ্বেগ সকল।
লহুরী মুলতানী সিন্ধী কাশ্মীরী দক্ষিণ হিন্দী
কামরূপ আর বঙ্গদেশী।
আওপিহ খৃতাঞ্চরী কান্নাই মালয়াবরী
অচি-কচি কর্ণাটক বাসী।

www.pathagar.com

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কবি বলছেন রোহং, যার বাংলা নাম হল রোসঙ্গ নগর তা ছিল খুবই সমৃদ্ধ। দেশ-বিদেশ থেকে মানুষ এখানে আসত তাদের ভাগ্য গড়বার জন্য।

রাজধানী রোসাঙ্গে নানা দেশ থেকে আসতো মানুষ। এর মধ্যে বাংলাদেশীরাও ছিল। আলাওল বাঙালি না বলে ব্যবহার করেছেন বঙ্গদেশী শব্দটা। আমরা এখন মহাকবি আলাউলের অনুকরণে নিজেদের বাঙালি না বলে পরিচয় দিতে চাচ্ছি বাংলাদেশী হিসাবে। এক্ষেত্রে আমরাও অনুসরণ করতে চাচ্ছি মহাকবি আলাউলকে। আমাদের দেশের অনেকে মনে করেন, 'বাংলাদেশী' শব্দটা বিএনপি'র আবিষ্কার। কিন্তু মহাকবি আলাউল বঙ্গদেশী শব্দটা ব্যবহার করেছেন শপ্তদশ শতাব্দীতে। হঠাৎ করেই শব্দটার উদ্ভব হয়নি। এর আছে একটি বিশেষ ঐতিহ্য। শব্দটির উদ্ভব হতে পেরেছিল আরাকানের রাজসভায়। মহাকবি আলাউল রোসাঙ্গবাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন ফরিদপুর অঞ্চলের লোক। তিনি তাঁর পিতা ও চাচা সহ নদী পথে যাত্রার সময় পর্তুগীজ জলদস্যুদের হাতে পড়েন। পরে পর্তুগীজ জলদস্যুদের সাথে যুদ্ধে তাঁর পিতা ও চাচা নিহত হন। পর্তুগীজ জলদস্যুরা আলাউলকে ধরে এনে বিক্রয় করে রোসাঙ্গ শহরে। রোসাঙ্গে প্রথমে তিনি হন রাজার অশ্বারোহী সৈন্য। পরে তিনি নিজগুণে অধিকার করে নিতে পারেন রোসাঙ্গের রাজদরবারে সভাকবির আসন।

সাজাহানের পুত্র সাহাজাদা সুজা ছিলেন সুবে বাংলার সুবেদার। তিনি তার ভ্রাতা আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ১০৭০ হিজরীতে (১৬৬০ খৃ) আরাকানে পালিয়ে যান অনেক লোকজন ও সৈন্য সামান্ত সহ। আরাকানের রাজা সুজার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করতে চান। কিন্তু সুজা এতে রাজি হন না। সুজার সঙ্গে আরাকানে রাজার যুদ্ধ বাধে। সুজা যুদ্ধে নিহত হন। আরাকানের রাজা সুজার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে জোরপূর্বক বিবাহ করেন। কিন্তু পরে তাকে হত্যা করেন। কারণ, তিনি মনে করেন সুজার জ্যেষ্ঠ কন্যা ষড়যন্ত্র করছেন পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'দালিয়া' নামক গল্পটি যথেষ্ট খ্যাত। এতে তিনি দেখিয়েছেন, সুজা তার কনিষ্ঠ কন্যাকে ফেলে দেন নদীর মধ্যে। যাতে তিনি আরাকানের সৈন্যদের কাছে না পড়েন। তার এক বিশ্বস্থ কর্মচারীর হাতে তার জ্যেষ্ঠ কন্যাকে প্রদান করেন। যিনি তার কন্যাকে নিয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এবং নিজে ছদ্দনাম গ্রহণ করে আরাকানের রাজার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। অন্যদিকে সুজার কনিষ্ঠ কন্যা নদীর পানিতে ডুবে মারা যান না। তিনি আটকা পড়েন এক ধিবরের জালে। দরিদ্র ধিবর তাকে মানুষ করে।এক সময় সুজার জ্যেষ্ঠ কন্যা ছোট বোনের সংবাদ পান। তিনি আসেন ধিবরের বাড়িতে। আরাকানের রাজার ছেলে দালিয়া ধিবরের বাড়িতে আসতো। সে চাইতো ধিবরের বাড়িতে বেড়ে ওঠা সুজার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ করতে। কিন্তু সে নিজেকে কখনো প্রকাশ করেননি আরাকানের রাজপুত্র হিসাবে। সে নিজেকে পরিচিত করে আরাকানের একজন

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষ হিসাবে। আচরণ করে তাদেরই মত। আরাকানের রাজার মৃত্যু হলে দালিয়া বসেন আরাকানের সিংহাসনে। তিনি সুজার কনিষ্ঠ কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। সুজার জ্যেষ্ঠ কন্যা তার ছোট বোনকে একটি ছোরা দিয়ে বলে- এটি সঙ্গে করে নিয়ে যা। রাজাকে হত্যা করে আমাদের পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। এটাই হল রাজকন্যার কাজ। কিন্তু সুজার কনিষ্ঠ কন্যা রাজ প্রাসাদে ঢুকে দেখতে পান রাজা আর কেউ নন, তার অতি পরিচিত দালিয়া। রাজকন্যার পক্ষে দালিয়াকে খুন করা আর হয় না। বড় বোনের দেয়া লুকানো ছোরা লুকানোই থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের দালিয়া গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক। কিন্তু লক্ষ করবার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ আরাকান নিয়ে গল্প লেখার প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। আরাকান পেতে পেরেছিল তার চিন্তায় স্থান। ইতিহাসকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সৃষ্টি অনেকেই করেছেন। ইতিহাস নিয়ে গল্প কাহিনী লিখতে গেলে তার সঙ্গে কল্পনা মিশতে বাধ্য। কিন্তু দালিয়া গল্পটি হল খুবই কাল্পনিক। ইতিহাসের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য সাহাজাদা সুজা যে আরাকানে গিয়েছিলেন এটা হল ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি সেখানে স্বপরিবারে নিহত হন আরাকানের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে। বৃটিশ শাসনামলে আরাকান বাংলাদেশের আর কোন লেখকের লেখায় প্রভাব ফেলতে পারেনি। শরৎচন্দ্রের লেখায় ব্রহ্মদেশের কথা আছে। কিন্তু আরাকানের কোন কথা নেই তাঁর উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' নামক উপন্যাসে বার্মা বা মিয়ানমার আছে অনেকটা স্থান জুড়ে।

বৃটিশ শাসনামলে তদানীন্তন ভারত থেকে বহু মানুষ সমুদ্রপথে বার্মায় গিয়েছে ভাগ্যের খোঁজে। এরা বার্মায় গিয়ে চাকরি করেছে, ব্যবসা করেছে, করেছে সুদের কারবার। হয়েছে ধনী। কিন্তু বার্মাকে ভাবতে পারেনি আপন দেশ হিসাবে। এরা অনেকে বর্মী মেয়েকে বিয়ে করে তাদের গর্ভজাত পুত্র-কন্যাসহ ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছে ভারতে। বর্মীরা তাই ঘৃণা করেছে ভারত থেকে যাওয়া মানুষ কে। কিন্তু আরাকানের ইতিহাস হল অনেক ভিন্ন। এখানে চট্টগ্রাম থেকে মানুষ সমুদ্র পথে যায়নি, চট্টগ্রাম থেকে মানুষ গিয়েছে হাঁটা পথে। গড়েছে স্থায়ী বসতি। করেছে চাষাবাদ। আরাকানকে ভেবেছে আপন দেশ। ফিরে আসতে চায়নি আরাকান থেকে বাংলাদেশে। কিন্তু আজ আরাকানে এই সব উপনিবিষ্টদের বংশধরকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে ভয়াবহ সমস্যার। তাদের বলা হচ্ছে পরদেশী। যেটা সত্য নয়। সম্প্রতি মিয়ানমারের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক বলেছেন– 'রোহিঙ্গা নামটি তিনি বৃটিশ আমলের কোন প্রশাসনিক দলিলপত্রে থাকতে দ্যাখেননি। রোহিঙ্গা বলে আসলে কিছু নেই। যাদের বলা হচ্ছে রোহিঙ্গা তারা হল বাংলাদেশ থেকে যেয়ে উপনিবিষ্ট হওয়া চট্টগ্রামের বাংলাভাষী মুসলমান। আরাকানে এরা হল অভিভাষী। এদের তাই আরকান থেকে চলে যেতে হবে।' কিন্তু তার এই দাবিকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে ধরা যেতে পারে না। সম্ভবত তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত নন। পরিচিত হলে

www.pathagar.com

তিনি জানতে পারতেন রোহিঙ্গা নামের উদ্ভব বিত্তান্ত। বৃটিশ আমলের দলিলপত্রে রোহিঙ্গা নামটি না থাকলেও পাওয়া যায় আরাকানী মুসলমানদের হিসাব। আরাকানে বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩১ সালে যে আদমশূমার করা হয়, তার হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সে সময়ের আরাকানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ ভাগ ছিলেন আরাকানী মুসলমান। এই জনসমষ্টিকে আমরা রোহিঙ্গা না বলতে পারি কিন্তু এদের বংশধরদের অবশ্যই ধরতে হবে আরাকানের নাগরিক। কারণ এদের বৃটিশ শাসনামলে আমলে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে আরাকানের অধিবাসী হিসাবে।

আরাকান এক সময় ছিল একটা পৃথক রাজ্য। আরাকান এক সময় ছিল না মিয়ানমারের অংশ। আরাকান মিয়ানমারের অংশ হয়েছে বৃটিশ শাসনের ফলে। বৃটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী আরাকান জয় করে প্রথম বার্মা যুদ্ধে (১৮২৪-২৬)। এসময় ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকার কেবল আরাকান জয় করে না, জয় করে আসাম ও টেনাসেরিন। দ্বিতীয় বার্মা যুদ্ধ হয় ১৮৫২ সালে। এই যুদ্ধে বৃটিশ ভারতের সরকার জয় করে পেগু। তৃতীয় বার্মা যুদ্ধ হয় ১৮৮৫ সালে। এ যুদ্ধে ভারতের বৃটিশ সরকার জয় করে উত্তর বার্মা। যার রাজধানী ছিল মান্দালয়। এভাবে বার্মা জয় করে বৃটেন বার্মাকে পরিণত করেছিল তদানীন্তন ভারতের একটি প্রদেশে। কিন্তু পরে ১৯৩৭ সালে বার্মাকে তদানীন্তন ভারত থেকে পৃথক করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটা পৃথক রাজ্যের মর্যাদা প্রদান করা হয়। এসময় আরাকানকে বৃটিশ শাসন যুক্ত করে বর্তমান মিয়ানমারেব সঙ্গে। বৃটিশ শাসন আরাকানকে যদি এভাবে মিয়ানমারের সঙ্গে যুক্ত না করত তবে আরাকান হতে পারতনা মিয়ানমারের অংশ। মিয়ানমারের এক রাজা সাবেক আসাম জয় করেছিলেন। প্রথম বার্মা যুদ্ধে বার্মার রাজা হেরে যান। সাবেক আসাম আসে বৃটিশ শাসনের আওতায়। বৃটেন আসামকে মিয়ানমারের সঙ্গে যুক্ত না করে যুক্ত করে তদানীন্তন ভারতেরই সঙ্গে। না হলে সেটা হতে পারত আরাকানের মত মিয়ানমারেরই অংশ।

শান জাতি বাস করে উত্তর বর্মায় (Upper Burma)। শান জাতির একটি শাখা ছিল অহম নামে পরিচিত। এই অহম শাখার একজন নায়ক খৃস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জয় করেন সাবেক আসাম অঞ্চল।(সাবেক 'অহম' দের নাম থেকেই হতে পেরেছে আসাম নামের উদ্ভব)। ১৮১৬ সালে অহমদের কাছ থেকে আসাম দখল করে নেন বর্মার রাজা বোদপায়া (Bodopoya)। বোদপায়ার কাছ থেকে বৃটিশরা আসাম দখল করে ১৮২৫ খৃষ্টব্দে।

বৃটিশ শাসন এই অঞ্চলের রাষ্ট্রিক মানচিত্র এঁকে রেখে গিয়েছে। আরাকান তাই হয়েছে মিয়ানমার রাষ্ট্রের অংশ। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে আরাকান মিয়ানমারের মূল ভুখন্ডের চাইতে বাংলাদেশের সঙ্গেই সব সময় বৃটিশ শাসনের কারণে থেকেছে ভৌগলিক কারণে অধিক সংযুক্ত। আরাকানের পূর্ব পাশে রয়েছে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী, আরাকান ইয়োমা(ইয়োমা মানে হল পাহাড়)। এই পাহাড়ের মধ্যে

www.pathagar.com

দিয়ে আছে গিরিপথ। কিন্তু এই সব গিরিপথ দিয়ে মিয়ানমারের মূল ভূখন্ডের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা এখনো সহজ নয়। আরাকানের পশ্চিমে এবং দক্ষিণে হল সমুদ্র। বঙ্গোপসাগর। আরাকান ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগযোগের ক্ষেত্রে এরকম কোন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা নেই। সঙ্কীর্ণ পাহাড়ি নাফ নদীকে সহজেই অতিক্রম করা যেতে পারে। বৃটিশ সাশনামলে নাফ নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করে চট্টগ্রামের দুহাজারী থেকে আরাকানে যাবার জন্যে রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু জাপান যুদ্ধের কারণেএরকম রেলপথ নির্মান করে আরাকানের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। মিয়ানমার চাইলে এখন এরকম রেলপথ স্থাপন করে আরাকান ও বাংলাদেশের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। ব্যবসা বাণিজ্যের এরকম সম্প্রসারণ আরাকানের রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে নিশ্চয় সহায়ক হবে। একসময় আরাকানের রাজসভায় হয়েছে বাংলা সাহিত্যের চর্চা। আরাকানে বাংলা সাহিত্যের এরকম চর্চা হবার কোন সুযোগ এখন আর নেই। তবে আরাকান বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়াবার ব্যবস্থা নানাভাবেই করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে পারবে আরো সহায়ক হতে। বাংলাদেশ সরকারকে এক্ষেত্রে সক্রিয় হতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমেই পেতে হবে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান। অন্যভাবে এই জটিল সমস্যার সমাধান পাবার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

***

www.pathagar.com

রোহিঙ্গা মুসলিম সমস্যা

আরাকানের মুসলমানদের চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায় বলা হয় রোহিঙ্গা। এর একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। আরাকানের পুরাতন রাজধানীর নাম হল 'ম্রোহং বা রোহং'। বাংলায় এই নামটিকে বলা হয় রোসঙ্গ। দৌলত কাজী তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সতী ময়না মতি' তে লিখেছেন–

কর্ণফূলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী
রোসঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ-অবতারী।

কবি আলাওল তার 'সাইফুল মুল্‌ক বদিউজ্জামান' কাব্যে লিখেছেন–

ক্ষিতি তলে অনুপম রোসঙ্গ শহর নাম
শস্য মৎস্য সতত পূর্ণিত।

রোসঙ্গ বা রোহং শহরে বসবাসকারী মুসলমানদের নাম তাই হতে পেরেছে রোহিঙ্গা। আরাকানে বসবাসকারী সব মুসলমানকে যে রোহিঙ্গা বলা হত তা নয়। তবে ক্রমশ আরাকানে বসবাসকারী সব মুসলমানই রোহিঙ্গা পদবাচ্য হয়ে উঠেছে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায়। সম্প্রতি মিয়ানমারের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপক বলেছেন– 'রোহিঙ্গা নামটি তিনি বৃটিশ শাসনামলের কোন বৃটিশ দলিলপত্রে থাকতে দ্যাখেননি। রোহিঙ্গা বলে আসলে কিছু নেই। যাদের বলা হচ্ছে রোহিঙ্গা তারা হল বাংলাদেশ থেকে যেয়ে উপনিবিষ্ট হওয়া চট্টগ্রামের বাংলাভাষী মুসলমান। আরাকানে এরা হল অভিভাষী। এদের তাই আরকান থেকে চলে যেতে হবে।' কিন্তু তার এই দাবিকে যুক্তিগ্রাহ্য বলে ধরা যেতে পারে না। কারণ, ইংরেজ আমলের দলিলপত্রে রোহিঙ্গা নামটি না থাকলেও পাওয়া যায় আরাকানী মুসলমানদের হিসাব। আরাকানে বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩১ সালে যে আদমশূমার করা হয়, তার হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সে সময়ের আরাকানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ ভাগ ছিলেন মুসলমান। এই জনসমষ্টিকে আমরা রোহিঙ্গা না বলতে পারি কিন্তু এদের বংশধরদের অবশ্যই ধরতে হবে আরাকানের নাগরিক। কারণ, মানুষ নাগরিক অধিকার লাভ করে জন্মসূত্রে। বাংলাদেশ থেকে অতীতে আরাকানে যেয়ে যারা উপনিষ্টি হয়েছেন তাদের বংশধররা জন্মসূত্রে বিবেচিত হওয়া উচিত আরাকানের নাগরিক হিসাবে। তাদের এখন আর পরদেশী ভাববার সুযোগ নেই। আরাকানের উত্তরাংশের ভাষা এখন হয়ে উঠেছে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা। আরাকানে প্রকৃত প্রস্তাবে বর্তমানে চলছে তিনটি ভাষা। একটি হল চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলা। যা লিখিত হচ্ছে পরিবর্তিত রোমক বর্ণমালায়। আর একটি ভাষা হল রাখাইনদের ভাষা। যার সঙ্গে প্রাচীন ম্রন্‌মা অর্থাৎ বর্মী ভাষার মিল থাকলেও ম্রনমা ভাষা থেকে যা বেশ কিছুটা পৃথক। আরাকনীদের সরকারী ভাষা এখন হল ম্রনমা বা বর্মী ভাষা। যে অঞ্চলকে এক সময় বলা হত

www.pathagar.com

আরাকান, তাকে এখন বলা হচ্ছে রাখাইন প্রে। রাখাইন শব্দটা সম্ভবত এসেছে পালি ভাষা থেকে। রাখাইন মানে রক্ষণশীল। রাখাইনরা আরাকানের সমভূমির বাসিন্দা। তাদের জীবীকার প্রধান উপায় হল নদী তীরবর্তী সমভূমি অঞ্চলে ধান চাষ। প্রে শব্দটাও সম্ভবত পালি। প্রে আর আমাদের বাংলা 'পুর' সমার্থক। পুর বলতে বোঝায় জনপদ। যেমন রংপুর, দিনাজপুর। রাখাইন প্রে বলতে বুঝায় রাখাইনদের জনপদ। আরাকানের সব মানুষই যে রাখাইন, তা নয়। তবে রাখাইনরা সংখ্যায় বেশি। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে-উইন ক্ষমতায় এসে দেশের নামটি বদলে করেন রাখাইন প্রে। রাখাইন প্রে নামটি বেশিদিনের পুরানো নয়। আর ইংরেজিতে যাকে বলতাম বার্মা, ১৯৮৯ সালে তার নাম বদলিয়ে রাখা হয়েছে মিয়ানমার। মিয়ানমার নামটা করা হয়েছে ম্রনমা থেকে। কিন্তু ম্রনমারাই যে মিয়ানমারের একমাত্র জনগোষ্ঠী তা নয়। মিয়ানমারে অন্য জনগোষ্ঠিও আছে। যেমন, সান, কাচিন, কারেন প্রভৃতি। এরা ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হবার পর বিদ্রোহ করে বার্মা থেকে বিযুক্ত হয়ে স্বাধীন হবার লক্ষে। আরাকানে ১৯৫০ সালে আরাকানীরাও বিদ্রোহ করে স্বাধীন হবার জন্যে। তবে বার্মার কেন্দ্রীয় সরকার সেনাবহিনীর জোরে এসব বিদ্রোহকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। যদিও বর্মা বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা মুক্ত এখনও হতে পারেনি। কারেনদের একটা বড় অংশ বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টানধর্ম গ্রহণ করেছেন। এরাই এখন বর্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার বিদ্রোহের ক্ষেত্রে পালন রছেন প্রধান ভূমিকা। কারেন সমস্যা এখনও হয়ে আছে মিয়ানমারের একটা গুরুতর সমস্যা। আরাকান স্বাধীন হতে না পারলেও পেতে পেরেছে আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বায়ত্তশাসন। তবে রাখাইনদের মধ্যে এখনো কাজ করছে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা। বৃটিশ শাসনামলে বার্মা ছিল ৭ টি প্রশাসনিক বিভাগে (Division) বিভক্ত। কিন্তু বর্তমানে মিয়ানমার হল(আমি যতটুকু জানি) ১৪ টি প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত। এরমধ্যে ৭ টি হল কতকটা ইংরেজ আমলের বিভাগের মত। আর সাতটি হল স্বয়ং শাসিত অঙ্গরাষ্ট্র(Constituents stats)। ৭টি বিভাগে বাস করেন খাঁটি বর্মী বা ম্রনমাভাষীরা। আর ৬টি রাষ্ট্রে বাস করেন, বর্মী যাদের মাতৃভাষা নয়, তারা। সপ্তম রাষ্ট্র আরাকান, বর্মীভাষী না হলেও রাখাইনদের ভাষা প্রাচীন বর্মীভাষার অনেক কাছাকাছি। কিন্তু রাখাইনদের মধ্যে একদিকে ম্রনমাদের উপর টান থাকলেও তাদের মধ্যে আবার কাজ করে চলেছে একটা ঐতিহাসিক বিচ্ছিন্নতাবোধ। বৃটিশ শাসনামলে তখনকার আরাকান বিভাগ ছিল চারটি জেলায় বিভক্ত। ১. পার্বত্য আরাকান(Arakan Hill tracts), ২. আকিয়াব (Akyab), ৩. সন্দোয়ে (Sandowa), এবং ৪. কাইউকপিউ (Kyaukpyu)। বৃটিশ আমলের আরাকান বিভাগের কিছু অংশ এখন কেটে নিয়ে জুড়ে দেয়া হয়েছে মূল মিয়ানমারের ইরাবতী বিভাগের সঙ্গে। এবং সাবেক পার্বত্য আরাকান জেলাকে সংযুক্ত করা হয়েছে মিয়ানমারের আরেকটি অঙ্গরাজ্য চীনের সঙ্গে(এই চীনের সঙ্গে মহাচীনের কোন সম্পর্ক নেই)। অর্থাৎ বৃটিশ শাসনামলের

www.pathagar.com

আরাকান বিভাগের চাইতে বর্তমান আরাকান রাজ্য হল আয়তনে অনেক ছোট। বাংলাদেশের সঙ্গে লাগোয়া হচ্ছে মিয়ানমারের দুটি অঙ্গরাজ্য। এর একটি হল চীন। যা হল বাংলাদেশের রাঙামাটি, বান্দরবন সংলগ্ন। এই চীন রাজ্যে বাস করেন একাধিক উপজাতি। এসব উপজাতির অনেকে আবার বাস করেন বাংলাদেশেও। দৃষ্টান্ত হিসাবে কুকিদের নাম উল্লেখ করা যায়। এইসব উপজাতীয় মানুষ অবাধে দুই দেশের মধ্যে এখনো যাতায়াত করে থাকেন। বাস্তবে বাধা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ঠিক করা যাচ্ছে না, তারা কোন দেশের নাগরিক। মিয়ানমারের রাখাইন প্রে অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে লাগোয়া হল বাংলাদেশের বন্দরবন ও কক্সবাজার জেলা। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সাধারণ সীমান্ত হল ২৮১ কিলোমিটারের কাছাকাছি। সাবেক পাকিস্তান আমলে আমরা ভাবতে পারিনি এই সীমান্ত হয়ে উঠতে পারে এতটা অশান্ত ও অনিশ্চিত। কিন্তু এখন এই সীমান্ত হয়ে উঠেছে যথেষ্ট অশান্ত ও অনিশ্চিত। আরাকনের ইতিহাসে দেখা যায়, বার্মার মূল ভূখণ্ডের একজন রাজা ৮০৭ হিজরীতে(১৪০৪খৃ) তখনকার আরাকান অধিকার করেন। আরাকানের পরাজিত রাজা , মেং সোয়া ম্উন ওরফে নর মেইখ্লা আরাকান থেকে পালিয়ে এসে গৌড়ের সুলতান জালাল উদ্দিন মুহাম্মাদ শাহ'র কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জালাল উদ্দিন আরাকানের রাজাকে সেনাপতি ওয়ালী খাঁন'র নেতৃত্বে ২০ হাজার সৈন্য প্রদান করেন, আরাকান রাজ্য জয় করে মেং সোয়া মউনকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্যে। সেনাপতি ওয়ালী খান ৮৩৪ হিজরীতে (১৪৩০খৃ) বার্মার রাজাকে পরাজিত করে আরাকান জয় করেন। কিন্তু তিনি মেং সোয়া মউনকে রাজা না করে নিজেই আরাকানের রাজা হয়ে বসেন। মেং সোয়া মউন কোনমতে আবার গৌড়ে পালিয়ে আসতে সমর্থ হন। সুলতান জালাল উদদীন এবার সিদ্ধি খান নামে আর একজন সেনাপতির অধীনে মেং সোয়া মউনকে ৩০ হাজার সৈন্য প্রদান করেন। সিদ্ধি খাঁনের সঙ্গে ওয়ালী খান যুদ্ধে পারজিত হয়ে পালিয়ে যান। ওয়ালী খানের সৈন্যগণ সিদ্ধি খানের দলে যোগ দেন। এই সমুদয় সৈন্য থেকে যান আরাকানে। আরাকানে থেকে যাওয়া গৌড়ের এই মুসলীম সৈন্যদের বংশধররাই হলেন প্রকৃত রোহিঙ্গা মুসলমান। মেং সোয়া মউন আরাকানে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। যার নাম দেন ম্রোহং বা রোহং। রোহঙ্গের অধিবাসী মুসলমানদের তাই নাম হয় রোহিঙ্গা। আরাকানের অনেক রাজা সেদেশে চট্টগ্রাম থেকে অনেক মুসলমানকে নিয়ে যান চাষাবাদ করবার জন্যে। এরাও ক্রমেই পরিচিতি পান রোহিঙ্গা হিসাবে। আরাকানের ইতিহাসে অনেক রাজার থাকতে দেখা যায় দুটি করে নাম। যার একটি হল আরাকানী আর একটি হল মুসলমানী। যেমন মেং সোয়া মউন মুসলমানী নাম নেন, সমুন খান। মিন খামাউংগা মুসলমানী নাম নেন, হোসেন শাহ। আরাকানী ১৪ জন রাজার এরকম দু'টি করে নাম পাওয়া যায়। এদের মুদ্রিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে; যা সুরক্ষিত আছে বৃটিশ মিউজিয়ামে। এদের নাম এইসব মুদ্রায় লিখিত হয়েছে আরবি ফারসি অক্ষরে, গৌড়ে

www.pathagar.com

মুদ্রিত মুদ্রার অনুকরণে। কেবল তাই নয়, এইসব রাজাদের মুদ্রায় অনেকের এক পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে কালিমায়ে তৈয়বা। এসব থেকে উপলব্ধি করা চলে আরাকানে বাংলার মুসলিম সুলতানদের সংস্কৃতিক প্রভাবের সম্বন্ধে। আরাকানের একটি বিখ্যাত মসজিদ হল বন্দর মোকাম। এটা আরাকনের বর্তমান রাজধানী সিতওয়ে(আগের নাম আকিয়াব)তে অবস্থিত। মসজিদটির স্থাপত্য হল গৌড়ের মসজিদের অনুরূপ। আমরা জানি, বন্দর শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে ফারসি ভাষা থেকে। বন্দর শব্দের অর্থ নদী বা সমুদ্র উপকূলে জাহাজ ভিড়বার জায়গা। মোকাম শব্দটা আরবি। কিন্তু বাংলা ভাষায় এসেছে ফারসি ভাষার মাধ্যমে। মোকাম বলতে বোঝায় বাড়ি বা আশ্রয়স্থলকে। বন্দরমোকাম নামটা বাংলা। আরাকানী মুসলিম স্থাপত্যে পড়েছে সুলতানী আমলের বাংলার প্রভাব। চট্টগ্রামে আছে বাবা বদরের দরগা। আরাকানেও আছে বাবা বদরের দরগা। আরাকানে কেবল আরাকানের মুসলমানেরা নন, রাখাইনরাও বাবা বদরকে করেন শ্রদ্ধা। এক সময় রাখাইন মেয়েরা আরাকান মুসলমানদের অনুকরণে পর্দা করতেন। রাখাইনরা আরাকানী মুসলমানদের মতই গো মাংস ভক্ষণ করেন। যেটা মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ডের বৌদ্ধরা করেন না বলেই শুনেছি। অর্থাৎ এক পর্যায়ে আরাকানী মুসলমানরা সমগ্র আরাকানবাসীর ওপরই বিস্তার করেছিলেন তাদের সংস্কৃতির প্রভাব। আরাকানের রাজারা বাংলাভাষা জানতেন এবং বাংলা সাহিত্যের কদর করতেন। তাই আরাকানের রাজসভায় সমাদর পেতে পেরেছিলেন দৌলত কাজী ও আলাওলের মত কবি। রোহিঙ্গা মুসলমানদের আজ অবজ্ঞা করা হচ্ছে। কিন্তু আরাকানের ইতিহাসে তাদের আছে বিশেষ অবদান। এছাড়া বৃটিশ শাসনামলে প্রধানত আরাকানী মুসলমানরা করেছেন সরকারী চাকরি। আরাকানের পুলিশ বিভাগ বিশেষভাবে ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে। তারাই ছিলেন আকিয়াব বন্দরে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী। আকিয়াব ও চট্টগ্রামের মধ্যে যেসব নৌযান চলাচল করতো, তাদের মাঝিমাল্লা ছিলেন আরাকানী মুসলমান। ইংরেজদের পর আরাকান পরিচালনা করেছেন সে দেশের মুসলমানরা। এ হল রোহিঙ্গা মুসলমানদের পরিচয়।

আরাকানের রাখাইন ও অন্যান্য অমুসলমান মানবগোষ্ঠি হল প্রধানত মঙ্গলীয় মানবধারার। বর্মা এবং আরাকানের মোঙ্গলীয় মানবধারার মানুষকে এক সময় বাংলাভাষায় ঢালাওভাবে বলা হত মগ অথবা মঙ। খৃস্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মগদের একটি অংশ হয়ে ওঠে ভয়ংকর জলদস্যু। এরা হাত মেলায় পুর্তগীজ জলদস্যুদের সাথে। এরা লুটপাট করতে থাকে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অংশে। শয়ে শয়ে মানুষকে ধরে নিয়ে বিক্রি করে কৃতদাস রূপে। এদের এই অত্যাচারে ফলে মোঘল শাসনামলে বাংলাদেশের অনেকাঞ্চল হয়ে পড়ে জনশূন্য। এ থেকে বাংলাভাষায় উদ্ভব হতে পেরেছে 'মগের মুলুক' কথাটার। আরাকানের রাজসভায় একদিকে যখন চলেছে বাংলা সাহিত্যের চর্চা, তখন অন্যদিকে বাংলাদেশে

www.pathagar.com

হয়েছে মগদের ভয়াবহ অত্যাচার। এ যুগে ঐরকম অত্যাচার ফিরে আসা আর সম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু আরাকানে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ওপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছে, তা আমাদের কিছুটা মনে করে দিচ্ছে সেই পুরানো যুগের মগদের অত্যাচারেরই কথা। আরাকান হয়ে উঠেছে মাগর মুল্লুক।

দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি ছেলে ভোলানো ছড়া হল এরকম–

ভোয়াং ভোয়াং ভোয়াং
তর বাপ গিয়ে রোয়াং ॥
রোয়াং এর টিয়া বরুনা পান।
তর মারে কইছদে না কাঁদে পান ॥

এই ছড়ার সাধারণ বাংলা করলে দাঁড়ায়– 'বাছারে বাড়ি গিয়ে তোর মাকে কাঁদতে মানা কর। তোর বাবা গিয়েছে রোয়াং(আরাকান)। সেখান থেকে তিনি আনবেন অনেক টাকা। তোদের ঘরে আর দুঃখ থাকবে না।' কিন্তু অতীতে যাইহোক, আরাকানে গেলে এখন আর আগের মত আয় রোজগারের উপায় হয় না। আরাকান একটা ছোট দেশ। ভৌগলিক আয়তনে মাত্র ৩৬৭৭৮ বর্গকিলোমিটার (১৪২০০ বর্গমাইল)। এই ক্ষেত্রফলের আবার মাত্র দশ ভাগের এক ভাগ জমিতে যথাযথভাবে চাষাবাদ করা যায়। দেশটাতে এখন অভাব অনটন যথেষ্ট। এর মধ্যে যদি বাইরে থেকে মানুষ যেয়ে সে দেশে ভিড় করে তবে সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। বাংলাদেশ থেকে যাতে আর বেআইনিভাবে মানুষ আরাকানে না যেতে পারে সেজন্য বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকি জোরদার করতে হবে। সেই সঙ্গে আবার মিয়ানমার সরকারকেও এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যাতে করে বাংলাদেশে আরাকান থেকে শরণার্থী আসার অবস্থা সৃষ্টি না হতে পারে। আরাকান থেকে রোহিঙ্গাদের ঠেলে না দেয়া হয় বাংলাদেশী হিসাবে। আমরা আশা করবো রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান হতে পারবে শান্তিপূর্ণভাবে। আমাদের দেশের কিছু পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে ১৯৭১ সালে ভারত যেমন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে যাওয়া শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিল, রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরও বাংলাদেশে একইরকমভাবে আশ্রয় দেবার কথা। কিন্তু ভারত ও বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে কোনভাবেই তুলনা করা যায় না বর্তমান অবস্থার। ভারত চেয়েছিল শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ অবস্থার সৃষ্টি করতে। যাতে সে সাবেক পাকিস্তানকে ভেঙে দিতে পারে। ভারত তার এই উদ্দেশ্য সাধনে সফল হতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশ মিয়ানমার থেকে আরাকানকে পৃথক করতে চাইতে পারে না। কারণ, বাংলাদেশের সামরিক শক্তি সীমিত। আর সে পেতে পারবে না তার এরকম কোন প্রচেষ্টায় বিশ্ব জনমতের সমর্থন।

১৯৪৬ সালে গঠিত হয় আরাকান মুসলিম লীগ। আরাকান মুসলিম লীগ চায় উত্তর আরাকানে একটা পৃথক রাষ্ট্র গড়তে। কিন্তু জিন্নাহ সাহেব আরাকান মুসলিম লীগের

www.pathagar.com

এই দাবিকে সমর্থন দেন না। কারণ, তিনি মনে করেন ১৯৩৭ সালের পর থেকে বার্মা হয়ে পড়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি পৃথক রাজ্য। এর সঙ্গে বৃটিশ-ভারতের আর কোন যোগাযোগ নেই। তিনি মনে করেন ভারতের মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গড়বার আন্দোলনকে আরাকানের পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গড়বার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলে বৃটিশ ভারতে পাকিস্তান আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হয়। বার্মা স্বাধীন হবার ঠিক পরে পরে আরাকানী মুসলমানদের একাংশ বার্মা থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন হবার লক্ষ্যে বিদ্রোহ করেন। কাসেম রাজা পেশায় ছিলেন একজন ধিবর। কিন্তু তিনি সংগঠন ও নেতৃত্বের গুণে হয়ে ওঠেন আরাকানের, বিশেষ করে উত্তর আরাকানের একজন বিশিষ্ট নেতা। তার নেতৃত্বে গঠিত হয় আরাকানী মুসলিম মুজাহিদ বাহিনী। এই মুজাহিদ বাহিনী বিদ্রোহ করে। কাশেম রাজা পাকিস্তানের কাছে সাহায্য চান। কিন্তু পাকিস্তানের কাছ থেকে তিনি কোন সাহায্য পাননি। কাশেম রাজা ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে আসেন ও ধরা পড়েন। এর ফলে আরাকানী মুসলিম মুজাহিদ বিদ্রোহ স্তিমিত হয়ে পড়ে। আরাকানে মুসলিম জাতীয়তাবাদ আছে। বিশেষ করে উত্তর আরাকানে। সেখানকার অধিবাসীদের ভাষা হল চট্টগ্রামের বাংলা। আরাকানের মুসলিম জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশ সরকার কোন প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করছে না। এক্ষেত্রে সে অনুসরণ করে চলেছে সাবেক পাকিস্তানের অনুশ্রিত পররাষ্ট্র নীতিকেই। আমরা মিয়ানমারের সঙ্গে কোন সংঘাত চাইতে পারি না।

বৃটিশ শাসনামলে চীন ও উত্তর বার্মার মধ্যে স্থাপিত হয়(১৯৩৬-৩৮) বিশেষ স্থল পথ। যা বার্মা রোড নামে খ্যাত হয়ে আছে। চীন চাচ্ছে এই সড়ককে মিয়ানমারের মধ্যে দিয়ে আরো বাড়িয়ে বাংলাদেশের টেকনাফের সঙ্গে দক্ষিণ চীনের যোগাযোগ স্থাপন করতে। বাংলাদেশের সঙ্গে সে যৌথভাবে টেকনাফে গড়তে চাচেছ গভীর সমুদ্র বন্দর। বর্তমানে বাংলাদেশের টেকনাফ তাই ভূ-রাজনৈতিক দিক থেকে হয়ে উঠেছে গুরুত্ববহ। চীন ইচ্ছা করলে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সহায়ক হতে পারে। যদিও সম্ভবত চীন এখন আর মিয়ানমারের ওপর আগের মত অতটা প্রবল প্রভাব ফেলতে পারবে না।

***

www.pathagar.com

উপজাতি নিয়ে রাজনীতি

বৃটিশ শাসনামলে আদমশুমারের আরম্ভ হয় ১৮৭১ সাল থেকে। আদমশুমারের রিপোর্টে কেবল উপমহাদেশের লোকজনের সংখ্যার হিসাবই থাকত না, থাকত এই উপমহাদেশের মানুষ সম্বন্ধে বহু তথ্য। যাদের আমরা সাধারণভাবে উল্লেখ করি উপজাতি হিসাবে, তাদের আদমশুমারের রিপোর্টে প্রথম দিকে উল্লেখ করা হত অ্যানিমিষ্ট (Animist) বা আত্মাউপাসক হিসাবে। পরে ১৯৩১ সালের আদমশুমারের রিপোর্টে যাদের এক সময় বলা হত অ্যানিমিষ্ট বা আত্মাউপাসক তাদের উল্লেখ করা আরম্ভ হয় ট্রাইব (Tribe) হিসাবে। (kingsley Davis; The population of India and Pakistan, Prenceton university press. 1951)। ট্রাইব কথাটার বাংলা করা হয় উপজাতি। উপজাতি বলতে বোঝানো হয় এমন জনগোষ্ঠীকে, যারা বাস করে প্রধানত অরণ্যে। যাদের জীবন ধারা হয়ে আছে, কতকটা বন্য আদিম যুগের মত। এরা অনেকে হল আহার্য আহরক(Food gatherer) আবার কেউ হল কিছুটা আহার্য উৎপাদক (Food Producer)। যারা আহার্য আহরক, তারা বনে জঙ্গলে ফলমূল আহরণ ও পশুপাখি শিকার করে খায়। যারা কিছুটা আহার্য উৎপাদক তারা ফসল উৎপাদন করে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বীজ বপন করে। কিন্তু এরা প্রকৃত খাদ্য উৎপাদকদের মত লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ করতে জানে না। এদের চারপাশের জনসমষ্টি হল খাদ্য উৎপাদক। যারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে এবং গবাদী পশু প্রতি পালন করে। যাদের আছে একটা লিখিত ভাষা। যারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে নগর জীবন বা সভ্যতা। যাদের বলা যায় প্রকৃত জাতি। বৃটিশ আমলে এদেশের মানুষকে নিয়ে নৃতাত্ত্বিকরা যে গবেষণা করেছেন তাতে ট্রাইব কথাটার প্রয়োগ সব ক্ষেত্রে হতে পারে নি সুস্পষ্ট। বর্তমানে নৃতাত্ত্বিকরা অনেকেই চাচ্ছেন না আর ট্রাইব শব্দটা ব্যবহার করতে। কারণ শব্দটা হয়ে উঠেছে একাধিক অর্থবহ। ইংরেজী ভাষায় Aborigines শব্দটা এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে। ল্যাটিন ভাষার Ab মানে হলো প্রথম আর origine শব্দের অর্থ হল আরম্ভ। Aborigine বলতে বোঝায় এমন মানুষদের যারা কোন দেশে আগে থেকে বা প্রথম থেকে আছে। যেমন অষ্ট্রেলিয়ার কালো মানুষেরা। ইউরোপ থেকে সাদা মানুষ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উপনিবিষ্ট হতে আরম্ভ করে। অষ্ট্রেলিয়ার কালো মানুষকে তাই বলতে হয় অষ্ট্রেলিয়ার Aborigine। অস্ট্রেলিয়ার Aborigine রা পড়েছিল প্রাচীণ প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিতে। নিউজিল্যান্ডে অ্যারিজিন বলতে বোঝায় মাওরিদের। মাওরিরা পড়েছিল নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির অবস্থায়। অর্থাৎ তারা বানাত খুব পালিস করে পাথরের অস্ত্র। মাওরিদেও বলা যায় নিউজিল্যান্ডের অ্যাবরিজিন। এই একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেড ইন্ডিয়ান মানব সমষ্টিকে বলা যেতে পারে সেখানকার অ্যাবরিজিন। অ্যাবরিজিন

www.pathagar.com

শব্দটার বাংলা করা হয় আদিম নিবাসী অথবা আদিবাসী। এই অর্থে বাংলাদেশে বৃহত্তর জনসমাজকে ধরতে হয় আদিবাসী। কারণ তারা বাইরে থেকে ইউরোপীয়দের মত এসে এদেশ অধিকার করেনি। তারা এদেশেরই ভূমিজ সন্তান। এই দাবির পেছনে এখন দেওয়ায় চলে মাটি খুঁড়ে পাওয়া প্রভূত পত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ। এক্ষেত্রে দুটি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচ্য। একটি হল আদিম যুগ; আর একটি বিষয় হলো আদিম সংস্কৃতি। আদিম যুগে সব মানুষের পূর্ব পুরুষই ব্যবহার করেছে প্রস্তর অস্ত্র। কিন্তু পরে কিছু মানুষ আরম্ভ করেছে ধাতু দিয়ে তৈরী অস্ত্র ও জিনিস পত্রের ব্যবহার। গড়ে তুলছে সভ্যতা বা নগর জীবন। কিন্তু অনেক অঞ্চলে কিছু মানুষ থেকে গেছে সংস্কৃতির দিক থেকে প্রস্তর যুগের জীবনধারায়। সংস্কৃতির দিক থেকে এদের আদিম বলা গেলেও সময়ের বিচারে এদের আদিম বলা যায় না। নিউজিল্যান্ডের মাওরিরা যখন পড়েছিল নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিতে তখন ইউরোপের মানুষ ব্যবহার করছিল লোহা দিয়ে তৈরী অস্ত্র সস্ত্র ও জিনিসপত্র। যদিও এক সময় ইউরোপের মানুষও কোন ধাতুর ব্যবহার জানত না, করত প্রস্তর অস্ত্রের ব্যবহার। ইউরোপের অনেক জায়গার মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে প্রাচীন নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্র। কিন্তু বাংলাভাষায় এখন সময়ের দিক থেকে আদিম আর সংস্কৃতির দিক থেকে আদিম এই দুটি ধারণার মধ্যে পার্থক্য করা হচ্ছে না। ফলে দেখা দিচ্ছে সমস্যা। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় প্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তাদের পাওয়া গিয়েছে মাটির খুব উপরিভাগে। তাই বলতে হয় তাদের বয়স্কাল বেশি নয়। এসব অস্ত্র যারা ব্যবহার করেছে, তারা সংস্কৃতির দিক থেকে আদিম হলেও সময়ের বিচারে আদিম নয়। কেন কিছু মানুষ বনে জঙ্গলে প্রাচীন সংস্কৃতিকে আঁকড়ে থাকল আর অন্য মানুষ সৃষ্টি করল সভ্যতা, তার উত্তর এখনও দেওয়া যায় না। তবে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, যেসব মানুষ এখনও প্রস্তর যুগে পড়ে আছে বা কিছুদিন আগেও ছিল তাদের মনোভাব হল খুবই রক্ষণশীল। তারা সহজেই নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে চায় না। অনুসরণ করে চলতে চায় পূর্বপুরুষের গতানুগতিক জীবনকে। অর্থাৎ তাদের অনাগ্রসরতার একটা কারণ, তাদের অতি রক্ষণশীল মনোভাব। নতুন কিছু করতে না চাওয়া। কিন্তু সব ক্ষেত্রে একথা খাটে না। বরফের দেশে মানুষ ধাতু দিয়ে অস্ত্র না বানিয়ে অস্ত্র বানিয়েছে পশুর হাড় দিয়ে। কারণ ধাতুদ্রব্য সেখানে সহজলভ্য নয়। সম্ভব নয় সেভাবে আগুন জ্বেলে ধাতু গলানো। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে তার প্রাকৃতিক পরিবেশ। সব প্রাকৃতিক পরিবেশের মানুষের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি সমভাবে হতে পারে না। অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা পশু পালন জানত না। এর কারণ সেখানে ছিল না পালনযোগ্য কোন পশু। এক একটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে এক একটি খাদ্যশস্যকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের বাংলা ভাষী মানুষের পূর্ব পুরুষ ধান চাষ করছে বহুদনি আগে থেকে। বাংলাদেশে খাল বিলের ধারে যথেষ্ট বন্য ধান স্বাভাবিকভাবে জন্মাতে দেখা যায়। এই বন্য ধান থেকে বাছায় করে তারা

www.pathagar.com

করতে পেরেছে আবাদযোগ্য ধানের উদ্ভব। বাংলাদেশের মানুষ নৌকা বানিয়েছে। নৌকা করে সে নানা জায়গায় নদীপথে আসা যাওয়া করেছে। কেবল যে সে নৌকা যোগে নদীপথে যাতায়াত করেছে তা-ই নয়, বড় বড় নৌকা বানিয়ে করেছে সমুদ্র যাত্রা। নৌকা বানাবার মত বড়বড় গাছ এখানে ছিল সহজলভ্য। যা থেকে পাওয়া যেত বড় বড় নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ। আর যা দিয়ে তারা বানিয়েছে নৌকা। করেছে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য। সহজ হয়েছে গড়া সভ্যতা বা নগর সংস্কৃতি। এটা তারা করতে পেরেছে আপন চেষ্টায়। বাংলাদেশের মাটিতে তারা গড়েছে উন্নত সভ্যতা, এদেশের ভূমিজ সন্তান হিসাবে। তারা থাকেনি প্রাচীন জীবন প্রণালীকে আকড়ে। কিন্তু এই ইতিহাসকে এখন যেন বিকৃত করবার চেষ্টা চলেছে। প্রমাণ করার চেষ্টা চলছে সাঁওতাল ও চাকমাদের মত উপজাতি হল এদেশের আদিবাসী। কিন্তু বাংলাদেশের মূল জনসমাজ তা নয়। যে ধারণাকে সমর্থন করা যায় না। উপজাতি নিয়ে করা হচ্ছে বিশেষ ধরনের রাজনীতি। যা হয়ে উঠতে পারে বাংলাদেশের জন্যে বিশেষ ক্ষতির কারণ। যেটাকে আমরা দেশের স্বার্থে হতে দিতে পারি না।

ভারতের এক সময়ের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন মুচকন্দ দূবে। তিনি ভারতে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম 'Indian's Foreign Policy'। সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ (Nation; ২ সেপ্টেম্বর, ২০১২), এই বইতে দূবে বলেছেন- শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক উন্নত হতে পারে নি। শ্রীলঙ্কার সাথে ভারতে সম্পর্কের অবনতি ঘটার কারণ হল, শ্রীলঙ্কার তামিল গেরিলাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ। ভারত শ্রীলঙ্কার তামিল নেতা প্রভাকরণকে তার তামিল স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রনোদনা প্রদান করেছিল। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতে সম্পর্কের অবনতির একটা কারণ হল, ভারত কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বাধীনতাকামী চাকমাদের ভারতে আশ্রয় প্রদান। তার এই বই পড়ে উপলব্ধি করা যায় যে, চাকমা নেতা সন্তু লারমার প্রকৃত শক্তির উৎস হচ্ছে ভারত। ভারত ভবিষ্যতেও বাংলাদেশের তথাকথিত উপজাতিদের নিয়ে করতে পারে এই রকমের রাজনীতি।

পরিস্থিতি নানা দিক থেকেই জটিল হচ্ছে। ভারতের আসামে, বোড়দের এক সময় বলা হত উপজাতি। কিন্তু এখন তারা হতে চলেছে একটা পৃথক জাতি। এরা আসামে বাংলাভাষী মুসলমানদের ওপর করছে হামলা। কেন এরা এরকম হামলা করছে তার প্রকৃত কারণ আমরা জানি না। কারণ আসামে বসবাসকারী বাংলাভাষী মুসলমান বোড়দের দাবির বিরোধী ছিল না। সারা আসাম প্রদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ হল বাংলাভাষী মুসলমান। এরা সে দেশে বাস করছে বহুকাল ধরে। বরাবরই আসামের ধুবড়ি-গোয়ালপাড়া অঞ্চলের মানুষের সাধারণ ভাষা হলো বাংলা। আসামের কাছার (শিলচর) অঞ্চলের মানুষের সাধারন ভাষা হল বাংলা। যাকে বলে প্রকৃত আসামী ভাষা, যা এখন হল আসামের প্রাদেশিক সরকারের

www.pathagar.com

সরকারী ভাষা, তার উদ্ভব হয়েছে আসামের শিব-সাগর ও ডিব্রুগড় জেলায়। আসামী ভাষা বাংলাভাষার খুব কাছের ভাষা। বাংলাভাষী মানুষের পক্ষে আসামী (অহম) ভাষা শেখা মোটেই কঠিন নয়। আসামের বাংলাভাষী মুসলমান আসামী ভাষাকে আয়ত্ব করে নিয়েছে মাতৃভাষারই মত। কিন্তু বোড়দের ভাষা হল তিব্বতী ভাষার মত। বোড় ভাষার সাথে আসামী ও বাংলা ভাষার ব্যবধানটা হল যথেষ্ট বড়। তাই সম্ভবত বোড়দের সঙ্গে সৃষ্টি হতে পারছে আসামের বাংলাভাষী মুসলমানদের বিরোধ। বোড়রা বলছে বাংলাভাষী মুসলমান আসলে হল বাংলাদেশী। তাই আসামে বাস করবার তাদের কোন অধিকার নেই। তাদের চলে যেতে হবে বাংলাদেশে। অথচ ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদশের চুক্তি হয়েছিল ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসের আগে যারা বাংলাদেশ (পূর্ব পাকিস্তান) থেকে আসামে গিয়েছে তাদের ধরতে হবে ভারতে নাগরিক। এর পরে যারা বাংলাদেশ থেকে আসামে গিয়েছে তারা যদি একটানা সে দেশে দশ বছরের অধিক সময় ধরে সে দেশে বসবাস করে থাকে, তবে তারা পেতে পারবে ভারতের নাগরিকত্ব। কেবল ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চের পরে যারা আসামে গিয়েছে শুধু তাদেরই বাংলাদেশী বলে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো যাবে। (Outlook, 3 September 2012)। বাংলা ভাষায় কথা বলে এমন সব মুসলমান বাংলাদেশী নয়। কিন্তু ভারতে এখন মহল বিশেষের পক্ষ থেকে সব বাংলাভাষী মুসলমানকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলেছে বাংলাদেশী হিসাবে। পশ্চিম বাংলার বাংলাভাষী মানুষের শতকরা ২৫ ভাগ হল মুসলমান। তারাও নিকট ভবিষ্যতে আসামে বাংলাভাষী মুসলমানের মত পড়তে পারে বিপদে। অবশ্য পশ্চিবঙ্গে বোড়দের মত কোন উপজাতি নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'বোড়' নামের অর্থ হলো তিব্বত। বোড়রা এক সময় আসামে এসেছে দক্ষিণ তিব্বত থেকে।

বাংলাদেশের সাঁওতাল ও চাকমাদের ভারতের কোন দল অথবা সরকার ইন্ধন যোগাতে পারে। আর এই ইন্ধন যুগিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে আরও দূর্বল করতে পারে। মুচকন্দ দূবে বলেছেন- ভারত এক সময় পাবর্ত্য চট্টগ্রামের চাকমা বিদ্রোহীদের প্রশ্রয় দিয়েছিল। দূবে তার চাকরি থেকে অবসর পান ১৯৯১ সালে। আমরা অনেকেই পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত নই। মুঘল আমলে বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। এক একটি বিভাগকে বলা হত সরকার। প্রত্যেক সরকারকে শাসন করতেন একজন ফৌজদার। ফৌজদার শাসন করতেন কিন্তু ফৌজদারী মামলা ছাড়া আর কোন মামলার বিচার তিনি করতে পারতেন না। সাধারন মামলার বিচার করতেন কাজী। কাজীর বিচার এলাকাকে বলা হত জেলা। ইংরেজী District আর মুঘল আমলের জেলার ধারণা এক নয়। কিন্তু ইংরেজ আমলে District শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে জেলা শব্দটিকেই গ্রহণ করা হয়। 'জেলা' শব্দটি বাংলা ভাষায় এসেছে ফারসী ভাষার মাধ্যমে। শব্দটা আরবীতে হল 'জিলা'। ১৭৬০ সালে বাংলার নবাব

www.pathagar.com

মীর কাশেম চট্টগ্রাম সরকারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর কাছে। বৃটিশ শাসনামলে ১৮৬০ সালে সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রামকে বিভক্ত করে করা হয় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম মহাল। যা পরে পরিচিত হয় পাবর্ত্য চট্টগ্রাম জেলা হিসাবে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসিত হয়েছে অন্য জেলা থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র ভাবে; ১৮২২ সালের রেগুলেশান অনুসারে। এই রেগুলেশান অনুসারে সেই সব জেলাই শাসিত হয়েছে যাদের অধিবাসীর জীবনধারা ছিল অন্য জেলার মানুষের তুলনায় খুবই অনগ্রসর। চাকমারা লাঙ্গল দিয়ে চাষ করতে জানত না। তাদের মধ্যে ছিল না কোন কুম্ভকার ও লোহার কর্মকার। তারা মৃৎপাত্রের জন্যে নির্ভর করেছে বাঙালি কুম্ভকাররের ওপর। লোহা দিয়ে তৈরি দা কুড়াল খন্তার জন্যে নির্ভর করেছে বাঙালি কর্মকারের উপর। চাকমারা যে তাঁতে কাপড় বুনেছে সেই তাঁত ছিল খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের। এতে কেবল হাত দিয়ে কাপড় বুনানো হয়। এতে পায়ের কোন ব্যবহার করতে হয় না। বাংলাদেশে যাদের উল্লেখ করা হয় উপজাতি হিসাবে তাদের অধিকাংশের বাস হল পার্বত্য চট্টগ্রামে। এরা জীবন যাত্রার দিক থেকে এক সময় পড়েছিল কিছুটা নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতির পর্বে। কিন্তু সময়ের দিক থেকে তা বলে এদের বলা যায় না ওইসব উপজাতি হল ওই অঞ্চরের আদিম বাসিন্দা; আর এক কথায় আদিবাসী। এরা মাটিতে গর্ত করে বীজ বুনে চাষ করত। যাকে বলে জুম চাষ। জুম চাষ করবার জন্যে এসব অঞ্চলে বন পুড়িয়ে চাষের জমি বের করা হয়। তার পর সেই জমিতে গর্ত করে বীজ লাগিয়ে উৎপন্ন করা হয় ফসল। কিন্তু এক জমিতে বেশিদিন জুম চাষ করা যায় না। কারণ, জমির উপরিভাগের উর্বর মাটি পাহাড়ী অঞ্চলে বৃষ্টির পানিতে সহজেই ধুয়ে যেতে থাকে। ফলে জমি হয়ে ওঠে অনুর্বর। জুম চাষীরা এ কারণে বাধ্য হয় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেয়ে জুম চাষ করত। জুম চাষ যে কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি করে তা নয়। উত্তর ভারতের উপজাতিরাও জুম চাষ করে থাকে। কিন্তু সেখানে এই পদ্ধতিকে বলে 'দাহি'। মিয়ানমারের এই পদ্ধতিকে চাষ করাকে বলে 'তুঙ্গিয়ান'(Tong-gyan)। ফিলিপাইনে বলে 'গেইংএস' (Gainges)। জুম চাষের বিষয় বলতে হচ্ছে কারণ, চাকমা নেতা শন্তু লারমার দাবী হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পৃথক করে গড়তে হবে জুমল্যান্ড। কিন্তু জুম পদ্ধতিতে চাষ কেবল পার্বত্য চট্টগ্রামেই যে প্রচলিত তা নয়। ভারতের সূদুর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত কর্ণাটক প্রদেশে উরালী উপজাতির মানুষও এক সময় জুম চাষ করতো। সেখানে একে বলা হয়েছে কুমারী। এখন এই চাষ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। উরালীরা দেখতে কতকটা সাঁওতালদের মত। তাদের গায়ের রং কালো। চুল সাঁওতালদের মত। পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতিদের সঙ্গে তাদের কোন চেহারার মিল নেই। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা সকলেই হল মঙ্গলীয় শাখাভুক্ত মানুষ। কিন্তু এরা তা নয়। এরা হলো ইন্ডো-অস্ট্রালয়েড। শন্তু লারমা কি ভারত থেকে উরালীদের মতো উপজাতিদের আসতে দেবেন পার্বত্য চট্টগ্রামে জুম প্রথায় চাষ করবার জন্যে ?

www.pathagar.com

উরালীরা অবশ্য যথেষ্ট পরিমানে বন্য ফলমূল আহরণ এবং পশুপাখি শিকার করে তাদের নিজেদের আহার্যের সংস্থানের প্রয়োজনে। আর যাপন করে অর্ধ যাযাবার জীবন। এরা আছে চাকমাদের তুলনায় অনেক অনগ্রসর হয়ে। বলা হচ্ছে বাংলাদেশে উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু এটা কি বাস্তবে সম্ভব? উপজাতি সংস্কৃতি বন্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাংলাদেশে থাকছে না আর আগের মত বন। অন্যদিকে যারা এক সময় বনে বাস করত তাদের সন্তান সন্ততিরা এখন লেখাপড়া শিখে অনেকেই চাচ্ছে শহরে বাস করতে। অর্থাৎ নগর জীবন গ্রহণ করতে। এছাড়া উপজাতিরা বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে খৃষ্টান ধর্ম। খৃষ্টান হবার পর তারা অনুকরণ করতে চাচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে। অর্থাৎ উপজাতি মানুষ নিজেরাই নিজেদের সংস্কৃতি বা জীবন যাপনের ধারাকে আর চাচ্ছে না ধরে রাখতে। বাংলাদেশে উপজাতি মানুষ বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে। বাংলা হয়ে উঠেছে তাদের সাধারণ ভাষা। বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে (২০০৭)। এত বলা হয়েছে 'আদিবাসী' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত থেকে। 'আদি' অর্থ হল 'মূল' এবং 'বাসী' অর্থ 'অধিবাসী'। সুতরাং আদিবাসী কথাটির অর্থ ধরা যায় দেশীয় লোক (Indigenous people)। সঙ্গত কারণে তাই প্রশ্ন উঠছে আমরা অর্থাৎ বাংলা ভাষী মুসলমান কি এদেশে বিবেচিত হব বাহিরাগত হিসাবে? এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এক ধরনের রাজনীতির প্রভাব। সেটাকে আমরা কোন ভাবেই সমর্থন দিতে পারি না। কারণ, সেটা হয়ে উঠবে হবে আমাদের জন্যে আত্মঘাতি। আমরা নিজভূমে হয়ে উঠবো পরবাসী। থাকবে না আমাদের নিজের বলে কোন দেশ।

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার নিয়ে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক উইলিয়াম ক্রুক (W Crooke) ১৯২৪ সালে 'Islam in India' নামক বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে বলেন যে, পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে এক সময় ছিল বহু বৌদ্ধের বাস। এই বৌদ্ধরা গ্রহণ করে ইসলাম। তাই বাংলা প্রদেশের উত্তর পূর্ব ভাগে মুসলমানের সংখ্যা হতে পেরেছে এত বেশি। ক্রুকের মতকে অনেক দিক থেকে সমর্থন করা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে মধ্য এশিয়ার তুর্কি মুসলমানরা এসে রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তাদের আসার অনেক আগেই সম্ভবত ইসলাম এদেশে প্রচারিত হতে পেরেছিল। বাংলাদেশে দুটি প্রাচীন জয়গা হল নওগাঁর পাহাড় পুর ও কুমিল্লার ময়নামতি। এই দুটি জায়গায় আব্বাসী খলিফাদের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। পাহাড়পুরে পাওয়া গিয়েছে খলিফা হারুন অর রশিদের মুদ্রা। এ থেকে মনে হয় আরব মুসলিম বণিকেরা এদেশে আসতেন ব্যবসা বাণিজ্য করতে। আর তাদের মাধ্যমে প্রথমে হতে পেরেছিল বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে ইসলাম প্রচার। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে ইসলাম

www.pathagar.com

প্রচারিত হয়। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষের ছিল ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য যোগাযোগ। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবার কারণে সম্ভবত এদেশের বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণে পেয়েছিল বিশেষ প্রনোদনা। তাদেরকে কেউ জোর করে মুসলমান করেনি। যেমন জোর করে ইসলাম প্রচারিত হয়নি মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষের মধ্যে। যারা এক সময় প্রধানত ছিল বৌদ্ধ এবং পরে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে ইসলাম। বাংলাদেশে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে মানসিক দিক থেকে দূরত্ব ছিল। আজকের বাংলাদেশ সৃষ্টি হবার মূলে আছে বাংলাভাষী মুসলামানের দান। বাংলাভাষী হিন্দু পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি। কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমান চেয়েছে। মনে হয় এটা সেই প্রাচীন বৌদ্ধ স্বতন্ত্রবাদী মানসিকতার কিছুটা পরিচয়বহ। কিন্তু বাংলাদেশের মূল জনসমষ্টির কথা সেভাবে আলোচনা না করে আলোচনা করা হচ্ছে উপজাতিদের কথা। আর হিন্দু সংস্কৃতির কথা। বলা হচ্ছে দূর্গাপূজা হলো বাংলার সংস্কৃতির বিশেষ পরিচয়বহ। যে সব আলোচনা পড়লে মনে হয় বাংলাদেশে বাংলাভাষী মুসলমান যেন একটা অগন্তুক জাতি। এই উপমহাদেশে মধ্য এশিয়া থেকে মানুষ বহুবার এসে সাম্রাজ্য গড়েছে। বাংলাদেশে কুশান সম্রাটদের মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। হতে পারে বাংলাদেশের উত্তর ভাগ এক সময় ছিল কুশান সম্রাজ্যেরই অংশ। মানব ধারার দিক থেকে কুশানরা ছিলেন তুর্কি। ত্রয়োদশ শতাব্দীর যে সব মুসলমান বাংলাদেশ জয় করতে এসেছিলেন তারাও ছিলেন তুর্কি মানবধারারই মানুষ। তুর্কি ফৌজরা স্ত্রীকে সঙ্গে কওে এনেছিলেন না। তারা এদেশের কন্যারদের বিয়ে করে হয়ে উঠেছিলেন এদেশের মানব গোষ্ঠীরই অংশ। থাকেন নি বিদেশী হয়ে। কিন্তু আজ প্রমাণ করবার চেষ্টা হচ্ছে, বাংলাভাষী মুসলমান আসলে হল পরদেশী। আমরা এই ধরনের মিথ্যা ইতিহাস লেখার প্রতিবাদ না কর পারি না। উপজাতি নিয়ে নানা রকম রাজনীতি হচ্ছে। খৃষ্টান মিশনারীরা উপজাতিদের করছে খৃষ্টান। তারা উদ্দিপ্ত করছে মুসলিম বিরোধী মনোভাব। একটা বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে। যেটাকে সমর্থন করা যায় না। বৃটিশ শাসনামলে খৃষ্টান মিশনারীরা বাংলাদেশে প্রতাপশালী ছিল না। কারণ, বৃটিশ শাসকরা মনে করতেন মিশনারীদের প্রশ্রয় দিলে এদেশের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে পারে। যা ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে এদেশের বৃটিশ রাজের জন্যে। পাকিস্তান আমলেও খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ পরিচালিত হয়েছে অনেক সংযতভাবে। এর একটা কারণ ছিল সে সময়ের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সময় চাচ্ছিল বিভিন্ন দেশে ইসলামী শক্তিকে সংগঠিত করে কম্যুনিজম রুখতে। কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি আর নেই। মিশনারীরা এখন বিশ্ব জুড়ে ইসলামকে তাদের প্রতিপক্ষ ভাবছে। আর বিভিন্ন দেশে চাচ্ছে ধর্ম প্রচার করে ইসলাম বিরোধী শিবির গড়তে। বাংলাদেশে উপজাতিদের তারা খৃষ্টান করছে এবং তাদের মনে এখন বিশেষভাবে গড়ে তুলছে ইসলাম বিরোধী মনোভাব। যেটা একটা

www.pathagar.com

বড় ধরনের আন্তর্জাতিক খৃস্টান রাজনৈতিক চক্রান্তেরই অংশ। অনেক রকম রাজনীতি হচ্ছে উপজাতিদের নিয়ে। বাংলাদেশে সাঁওতাল উপজাতি নিয়ে রাজনীতি করতে চাচ্ছে এদেশের ওয়ার্কাস পার্টি। তারা রাজশাহী শহরে গত মাসের ৯ আগষ্ট বের করেছিল সাঁওতালদের নিয়ে একটা বিরাট মিছিল। এ অঞ্চলে বামপন্থীদের সাঁওতাল নিয়ে রাজনীতি অবশ্য নতুন নয়। পাকিস্তান হবার পরে বাম নেতৃত্বে চাঁপাই নবাবগঞ্জের নাচোল থানায় ঘটেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতাল রাজনীতির ফলে অনুরূপ কোন সাঁওতাল বিদ্রোহ আবার ঘটা অসম্ভব নয়। ভারতীয় অস্ত্র বাংলাদেশে যথেষ্ট অঘটন ঘটাতে পারে। ভারত এখন চাচ্ছে আমাদের জাতিসত্ত্বা সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে। এর বিপক্ষে আমাদের উচিৎ হবে বিশ্বের কাছে আমাদের জাতিসত্ত্বার প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরা। কিন্তু আমাদের আত্মপরিচয় নিয়ে বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেছে বলে আমাদের জানা নেই। বাংলাদেশের নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস নিয়ে খুব সামান্যই আলোচনা হয়েছে। অথচ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাঙ্গামাটির এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের সকল অধিবাসীকে বিবেচনা করা হবে বাঙালি হিসেবে। ১৯৭৩ সালের ৭ জুন সন্তু লারমার নেতৃত্বে চাকমারা গঠন করে শান্তি বাহিনী। ২০০১ সালের ৩১ মার্চ সন্তু লারমা গঠন করে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম। সংখ্যার দিক থেকে সাঁওতালরা এখন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপজাতি। এরপরে আসে চাকমাদের নাম। সন্তু লারমা চাচ্ছেন চাকমা ও সাঁওতালদের এক করে রাজনীতি করতে। সাঁওতালরা সাঁওতালী ভাষায় কথা বলেন কিন্তু এখন তারা বাংলাদেশে বাংলা ভাষার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছেন। তারা সবাই বলতে পারেন প্রঞ্জল সাধারণ বাংলা। তাছাড়া, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সাঁওতাল ভাষায় ঘটেছে প্রচুর বাংলা শব্দের অনুপ্রবেশ। চাকমাদের এখন আর কোন নিজস্ব ভাষা নেই। বাংলা হয়ে উঠেছে তাদের মাতৃভাষা। কিন্তু তবুও তোলা হচ্ছে তথাকথিত আদিবাসীদের স্বতন্ত্র ভূ-ভাগ গঠনের দাবী। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা তথা কথিত উপজাতিদের এভাবে জায়গা ছেড়ে দিতে যাবো কেন? এতে আমাদের কী স্বার্থ।

***

www.pathagar.com

উপজাতি প্রসঙ্গে আরো কথা

আমি গত মঙ্গলবার উপজাতি নিয়ে রাজনীতি শিরোনামে একটি সংবাদ নিবন্ধ লিখেছি। বর্তমান প্রবন্ধে চাচ্ছি উপজাতি প্রসঙ্গে আরো কিছু তথ্য প্রদান করতে। কারণ আমার ধারণা বাংলাদেশের রাজনীতিতে উপজাতি সমস্যা নিতে পারে যথেষ্ট জটিল রূপ। এ প্রসঙ্গে তাই আমাদের সচেতন হতে হবে। না হলে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব নিয়ে দেখা দিতে পারে বড় রকমের বিপর্যয়।

Ethnology শব্দের বাংলা সাধারণত করা হয় জাতিবিদ্যা। জাতিবিদ্যায় একটা জাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। এটা করতে যেয়ে আসে তার মানবধারা, ভাষা, ধ্যান ধারণা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা। গ্রীক ভাষায় এথ্‌নি (Ethnie) শব্দটির অর্থ হল জাতি। জাতি বলতে প্রাচীন যুগে গ্রীক ভাষায় বুঝিয়েছে এমন মানবসমষ্টিকে, যাদের আছে নিজস্ব ভাষা। জাতি বলতে বুঝিয়েছে এক ভাষায় কথা বলা মানুষকে। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরা দেতুসকে (৪৮৫-৪২৫ খৃঃ পূর্ব) বলা হয় জাতিবিদ্যার জনক। তিনি জাতি কথাটা প্রধানত এইভাবেই প্রয়োগ করেছেন। ভাষা বিহীন জাতি হয় না। তবে বাংলা ভাষায় 'জাতি' কথাটা হয়ে আছে যথেষ্ট অস্পষ্ট। বাংলাভাষায় জাতি বলতে অনেক সময় বোঝায় বিশেষ উপজীবীকার উপর নির্ভরশীল জনসমষ্টিকেও। জাতি কথাটা বহুবিধ অর্থের জন্যে আমাদের মনে এ সম্পর্কে সৃষ্টি হতে পারে নানা বিভ্রান্তি। উপজীবিকাকে নির্ভর করে আমাদের জনসমাজে বিভিন্ন জনসমষ্টি উদ্ভব হতে পেরেছে। যেমন নলুয়া। নলুয়ারা ধর্মে মুসলমান। কিন্তু নলুয়ারা একত্রে বাস করে। নলুয়াদের ছেলেদের বিয়ে হয় কেবলই নলুয়াদেরই মধ্যে। নলুয়া বলতে বোঝায় যারা নলখাগড়া দিয়ে চাটাই, দরমা, আসন প্রভৃতি বানায়। বাবুই বলতে বোঝাতো যাদের উপজীবিকা ছিল পান চাষ। বংশপরম্পরায় যারা পান চাষ করত এবং ধর্মে ছিল হিন্দু। সাহাজি বলতে বোঝাতো যারা ঘানিতে সরিষার তেল তৈরী করে বিক্রি করত এবং ধর্মে ছিল মুসলমান। কিন্তু এসব উপজীবিকা ভিত্তিক বিভাগ এখন বিলুপ্ত হবারই পথে। যেমন- সাহাজিরা আর নেই। কারণ তেল তৈরী হচ্ছে কলে। যন্ত্র মানুষের জীবনধারায় পরিবর্তন আনছে। কর্ম ভিত্তিক জাতির ধারণা তাই আর টিকছে না। জাতি বলতে এখন বোঝায় এক ভাষায় কথা বলা মানুষকে, যারা বাস করে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে। এক সময় কেবল বাবুইরা পান চাষ করত। আমরা বলেছি বাবুইরা ছিল হিন্দু। কিন্তু এখন মুসলামানরাও পান চাষ করছে। তারা বাবুই বলে পরিচিত নয়। উপজীবিকা ভিত্তিক জনসমষ্টি বিভাগ আর তাই আগের মত হয়ে থাকতে পারছে না। কারণ মানুষ এখন এক জীবিকা থেকে অন্য আর এক জীবিকা গ্রহণ করতে পারছে অনেক সহজেই। নৃতত্ত্বে মানবধারা বলতে বোঝায় এমন জনসমষ্টিকে যাদের চেহারা দেখে অন্য আর

www.pathagar.com

সব জনসমষ্টি থেকে পৃথক করে চিনতে পারা যায়। মানবধারা চিহ্নিত করবার ক্ষেত্রে মাথার চুল, মাথা ও নাকের আকৃতি, মুখমন্ডল অবস্থা চোখের বিবরণ, গায়ের রং ও দেহের উচ্চতা পরিমাপকে গ্রহণ করা হয় বিশেষ বিবেচ্য হিসেবে। মঙ্গলীয় মানবধারা বলতে বোঝায়, এমন মানব সমস্টি যাদের মাথায় চুল হল ঋজ্জু। এদের মাথায় চুল মাটিতে পরলে সোজা হয়ে থাকে। এদের গন্ডের হাড় উঁচু। তাই মুখমন্ডল দেখে মনে হয় অনেক সমতল। এদের চোখের উপর পাতায় থাকে বিশেষ ধরনের ভাঁজ। তাই এদের চোখ দেখে মনে হয় ছোট এবং বাঁকা। এদের মুখের দাঁড়ি গোফের পরিমাণ হয় কম। গায়ের রং হতে দেখা যায় কিছুটা পীতাভ। বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে মঙ্গলীয় মানবধারার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই মঙ্গলীয় মানবধারায় পড়ে না। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের গায়ের রং শ্যামলা। চোখ আয়ত, নাক সরু ও উঁচু। মাথার আকৃতি মাঝারি থেকে গোল। মাথার চুল মসৃণ ও তরঙ্গাকৃতি। এদের স্থাপন করা চলে বৃহত্তর ককেশীয় মানবশাখায়। বাংলাদেশে যাদের বলা হয় উপজাতি। তাদের স্থাপন করা চলে দুটি মানব শাখায়। একটি হল মঙ্গলীয় আর একটি হল ইন্ডো-আস্ট্রালয়েড। ইন্ডো-আস্ট্রালয়েডদের গায়ের রং খুব কালো। মাথার চুল তরঙ্গাকৃতি। মাথার আকৃতি লম্বা। নাক সরু নয়, নাকের অগ্রভাগ মাংশল ও চওড়া। তবে বলা যায় না বোঁচা। সাঁওতাল এবং ওঁরাওদের ফেলা হয় ইন্ডো-আস্ট্রালয়েড মানবধারায়। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য উপজাতিদের ফেলতে হয় মঙ্গলীয় মানবশাখায়। বাংলাদেশের উপজাতিরা প্রধানত পড়ে, যারা দক্ষিণের মঙ্গল বলে পরিচিত। মঙ্গলদের মতো এদের গন্ডের হাড় উঁচু। তবে অন্য মঙ্গলদের মত অতটা উঁচু নয়। এদের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এরা বাংলাদেশে আরকান থেকে এসেছে প্রধানত বৃটিশ শাসনামলে। অন্যদিকে সাঁওতালদের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে তাদের পূর্ব পুরুষ এসেছে ছোট নাগপুর থেকে। যা এখন ভারতের ঝাড়খন্ড প্রদেশের অন্তর্গত। সাঁওতালরা এদেশের বেশিদিন হল আসেনি। সাঁওতালদের নীলকর সাহেবেরা নীল চাষের জন্যে নিয়ে আসে এখনকার ভারতের মালদা জেলায়। সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়ে বাংলা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের অন্যান্য জেলায়। বৃটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ গিয়ার্সন ১৯০৬ সালে লিখেছেন যে, সাঁওতালদের মালদা জেলার পূর্বাঞ্চলে নীলকর সাহেবেরা নিয়ে আসে ১৮৮৬ সালের কাছাকাছি (Lingusitie Survey of India, Vol, IV, Part-1, Page-30)। বৃটিশ শাসনামলে সংকলিত তখনকার বগুড়া জেলার গেজেটেরিয়ারে বলা হয়েছে, ঐ জেলায় সাঁওতালরা আসতে শুরু করেছে ১৯১০ সালে। ১৯১৩ সালের সংকলিত রাজশাহীর গেজেটেরিয়ারে বলা হয়েছে, তখনকার রাজশাহী জেলার সাঁওতালরা আসতে আরম্ভ করেছে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে থেকে। নীলকর সাহেবেদের পর এদেশে সাঁওতালদের আসতে উৎসাহিত করেন হিন্দু জমিদাররা। তারা তাদের ভূমি প্রদান করেন বন কেটে জমি বের করে চাষাবাদ করবার জন্য। প্রথম কয়েক বছর

www.pathagar.com

সাঁওতলাদের কাছ থেকে তারা খাজনা নিতেন না। কিন্তু পরে তারা সাঁওতলাদের কাছ থেকে ইচ্ছামত দাবি করতেন খাজনা। সাঁওতালরা খাজনা দিতে না পারলে তাদের করা হত উচ্ছেদ। যাকে চিহ্নিত করা যেতে পারে ঠগবাজি হিসাবে। উত্তর বাংলাদেশের মুসলমান জমিদার তেমন ছিলেন না। তারা সাঁওতালাদের এভাবে ঠকাননি। হিন্দু মহাজনরা সাঁওতালদের টাকা ধার দিয়ে নিয়েছে চড়া চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ। যার কোন মাত্রা ছিল না। টাকা দাদন দিয়ে সাঁওতালদের দিয়ে করান হয়েছে চাষ। পরে জোর করে নেওয়া হয়েছেন উৎপন্ন ফসলের বেশির ভাগ অংশ। সাঁওতালরা বঞ্চিত হয়েছে তাদের শ্রমের ফল থেকে। নানা কারনে ১৮৫৫ সালে ঘটতে পারে সাঁওতাল বিদ্রোহ। ১৮৫৫ সালের ৩০ জুন প্রায় ৩০ হাজার সাঁওতাল বিরাট মিছিল করে যেতে থাকে কলকাতার দিকে। যাওয়ার পথে তারা হিন্দুদের বাড়ি ঘর লুটতরাজ করে; করে অগ্নি সংযোগ। যেতে পথে অনেক হিন্দুকে তারা হত্যা করে। হিন্দুদের সাঁওতালরা বলে 'দেখু'। দেখু কথাটার একটি অর্থ হলো প্রতিপক্ষ। কলকাতা থেকে সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্যে পাঠানো হয় ফৌজ। জারি করা হয় মার্শাল ল। একটি হিসাব অনুসারে এ সময় সৈন্যদের গুলিতে ১০ হাজার সাঁওতাল প্রাণ হারায়। তবে সাঁওতালদের সব দাবিদাওয়া মেনে নেয়া হয়। গঠন করা হয় সাঁওতাল পরগনা জেলা। সাঁওতাল বিদ্রোহ এই উপমহাদেশের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। কিন্তু এই বিদ্রোহ ঘটেছিল প্রধানত হিন্দু মহাজন ও জমিদারদের অত্যাচারের কারনে। এর সঙ্গে মুসলমানরা কোনভাবেই জড়িত ছিল না। সাঁওতাল পরগনা এখন ভারতে ঝাড়খন্ড প্রদেশের অন্তর্গত। সাঁওতাল পরগনা থেকেও এক সময় বাংলাদেশেরর উত্তরাঞ্চলে এসেছে সাঁওতাল। অর্থাৎ সাঁওতাল এদেশে এসেছে ছোট নাগপুর ও পরে সাঁওতাল পরগনা থেকে। যা হল এখন ভারতে ঝাড়খন্ড প্রদেশের অন্তর্গত। বৃটিশ শাসনামলে সাঁওতালরা সবচেয়ে করুণ অবস্থাতে পতিত হয় তদানীন্তন আসামের চা বাগানে কাজ করতে যেয়ে। বাংলাদেশের সিলেট জেলায় (তখন ছিল আসামের অংশ) এ সময় শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আসে সাঁওতালরা। যাদের বংশধররা এখনও সিলেটে আছে। এভাবে বর্তমান বাংলাদেশে ঘটতে পেরেছে সাঁওতালদের আগমণ। কিন্তু আমরা এই ইতিহাস যথেষ্টভাবে অবগত নই। বলা হচ্ছে সাঁওতাল উপজাতি এদেশে অবহেলিত। কিন্তু সাঁওতালদের বঞ্চনার ইতিহাসের সঙ্গে এদেশের বাংলাভাষী মুসলমান কোনদিনই যুক্ত ছিল না। কারণ এদেশের মুসলমানরাও প্রধানত ছিল কৃষিজীবী মানুষ। জমিতে খেটে খেতেন তারাও। অন্যদের শ্রমের ফল চুরি করবার বিশেষ সুযোগ তাদের ছিল না। সাঁওতালদের আছে নিজস্ব ভাষা। এই ভাষাটা মোটেও বাংলা ভাষার মত নয়। বাংলা ভাষার শব্দে উপসর্গ যুক্ত হয় মূল শব্দের প্রথমে। প্রত্যয় যুক্ত হয় মূল শব্দের পরে। এভাবে তৈরি হয় নতুন অর্থবোধক শব্দ। সাঁওতাল ভাষায় উপসর্গ ও প্রত্যয় আছে। কিন্তু উপসর্গ ও প্রত্যয় ছাড়া সাঁওতাল ভাষায় আছে অন্তর্ভূক্তি। যা কতকটা উপসর্গ ও প্রত্যয়ের মত। কিন্তু এরা যুক্ত হয় শব্দের মধ্যে। মূল শব্দের মধ্যে যুক্ত হয়ে এরা

www.pathagar.com

সৃষ্টি করে নতুন অর্থবোধক শব্দ। সাঁওতাল ভাষায় 'দাক' মানে হল বৃষ্টি বা পানি। সাঁওতাল ভাষায় 'দাক-এ-তা' বললে বোঝায় বৃষ্টি হচ্ছে। 'দাক-এ-তা' এখানে হয়ে উঠছে একটি পৃথক অর্থবোধক শব্দ। আর বলতে গেলে একটি বাক্য। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এক সময় প্রচলিত ছিল সাঁওতাল ভাষার মত ভাষা। কপোতাক্ষ নদীর নাম আগে ছিল কব-দাক। সে যাই হোক বাংলা ভাষায় এখন সাঁওতালী ভাষার প্রভাব নেই। সাঁওতালরা এক সময় বাস করেছে বনে। বেঁচে থেকেছে বন্য ফলমূল আহরণ করে এবং পশুপাখি শিকার করে। পরে তারা শিখেছে কৃষিকাজ। করেছে লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ। কিন্তু সাঁওতালদের লাঙ্গল আকারে হল ছোট এবং অনেক হালকা ওজনের। তবে তারা লাঙ্গল দিয়ে চাষাবাদ করতে শিখে পরিণত হতে পেরেছেন নিপুন কৃষক। জনসংখ্যার দিক থেকে সাঁওতালরা এখন হলেন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় উপজাতি। চাকমা নেতা সন্তু লারমা চাচ্ছেন সাঁওতালদের নিয়ে আন্দোলন করে একটা উপজাতি ভূমি গঠন করতে। কিন্তু সন্তু লারমা কি সাঁওতালদের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেয়ে বসতি করবার অধিকার প্রদান করবেন? বৃটিশ শাসন আমলে সামান্য কিছু সাঁওতাল গিয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সেখানে থাকতে পারেনি।

চাকমাদের ইতিহাস অনুসরণ করলে আমরা দেখি, এরা বৃটিশ শাসনামলে হয়ে উঠতে চেয়েছে হিন্দু বাঙালি। চাকমাদের কোন নিজস্ব ভাষা নেই। বাংলাই হয়ে উঠতে পেরেছে তাদের মাতৃভাষা। পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেকগুলি উপজাতির বাস। চাকমা ছাড়া অন্য উপজাতিদের আছে নিজ নিজ ভাষা। তারা ঘরে নিজ নিজ ভাষায় কথা বলে। কিন্তু একটি উপজাতি আর একটি উপজাতির সঙ্গে কথা বলতে হলে গ্রহণ করে বাংলার আশ্রয়। যে বাংলাভাষা হল চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাংলা উপভাষারই মত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সদ্ভাব নেই। চাকমা ও মারমাদের মধ্যে বিশেষ মনোমালিন্য বিদ্যমান। মারমারা চাকমা আধিপত্যের বিরোধী। মারমাদের আছে নিজস্ব ভাষা, যা ম্রনমা (বর্মী) ভাষার অনুরূপ। এবং যা তারা লিখে থাকে ম্রনমা অক্ষরে। উপজাতিদের নিয়ে আলাদা উপজাতি ভূ-ভাগ গঠনের ভিত্তি তাই খুবই দূর্বল। কিন্তু তবুও তোলা হচ্ছে এই দাবি। আর এতে ইন্ধন যোগাচ্ছে ভারত। ভারত দিয়েছে ও দিচ্ছে চাকমাদের আশ্রয় প্রশ্রয়। সরবরাহ করছে আগ্নেয় অস্ত্র।

ভারতে এখন বিহার প্রদেশ ভেঙ্গে গঠিত হয়েছে ঝারখন্ড প্রদেশ। কিন্তু এই প্রদেশের সরকারী ভাষা করা হয়েছে হিন্দি। ভারতে সাঁওতালরা হিন্দি শিখতে আপত্তি করেছেন না। সাঁওতালী ভাষা এখন ভারতে আর রোমক বর্ণমালায় লেখা হচ্ছে না। লেখা হচ্ছে হিন্দির মতই নাগরী অক্ষরে। কিন্ত বাংলাদেশে তোলা হচ্ছে সাঁওতালী ভাষা সংরক্ষণের দাবি। বাংলাদেশ থেকে ভারতে সাঁওতালদের সংখ্যা বহুগুণে বেশি। সেখানে গঠিত হতে পারে সাঁওতাল ভূমি, কিন্তু ভারতের সাঁওতালরা তুলছে না স্বতন্ত্র সাঁওতাল ভূমি গঠনের দাবি। বাংলাদেশের সাঁওতালরা প্রদান করছে ভারতের সাঁওতালদের থেকে অনেক ভিন্ন মনোভাব। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলে

www.pathagar.com

সাঁওতালরা এতটা সাঁওতালবাদী ছিলেন না। সাঁওতালদের স্বাতন্ত্রবাদী মনোভাব উদ্দীপনে বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীরা এখন যোগাচ্ছেন বিশেষ প্রনোদনা। ইতিহাসে দেখি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশকে শাসন করতে যেয়ে জেলাগুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে। যেসব জেলার মানুষ বনবাসী ছিল না, তাদের ধরা হত সভ্য। এইসব জেলাকে শাসন করবার জন্যে ছিল যে শাসন পদ্ধতি, তাকে বলা হত রেগুলেশন পদ্ধতি। পক্ষান্তরে যে সব জেলা অথবা বিভাগের মানুষ ছিল আরণ্যক প্রকৃতির, তাদের শাসন করবার জন্যে ছিল ভিন্ন প্রণালীর শাসন পদ্ধতি। যাকে বলা হত নন রেগুলেশন। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে তখনকার রংপুর, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলা শাসিত হয়েছে নন রেগুলেশন বিধি অনুসারে। কিন্তু পরে এই তিন জেলার মানুষকে আর আগের মত আরণ্যক প্রকৃতির বলে ধরা হয়নি। এই তিন জেলা শাসিত হয়েছে রেগুলেশন পদ্ধতিতে। বৃটিশ শাসন শেষ হবার আগে তখনকার বাংলা প্রদেশে ছিল ২৮টি জেলা। এর মধ্যে একমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া আর কোন জেলা নন রেগুলেশন পদ্ধতিতে শাসিত হত না। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাকে ধরা হত বনবাসী মানুষের জেলা হিসাবে। কিন্তু বর্তমানে এই অঞ্চলের মানুষকে আর ধরা যায় না বনোবাসী হিসাবে। তাই বৃটিশ শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম যেভাবে শাসিত হয়েছে এখন আর সেই পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল যা এখন তিনটি জেলায় ভাগ হয়েছে তা শাসিত হতে পারে না বৃটিশ আমলের শাসন পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিন্তু তবুও বৃটিশ শাসনামলের কথা ধরে তোলা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করবার দাবি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে বৃটিশ শাসনামলে তখনকার বিহার প্রদেশের সাঁওতাল পরগোনা জেলা ছিল নন রেগুলেশন পদ্ধতিতে শাসিত জেলা। কিন্তু এখন সাঁওতাল পরগোনা হল ভারতের ঝাড়খন্ড প্রদেশের অন্তর্গত। এবং তা শাসিত হচ্ছে ভারতের অন্য জেলার মতই। সেখানেও সাঁওতালদের আর ঠিক ধরা হচ্ছে না আগের মত বনবাসী মানুষ হিসাবে। অবশ্য ঝাড়খন্ড নামটা এসেছে বনের ধারণা থেকে। হিন্দি ভাষার ঝাড় মানে হচ্ছে বন। আর ঝাড়খন্ড মানে হল বনবাসী মানুষের আবাসস্থল অথবা ভূ-ভাগ। বাংলাদেশে সব উপজাতি এক জায়গায় বাস করে না। তাদের নিয়ে কোন আলাদা প্রদেশ গঠন ভৌগোলকি কারণে সম্ভবপর নয়। ভারতে অনেক উপজাতি আছে। কিন্তু ঝাড়খন্ড হল সাঁওতাল, মুন্ডাদের এবং হো-দের আবাসভূমি। এই অঞ্চলকে ধরা যায় উপজাতি প্রধান অঞ্চল হিসাবে। ভারতের অন্য অঞ্চলে উঠছে না ঝাড়খন্ডের মত কোন উপজাতি কেন্দ্রীক প্রদেশ গঠনের দাবি। তবে ভবিষ্যতে উঠতেও পারে। আমাদের লাগোয়া প্রতিবেশী মিয়ানমারের একটি ছোট প্রদেশের নাম হল চীন (এই চীনের সঙ্গে মহাচীনের কোন যোগাযোগ নেই)। এই চীন প্রদেশটি গঠিত হয়েছে বিভিন্ন উপজাতি নিয়ে। সাবেক আরকানের একটি জেলাকে বলা হত আরাকান হিলট্রাক্স। এই জেলাকেও এখন আরাকান (রাখাইন প্রে) থেকে কেটে নিয়ে যোগ করা হয়েছে চীন প্রদেশের সঙ্গে। চীন প্রদেশ

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বন্দরবন জেলার সঙ্গে লাগোয়া। চীন প্রদেশে যেসব উপজাতি বাস করে তাদের অনেকে বন্দরবন জেলাতেও বাস করে। কিন্তু তারা এখনে সংখ্যায় মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। মিয়ানমারে যেভাবে চীন প্রদেশ গঠিত হতে পেরেছে বাংলাদেশে তা পারে না। এছাড়া মিয়ানমার ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বড়। তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে চীন প্রদেশ গঠন করা। কিন্তু আমাদের দেশ ভৌগলিকভাবে বড় নয়। ছোট দেশ বহু প্রদেশে ভাগ করলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তা অচল হয়ে উঠতে চায়। প্রশাসনিক ব্যয়ভার বেড়ে যায় বিপুল পরিমাণে। ১৯৭১ সালে তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে সাবেক পাকিস্তানের রাষ্ট্রীক কাঠামোর মধ্যে সৃষ্টি হতে পেরেছিল বাংলা ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ। কিন্তু নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে এখন বাংলাদেশ রূপ নিচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা। বাংলাভাষা এই জাতীয়তাবাদের একটি প্রধান উপাদান হলেও একমাত্র উপাদান নয়। এর কারণ বাংলা যাদের মাতৃভাষা, তাদের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ বাস করে বাংলাদেশে আর ৪০ ভাগ মানুষ ভারতে। সব বাংলাভাষী মানুষ এক রাষ্ট্রের পতাকাতলে আসেনি; আসবার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। ভারতের বাংলাভাষী মানুষ থাকতে চাচ্ছে ভারতীয় মহাজাতির অংশ হয়ে। কেবলমাত্র বাংলাদেশের বাংলাভাষী মানুষই চাচ্ছে নিজেদের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্বকে বজায় রাখতে। যে ইচ্ছা হল বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। এদেশে উপজাতি মানুষের সংখ্যা বেশি নয়। মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগ, কি তার কিছু ওপরে হল উপজাতি। এই উপজাতিরা সবাই আবার এক জায়গায় বাস করছে না। তাই কোন উপজাতি প্রদেশ গঠন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সব উপজাতি লেখাপড়া শিখছে বাংলা ভাষার মাধ্যমে। তাই ধিরে ধিরে বাংলা হয়ে উঠছে তাদের ভাষা। আর সেই সুবাদেই তাদের নৈকট্য ঘটবে এদেশের মানুষের সাধারন সংস্কৃতির সঙ্গে। আশা করা যায়, তাদের মধ্যেও প্রতিষ্ঠা পাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।

উপজাতি প্রসঙ্গে দুটি বিষয় মনে রাখা দরকার। একটি হল বিলুপ্তি এবং একটি হল মিশে যাওয়া। বিলুপ্তি আর মিশে যাওয়া সমর্থক নয়। আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বুশম্যান ও হটেনটটরা চলেছে বিলুপ্তির পথে। তাদের জন্মের হার এখন যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু বাংলাদেশে সাঁওতালদের এভাবে বিলুপ্তি হবার সম্ভাবনা নেই। চাকমারাও যে বিলুপ্ত হবে তা বলা চলে না। মিশে যাওয়া বলতে বোঝায়, একটি জাতির সঙ্গে আর একটি জাতির সংমিশ্রণ ঘটে নতুন জাতিসত্তার উদ্ভব হওয়া। অনেকে মনে করেন এক সময় বাংলাদেশে বাস করত নিগ্র-রূপ (Negroid) জাতি। কিন্তু তারা আর এখন বাংলাদেশে নেই। মিশে গেছে অন্য মানবধারার মানুষের মধ্যে। সুন্দরবনে বিশেষ মৎস্যজীবী জনসমষ্টির মধ্যে এবং যশোর অঞ্চলের বাঁশফোঁড় জনসমষ্টির মধ্যে মাঝে মাঝে নিগ্র-রূপ সন্তানের জন্ম হতে দেখা যায়। অনেক নৃতাত্ত্বিকের মতে এরা হল নিগ্র-রূপ মানুষের জৈব ঐতিহ্যবহ (Atavism)। অর্থাৎ নিগ্র-রূপ মানুষ বিলুপ্তি

www.pathagar.com

হয়ে যায় নি। মিশে গিয়েছে এদেশে অন্য মানবধারাভূক্ত মানুষের মধ্যে। কোন কোন উপজাতি এভাবে মিশে যেতে পারে বৃহত্তর মানব সমাজের মধ্যে। যাকে বলা যাবে না তাদের বিলুপ্তি। আমরা আলোচনা করছিলাম সাঁওতাল উপজাতি নিয়ে। সাঁওতালরা এদেশে পৃথক গ্রাম গড়ে পৃথক হয়ে বাস করা পছন্দ করে। কদাচিৎ শোনা যায় সাঁওতাল ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মুসলমান ছেলে মেয়েদের বিবাহের কথা। এটা এখন বিরল ঘটনা হলেও ভবিষ্যতে বাড়তে পারে এর মাত্রা। সে সম্ভাবনা থাকছে। সাঁওতালরা এদেশে বিলুপ্তি হবেনা। তবে ধীরে ধীরে মিশেই যেতে পারে এদেশের বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে। বাংলাদেশ হবার আগে সাঁওতাল মেয়ের সঙ্গে কিছু মুসলমান ছেলের বিয়ের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুসলমান মেয়ের সঙ্গে সাঁওতাল ছেলেদের বিয়ের ঘটনা ঘটে নি। উপজাতির ধারনাটা সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজ আমলে। উপজাতি বলতে বুঝিয়েছে, এমন জনসমষ্টিকে, সংখ্যায় যারা বড় নয়। যাদের আছে একটা ভাষা। কিন্তু তারা বাস করে অন্য জাতির মধ্যে। যাদের ভাষা হল ভিন্ন। যারা সংখ্যায় হল অনেক বেশি। আর উপজাতিদের তুলনায় যারা হল অনক অগ্রসর। বাংলাদেশে বাংলাভাষী মানুষ বহুদিন আগে থেকে হয়ে উঠেছে সভ্য। তারা পশুপালন করেছে, বলদ দিয়ে হাল চাষ করেছে। তাদের প্রধান খাদ্যশস্য হয়েছে ধান। তারা নৌকা বানিয়ে নৌপথে চলাচল করেছে। এমনকি বড় বড় নৌকা বানিয়ে সমুদ্র পথে যাত্রা করেছে দূর দেশে। করেছে ব্যবসা বাণিজ্য। নিজ দেশে গড়েছে শহর জীবন, বানিয়েছে দালানকোঠা। এক কথায় হয়ে উঠেছে সভ্য। তারা কোন উপজাতিকেই অনগ্রসর করে রাখতে চেয়েছে বা তাদের কারণেই একটা উপজাতি থেকেছে অনগ্রসর এটা ঠিক বলা যায় না। উপজাতিদের উপর অবিচার হয়নি এমন নয়। যার ফলে ইংরেজ আমলে ঘটতে পেরেছে সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে সাঁওতাল বা অন্য উপজাতির উপর ঠিক যে এ রকম জুলুম চলেছে, তা নয়। এক পর্যায়ে সাঁওতাল সমাজের ওপর থেকেছে একটা সাধারণ সহানুভূতি। কবি নজরুল সাঁওতালী ঝুমুর সুরে বেঁধেছেন অনেক গান। যেমন–

হলুদ গাঁদার ফুল
রাঙা পলাশ ফুল
এনে দে, এনে দে, নইলে বাঁধবো না, বাঁধবো না চুল।

নজরুলের ঝুমুর সুরে বাঁধা গান এক সময় বাংলাদেশের আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলেছিল। নজরুরের 'চোখ গেল চোখ গেল কেন ডাকিসরে, চোখ গেল পাখিরে' ঝুমুর সুরে বাঁধা এই গানটি এক সময় হয়ে উঠেছিল খুবই জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ ঝুমুর সুরে কোন গান বেঁধেছেন কি না তা আমি জানি না। তবে শান্তি নিকেতনে সাঁওতাল সংস্কৃতির ওপর দেখানো হয়েছে শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রনাথের মনও হতে পেরেছিল সাঁওতালদের প্রতি আকৃষ্ট। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এক সময় অভিমত দেন যে, সাঁওতালদের মাদল বাজাবার তালের সঙ্গে মিল আছে বাংলা কবিতার পয়ার ছন্দের। একথাটা কতদূর সঙ্গত তা আমি বলতে পারি না। তবে অনেক অতীতে সাঁওতালদের সংস্কৃতির একটা প্রভাব হয়তো সাধারনভাবে পড়েছিল

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনসমষ্টির ওপর। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক হার্বার্ট রিজলে অভিমত দেন যে, সাঁওতালরা হল খাঁটি দ্রাবিড় মানব ধারার প্রতিনিধি। বাংলাদেশের জনসমষ্টির ওপর আছে যার প্রভাব। তিনি বাংলাদেশের মানুষকে বলেন মঙ্গল-দ্রাবিড়। তাঁর মতে, বাংলাদেশের পশ্চিম থেকে এসেছে দ্রাবিড় মানবধারার মানুষ। আর উত্তর পূর্বদিক থেকে এসেছে মঙ্গল মানবধারার মানুষ। বাংলাদেশে ঘটেছে এদের সংমিশ্রণ। গড়ে উঠেছে, যাকে বলে বাঙ্গালী জাতি। রিজলের এই মতকে অনেকেই করেছেন সমালোচনা। কিন্তু রিজলের ধারণা যে একেবারেই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এমন নয়। তবে দ্রাবিড় শব্দটি ভাষা পরিবার বাচক অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর সাঁওতালরা যে ভাষায় কথা বলে তা দ্রাবিড় পরিবারভূক্ত ভাষা থেকে হল বিশেষভাবেই ভিন্ন। অন্যদিকে সাঁওতাল আর ওরাওঁরা মানবধারার দিক থেকে হল একই। কিন্তু ওরাওঁরা যে ভাষায় কথা বলে তা হল দ্রাবিড় ভাষা পরিবারভূক্ত। মানবধারা ও ভাষার সমস্যাটা যথেষ্ট জটিল। আমরা এখন যে ভাষায় কথা বলি সেটাকে সাধারনত স্থাপন করা হয় আর্য ভাষা পরিবারে। আর্যভাষা পরিবারভূক্ত ভাষায় ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য গঠন করা যায় যায় না। কিন্তু বাংলা ভাষায় যায়। যেমন আমরা বাংলা ভাষায় বলতে পারি, মানষুটি ভাল। দ্রাবিড় তামিল ভাষাতেও এরকম ক্রিয়াপদ ছাড়া বাক্য হয়- মনী দা নল্লব। তামিলদের মত আমরা সাধাণরত সিদ্ধ চালের ভাত খাই। উত্তর ভারতে রান্না করবার জন্যে ছুরি দিয়ে মাংস, মাছ তরকারী কোটা হয়। কিন্তু তামিলরা ব্যবহার করে বটি। আমরা তামিলদের মত বটি ব্যবহার করি। আমরা ঘি খাই কম। রান্না করি প্রধানত উদ্ভিজ তেলের দ্বারা। তামিলরা উদ্ভিজ তেল (নারকেল) বেশি ব্যবহার করে। তামিলরা উলুখড় দিয়ে ছাওয়া মাটির ঘরে বাস করে। আমাদের গ্রামের ঘর বাড়িও একই রকমভাবে বানানো হয়। সংস্কৃতির এই মিল কীভাবে ঘটতে পেরেছে তা বলা যায় না। কথাগুলি বলতে হচ্ছে এই কারণে যে, এক সময় এদেশে আর্যবাদ যথেষ্ট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বাংলার সংস্কৃতিতে খুঁজে বের করবার চেষ্টা হতো আর্য উপাদান। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ আর্য নয়। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক রিজলে আর্য শব্দটিকে মানবধারা বাচক হিসেবেও (১৯০৮) ব্যবহার করেছেন। আর তাঁর এই ব্যবহারের জন্যও সৃষ্টি হতে পারে যথেষ্ট জটিলতা। কিছুদিন আগে বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি বই পড়ছিলাম। সেখানে সাবেক আর্যের ধারণা বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই ধারণাকে এখন আর সমর্থন করা চলে না। আমাদের জাতিসত্ত্বার উদ্ভব সম্পর্কে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এখন যার অপনায়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে নৃতাত্ত্বিকরা খুব বেশি গবেষণা করেননি। কিন্তু এখন এদেশের মানুষ নিয়ে গবেষণা হওয়ার দরকার। কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকছে আমাদের জাতিসত্তার ও আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন। যাকে ঘোলাটে করে তোলা হচ্ছে।

***

www.pathagar.com

উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

ইংরেজি ভাষার হাত ধরে গড়ে উঠেছে আধুনিক বাংলাভাষা। সংস্কৃতি শব্দটা এখন ব্যবহার করা হয় ইংরেজি কালচার (Culture) শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে। কিন্তু ইংরেজি ভাষাতেও কালচার শব্দটি যে সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞাপক, তা নয়। কালচার শব্দটার একটা অর্থ হল উৎপাদন। মানুষ যা কিছু উৎপাদন করে, তা দিয়ে তার সংস্কৃতির পরিচয়। বিখ্যাত বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক E B Tylor (১৮৩২ - ১৯১৭) কালচার শব্দটার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন– কালচার হল মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান ধারণা, প্রথা, আইন, নৈতিকতা, শিল্পকলা ও অন্যান্য ক্ষমতা এবং দক্ষতার সমষ্টি, যা মানুষ লাভ করে থাকে কোন সমাজের সদস্য হিসাবে। কালচার হল মানুষের সামাজিক উত্তরাধিকার। কিন্তু বাস্তবে এখন আর আমরা কালচার বা সংস্কৃতি কথাটাকে এত ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করি না। প্রয়োগ করি বেশ কিছুটা সীমিত অর্থে। ১৯৪৫ সালে বিশ্ব শান্তি রক্ষার ঘোষিত উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতিসংঘ (United Nations)। ১৯৪৬ সালে গঠন করা হয় জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন UNESCO (United Nation Education, Scientific and Cultural Organisation)। এখানে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে শিক্ষা (Education), বিজ্ঞান (Science) এবং সংস্কৃতিকে (Culture) এক করে দেখা হচ্ছে না। এদের দেখা হচ্ছে বেশকিছুটা পৃথক করে। যদিও বা আবার এই তিনটি বিষয়কে দেখবার চেষ্টা হয়েছে একত্রে। সংস্কৃতি কথাটাকে প্রয়োগ করা হচ্ছে না নৃ-তত্ত্বের মত ব্যাপক অর্থে। নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি হল বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র। শিক্ষা বিষয়ে ইউনেস্কোর লক্ষ্য হল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিরক্ষরতা দূরিকরণ, শিক্ষার মান বৃদ্ধি এবং শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতন করা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর লক্ষ্য হল, বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি। বিজ্ঞান সম্পর্কে জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনায় উৎসাহ প্রদান। বিভিন্ন দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধিতে এবং খনিজ সম্পদ উত্তলনে সাহায্য করা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইউনেস্কোর লক্ষ্য হিসাবে বলা হয়, বিভিন্ন শিল্পকলা, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি। এবং এসব ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সর্বসাধারণের মূল্যায়ন ক্ষমতার সম্প্রসারণ।

১৯৫০-এর দশকের শেষভাগে ইউনেস্কোর পক্ষ থেকে Pierre Bessaignet নামক একজন বিশেষজ্ঞকে বাংলাদেশের উপজাতি বিষয়ে খোঁজ খবর নিতে পাঠানো হয়। পিয়ের বেসাইন ছিলেন জাতিতে ফরাসি। তিনি ফরাসী দৃষ্টিকোণ থেকে জরিপ করেন এদেশের উপজাতি পরিস্থিতিকে এবং অভিতম দেন যে, এদেশের উপজাতিরা আর যাই হোক কোন আদিম মানব সংস্কৃতিকে বহন করছেন না। এরা বহন করছেন না প্রস্তর যুগর সংস্কৃতি। কারণ এরা ব্যবহার করছে লোহা দিয়ে তৈরি জিনিসপত্র। যেমন- লোহার দা, কুড়াল, খন্তা এবং চাষের জন্যে লোহা দিয়ে তৈরি লাঙলের ফাল। এরা তাই বলা চলে এসে পৌছে গেছে লৌহ যুগে। কোনভাবেই পড়ে নেই প্রাগৈতিহাসিক আদিম অবস্থায়। তিনি ইংরেজি ভাষায় Tribesmen of the

www.pathagar.com

Chittagong Hill Tracts নামে একটি বই লেখেন। বইটি তদানীন্তন পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটির ঢাকা শাখা থেকে প্রকাশ করা হয় ১৯৫৮ সালে। তিনি তাঁর এই বইতে বলেন– পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে যেভাবে মানুষের কাছ থেকে সরকারী রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে, সেটা মোটেও কোন আদিম পদ্ধতি নয়। এদিক থেকে তাই বলা চলে না এসব উপজাতির সমাজ কাঠামো হচ্ছে আদিম। সর্বপরি এসব উপজাতিদের অধিকাংশ ধর্মের দিক থেকে নিজেদের দাবি করেন বৌদ্ধ। বৌদ্ধধর্ম আর যাই হোক কোন আদিম উপজাতিক ধর্ম নয়। এদিক থেকেও এদের বলা যায় না আদিম। আসলে এরা বহুদিন আগে থেকেই প্রভাবিত হয়ে চলেছে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উন্নত প্রাচ্য সভ্যতা দ্বারা। আজ প্রায় ৫৫ বছর পরে পিয়ের বেসাইন কর্তৃক লেখিত বইটির কথা আমার মনে পড়ছে। কারণ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সম্পর্কে এমন অনেক কথা লেখা হচ্ছে যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। বেসাইন যেভাবে ঐ অঞ্চলের কথিত আদিম উপজাতিদের কথা বলেছেন সেটা অনেক বেশি নৃ-তাত্ত্বিক ধ্যানধারণা সম্পন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিরা যতটা আদিম সংস্কৃতির ঐতিহ্যবহ তার চাইতে বাংলার উত্তরাঞ্চলের এক সময়ের কিছু উপজাতি বহন করে চলেছিল অনেক আদিম ঐতিহ্য। যেটাকে উপলব্ধি করা চলে তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বিশ্লেষণ করে। মানুষ এক সময় প্রায় সর্বত্রই মেয়েদের ভেবেছে ফলন শক্তির (Fertility) অধিকারী। মেয়েরা বিশেষ ভুমিকা পালন করেছে জমির ফলন শক্তি বৃদ্ধির অনুষ্ঠানে (Fertility-cult)| বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি বিশিষ্ট উপজাতি হল রাজবংশী। রাজবংশীরা বৃষ্টি না হলে করতেন 'হুদুমা' পূজা। হুদুমা হল এদের বৃষ্টির দেবতা। হুদুমা পূজায় অল্প বয়সী যুবতি মেয়েরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অন্ধকার রাতে নাচত। হুদুমা পূজার জন্যে একটি অকর্ষিত জমিতে পোঁতা হত একটা কলাগাছ। এই কলাগাছকে ভাবা হত হুদুমা দেবতা। মেয়েরা যৌন আবেগ নিয়ে জড়িয়ে ধরত এই কলাগাছকে। এই সময় শিশ্নের প্রতীক হিসাবে মেয়েরা খেত কদলী। একদল মেয়ে নগ্ন হয়ে জোয়াল কাঁধে নিত আর তার সঙ্গে জোতা হত লাঙল। যা টানতো নগ্ন মেয়েরা। মেয়েরা পরে সকরে মিলে নগ্ন অবস্থায় নাচত উদ্যোমভাবে। এই নাচের মধ্যে ছিল না কোন শৈল্পিক আবেদন। আজ যদি কেউ বলেন, বৃষ্টি আনবার জন্যে হুদুমা নাচ নাচতে হবে, তবে সেটা পেতে পারে না আমাদের সাধারণ সমর্থন। উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণের সময় এসব কথা মনে রাখা হল যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। মানুষ এখন বৃষ্টি আনবার জন্যে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। হুদুমা নাচ নাচবার প্রয়োজনীয়তা এখন আর নেই।

ভাওয়াইয়া গান আমাদের ভালোলাগে। ভাওয়াইয়া গানের জন্ম হয়েছে বাংলার উত্তরাঞ্চলের 'বাহে' নামক জনসমষ্টির মধ্যে। এই বাহেদের উদ্ভব হয়েছে, অনেকের মতে রাজবংশীদের থেকে। ভাওয়াইয়া গান হয়ে উঠেছে কিন্তু সকলেরই প্রিয়। আর তাই ভাওয়াইয়া গানের সংস্কৃতি হতে যাচ্ছে সংরক্ষিত। কোন উপজাতির সংস্কৃতির কোন অংশ সংরক্ষিত হবে কিনা সেটা অনেকভাবেই নির্ভর করে একটা দেশের বৃহত্তর জনসমাজের উপর তার প্রভাব হতে পারছে কতটা ব্যাপক, তার উপর।

www.pathagar.com

সাঁওতালদের ঝুমুর সুর ও তাল আমাদের ভালোলাগে। ঝুমুর সুরে তাই আমরা করছি বাংলা গান। সাঁওতাল সংস্কৃতির এই দিকটি হতে যাচ্ছে আমাদর মধ্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত। সেটা বাদ পড়তে যাচ্ছে না। বাংলাদেশে খুব বেশি মনিপুরী নেই। কিন্তু মনিপুরী নাচ আমাদের সবার ভালোলাগে। আমরা করছি মনিপুরী নাচের চর্চা। এভাবেই হতে পারে আমাদের দেশে উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ। কোন উপজাতির সংস্কৃতি সংরক্ষিত হবে কি না সেটা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে সেই সংস্কৃতির অন্তর্গত মানুষের চেষ্টারও উপর, অন্য সংস্কৃতির অন্তর্গত মানুষের চেষ্টার উপর নয়। আমাদের দেশের উপজাতিদের এটা উপলব্ধি করতে হবে। আমরা অর্থাৎ বৃহত্তর জনসমাজের মানুষ তাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব নিতে পারি না। কারণ, সেটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। সেটা তাদের সংস্কৃতি। তাদের ভাললাগার বিষয়। আমাদের সেটা ভাল নাও লাগতে পারে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দেশেই বৃহত্তর ভাষাভাষী মানব সমষ্টির মধ্যে বসবাসকারী ক্ষুদ্র উপজাতি জনসমষ্টিকে শিখতে হয় বৃহত্তর জনসমষ্টির ভাষা। আর ভাষার মাধ্যমে পড়তে থাকে উপজাতি জনসমষ্টির ওপর বৃহত্তর জনসমষ্টির সংস্কৃতির প্রভাব। যেটাকে তারা অস্বীকার করতে পারে না। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে আমরা দেখি, সে দেশে এক সময় বাস করত কর্নিশ(Cornish) নামের একটি উপজাতি। তারা কথা বলত কর্নিশ ভাষায়। কিন্তু এখন বিলাতে কর্নিশ উপজাতি আর নেই। তারা ইংরেজি ভাষা শিখে ধীরে ধীরে মিশে গিয়েছে ইংরেজি ভাষাভাষী বৃহত্তর জনসমাজেরই মধ্যে। আমাদের দেশের উপজাতির ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটা মোটেও অসম্ভব নয়। আসলে উপজাতিরা এখন শিখছে বাংলাভাষা। বাংলাভাষার মাধ্যমে পাচ্ছে উচ্চশিক্ষা। তাদের পৃথক সংস্কৃতি বজায় রাখা তাই সহজ হচ্ছে না। বাংলাদেশে সাঁওতালদের সাধারণ চালচলন হয়ে উঠছে বাংলাভাষী মানুষেরই মত। এমন কি সাঁওতালী ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে বহু বাংলা শব্দ। ফলে সাঁওতালী ভাষা আর আগের মত হয়ে নেই। এখন বলা হচ্ছে উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণের কথা। কিন্তু বাস্তব কারণে সেটা আর হতে পারছে না। বাংলাদেশে সাঁওতালদের কেউ গায়ের জোরে বাংলা শিখতে বাধ্য করছে না। তারা নিজেদের প্রয়োজনেই বাংলাদেশে শিখছেন বাংলাভাষা। আর গ্রহণ করছে বৃহত্তর জনসমাজের সংস্কৃতির নানা উপকরণ।

আমরা চাকমা ও মারমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত নই। চাকমা এবং মারমাদের সংস্কৃতির কোন উপকরণ যদি বৃহত্তর সমাজকে প্রভাবিত করে, তবে অবশ্যই তা সুরক্ষিত হবে। কক্সবাজারের মগরা খুব সুন্দর লুঙ্গি বানিয়ে থাকেন। এই লুঙ্গি সকলেই পরতে আগ্রহী। যদিও এর দাম যথেষ্ট বেশি। কক্সবাজারের মগরা এক সময় সেখানে বিরাট সামুদ্রিক মৎস্যের ব্যবসার সূত্রপাত করেন। যার ঐতিহ্য এখনো বজায় আছে। এরা বানাতেন এবং এখনো বানান তামাক পাতা বিশেষভাবে ছড়িয়ে চুরুট। যার চাহিদা আছে। চাকমাদের কোন তৈরি জিনিসের এরকম কোন চাহিদা

www.pathagar.com

আছে কিনা সেটা আমরা জানি না। শুনেছি চাকমাদের বাঁশির সুর অনেকের ভালোলাগে। যদি ঘটনা তাই হয় তবে এই সুর টিকে থাকবার যোগ্যতা পাবে। কিন্তু চাকমারা এখন সাহিত্য চর্চা করছেন বাংলাভাষার মাধ্যমে। তারা শিল্পকলার চর্চা করছেন বাংলাদেশের অন্যমানুষেরই মত। শিক্ষা দিক্ষায় অন্য উপজাতিদের তুলনায় তারা হয়ে উঠেছেন খুবই অগ্রসর। উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণের দাবি যতটা না করা হচ্ছে বাস্তব কারণে, তার চাইতে বেশি করা হচেছ বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। যেটাকে আমরা সমর্থন দিতে পারি না।

সংস্কৃতি সংরক্ষণ প্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা বাস্তর যে, কোন সমাজের সংস্কৃতি চিরকাল এক হয়ে থাকেনি। তাদের সংস্কৃতিতে পরিবর্তন এসেছে, আর তা আসবেও। নানা কারণেই পরিবর্তন আসা সম্ভব। মানুষ এক সময় অনেক কিছু করেছে, যা সে এখন করবার কথা ভাবতেও পারে না। যেমন, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যেও এক সময় ছিল একটি বিশেষ ধরণের রাজতন্ত্র। ত্রিপুরার রাজারা ছিলেন হিন্দু। যদিও ছিলেন মঙ্গলীয় মানবধারাভুক্ত মানুষ। এরা করতেন শিবের পূজা। কথিত আছে, ত্রিপুরার রাজা শ্রীধরমা প্রতিবছর শিবের পূজায় প্রদান করতের এক হাজার নরবলী। এখন আর কেউ শিবের পূজায় কোনখানেই এরকম নরবলী দেবার কথা কল্পনাও করতে পারে না। অনেক ত্রিপুরী এখন বাস করেন বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি জেলায়। এদের পূর্বপুরুষ খাগড়াছড়িতে এসে উপনিবিষ্ট হন ত্রিপুরা থেকে। ত্রিপুরীরা এখনও শিবের পূজা করেন। কিন্তু তারা দেন না নরবলী। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদের ধ্যান ধারণায় এসেছে বিরাট পরিবর্তন। আর সেই সুত্রেই সংস্কৃতিতে ঘটেছে পরিবর্তন। এক সময় কুকি উপজাতির লোকেরা চট্টগ্রামে এসে করেছেন নরমুণ্ড শিকার। এটা ছিল তাদের ধর্ম বিশ্বাসেরই অংশ। কিন্তু এখন আর তারা নরমুণ্ড শিকারী নন। মানুষের ধর্ম বিশ্বাস তাদের আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। নিয়ন্ত্রিত করে সংস্কৃতিকেও। ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তন সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আনে। অন্য কারণেও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে। মানুষের মন এক ঘেয়েমি পছন্দ করে না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসী দেশে উদ্ভব হয় আদিম শিল্পকলা (Primitive Art) চর্চার আন্দোলন। এতে অংশ নেন পিকাসোর মত শিল্পী। তিনি ছবি আঁকেন পশ্চিম আফ্রিকার কাঠে তৈরি মুখোশের আদলের অনুকরণে। কিন্তু এখন এই আদিম শিল্পকলা চর্চার আন্দোলন পরিত্যাক্ত হয়েছে। কারণ তা হয়ে উঠেছে একঘেয়ে। আমাদের দেশে অনেকেই এখনো মনে করেন, উপজাতিদের শিল্পকলা হল আদিম শিল্পকলার নিদর্শন। আর তাই তা হল বিশেষভাবে চর্চার বিষয়। কিন্তু এই শিল্পকলার মধ্যে উচ্চ নান্দনিক উপকরণ আছে বলে দাবি করা চলে না। উপজাতিক শিল্পকলা সহজ ও সরল। কিন্তু শিল্পকলা সহজ ও সরল হলেই যে অনুপম হয়, তা নয়। এছাড়া শিল্পকলা আদিম হলেই যে অকৃত্রিম হয়, এমন ভাববারও কোন কারণ নেই। উপজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ ব্যয় সাপেক্ষ। আমাদের দেশের উপজাতি জনসংখ্যা বেশি নয়। তাদের ট্যাক্সের টাকায় উপজাতিক সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্ভবপর হতে পারে না।

www.pathagar.com

আদিবাসী দিবস

৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস। জাতিসংঘ ১৯৯৩ সাল থেকে আদিবাসী দিবস পালন আরম্ভ করে। এরপর থেকে প্রতি বছর ৯ আগস্ট আদিবাসী দিবস হিসাবে পালিত হয়। বাংলাদেশে এবার (২০১২) সরকারীভাবে আদিবাসী দিবস পালন করা হল না। আমি মনে করি এই সিদ্ধান্তটি গ্রহণ খুবই সমীচীন হয়েছে। কারণ বাংলাদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন আদিবাসী নেই। 'আদিবাসী' শব্দটি হিন্দি ও বাংলায় ব্যবহার করা হচ্ছে ইংরেজি Aborigines শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে। Chambers's সংকলিত বিখ্যাত ইংরেজি অভিধানে Aborigines এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– The original or native inhabitants of a country. অর্থাৎ আদিবাসী বলতে বোঝায় কোন একটা দেশে আদিকাল থেকে বসবাসকারী জনসমষ্টিকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ার কালো মানুষদের। এরা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী। সাদা মানুষ যাওয়ার আগে এই কালো মানুষরা সেখানে বাস করত। একইভাবে পশ্চিম গোলার্ধে বিভিন্ন রেড ইন্ডিয়ান গোষ্ঠীর মানুষকে বলা যেতে পারে আদিবাসী। কারণ, সেখানে তারা বাস করছে ইউরোপ থেকে সাদা মানুষ যাবার অনেক আগে থেকে। কিন্তু সর্বত্র এত সহজভাবে আদি বাসিন্দা কারা সেটা ঠিক করা যায় না। ইউরোপের আদি বাসিন্দা কারা সেটা নৃতাত্ত্বিকরা বলতে পারেন না। একইভাবে বলা সহজ নয় দক্ষিণ এশিয়ার আদিবাসিন্দা কারা। একটা অঞ্চলের অনগ্রসর মানুষ সেদেশের আদিবাসী এরকম ধরে নেয়া খুবই ভুল। কারণ, একই দেশে একই মানবধারার মানুষের এক অংশ গড়েছে সভ্যতা। কিন্তু তাদের মত মানুষেরই আর এক অংশ থেকে গেছে বনে জঙ্গলে। থাকতে চেয়েছে গেছে আদিম জীবনধারা আঁকড়ে। এই উপমহাদেশে এটা ঘটেছে। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক রিজলে সাঁওতালদের বলেছেন দ্রাবিড় মানবধারাভুক্ত। সাঁওতালরা বনে থেকে গিয়েছে। কিন্তু দ্রাবিড়দের আর একাংশ, যেমন তামিলরা গড়ে তুলেছে সভ্যতা। তামিলরা কোনভাবেই এই উপমহাদেশে আগন্তুক জাতি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। তামিল এবং সাঁওতালদের মাথার আকৃতি একই রকম লম্বা। গায়ের রং কালো। চুল মসৃণ ও তরঙ্গাকৃতি। এরা নিগ্রদের মত নয়। নিগ্রদের চুল পশমের মত পাক খাওয়া। মাথা লম্বা। ঠোঁট পুরুউল্টানো। এবং মুখমণ্ডল অগ্রপ্রসারিত (Prognathic face)। বাংলাভাষাভষীদের মধ্যে এ রকম মানুষ নজরে পড়ে না। তবে কারও কারও মতে সুন্দর বনের বিশেষ মেছো সম্প্রদায় এবং যশোর অঞ্চলের বাঁশপোড়দের (বাঁশ দিয়ে ঝুড়ি চাটায় বোনে যারা) মধ্যে এরকম মানুষ মাঝে মঝে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এরা সংখ্যায় অতি নগন্য। নিগ্রো কৃষ্ণকায়। কিন্তু এদের চেহারা নিগ্রদের আনুরূপ নয়। এরা হল অনিগ্র কালো মানুষ। রিজলের মতে এই উপমহাদেশে

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে প্রধানত তিনটি মানবধারা থাকতে দেখা যায়। এদের একটি হল সাদা, একটি হল পীতাভো আর একটি হল কালো। কিন্তু এই কালো মানুষরা নীগ্র মানব শাখাভুক্ত নয়। সাদা, হলুদ এবং অ-নিগ কালো মানুষের সংমিশ্রণ ঘটেছে এই উপমহাদেশে। তবে কারা এই উপমহাদেশের আদিবাসিন্দা সেটা ঠিক করা সম্ভব নয়। যারা কোন সভ্যতা গড়ে তুলতে পারেনি, থেকেছে আরণ্যক জীবনযাত্রা আঁকড়ে, তারা এই উপমহাদেশের আদিবাসী এরকম বলতে যাওয়া ভুল। কারণ, তাদের আর একাংশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে সভ্যতা বা নগর জীবন। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার উত্তরভাগে অবস্থিত পন্ডু রাজার ঢিবি নামক স্থান খনন করে তাম্র-পস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে। তাম্র-প্রস্তর যুগ বলতে বুঝায়, মানব সভ্যতার এমন একটি পর্যায়, যখন মানুষ যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তর অস্ত্র ব্যবহার করেছে। আর সেই সঙ্গে শুরু করেছে তামার মত ধাতু দ্রব্যের ব্যবহার। পান্ডু রাজার ঢিবিতে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে তামার তৈরি বড়শি। যার থেকে প্রমাণিত হয় এখানে যারা বাস করত,তারা তামার বড়শি দিয়ে মাছ ধরত। পান্ডু রাজার ঢিবির খুব কাছে অজয় নদীর ধারে অবস্থিত বিরভুম জেলার মহিষাদল নামক জায়গায় মাটি খুঁড়ে একটি মৃৎ পাত্র পাওয়া গেছে। যার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে কিছু কয়লা হয়ে যাওয়া ধান। রেডিও কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে এইসব ধানের বয়স নির্ণিত হয়েছে ১৩৮০ থেকে ৮৫৫ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে। পান্ডু রাজার ঢিবিতে আবিস্কৃত বিভিন্ন জিনিস এবং মহিষাদলে পাওয়া ধানকে ধরা চলে একই সভ্যতার অংশ। কারণ এই দুই স্থানে যে মৃৎপাত্র আবিস্কৃত হয়েছে তা হল অবিকল এক। মৃৎ পাত্রে আঁকা কালো নকশা হল একই ধরণের। যারা এই সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তারা মৃতদেহ দাহ করতো না। সমাধিস্থ করত। পান্ডু রাজার ঢিবি অঞ্চলে তাম্র-পস্তর যুগের ১৩ টি মানব সমাধি আবিস্কৃত হয়েছে। নৃ তত্ত্বে মানুষকে মাথার আকৃতি অনুসারে মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: লম্বা মাথা, মাঝারি মাথা ও গোল মাথা। লম্বা মাথার মানুষ বলতে বুঝায় এমন সব মানুষকে যাদের মাথার প্রস্থ হল দৈর্ঘ্যের শতকরা ৭৫.৯ ভাগের কাছাকাছি। অথবা তার কম। মাঝারি মাথার মানুষ বলতে বুঝায়– যাদের মাথার প্রস্থ হল দৈর্ঘ্যের শতকরা ৭৬ থেকে ৮০.৯ ভাগের মধ্যে। আর গোল মাথার মানুষ বলতে বোঝায় যাদের মাথার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যর শতকরা অনুপাত হল ৮১ বা তার বেশি। মাটি খুঁড়ে পান্ডু রাজার ঢিবিতে যে সব মানুষের কংকাল পাওয়া গিয়েছে তারা হলো মাঝারি মাথার। এতাবদ নৃতাত্ত্বিকরা যে গবেষণা করেছেন, তা থেকে বাংলাভাষী মানুষের মধ্যে দেখা যায় মাঝারি মাথার মানুষের প্রাধান্য থাকতে। অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে বাংলাভাষাভাষি মানুষের সাযুজ্য আছে পান্ডু রাজার ঢিবিতে সেই অতীতে বসবাসকারী মানুষের। পন্ডু রাজার ঢিবিতে বসবাসকারী মানুষ মাছ ধরত। খাদ্যশস্য হিসাবে আবাদ করত ধান। অর্থাৎ তাদের ছিল ভাত মাছের জীবন। এখনও বাংলাভাষী মানুষের বস্তুগত সংস্কৃতির ভিত্তি

www.pathagar.com

হল ভাত ও মাছ। বাংলা ভাষাভাষী মানুষ বেঁচে থাকে ভাত মাছ খেয়ে। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে তাম্র-প্রস্তর যুগের কোন সভ্যতার নিদর্শন আবিস্কৃত হয়নি। কিন্তু হবার সম্ভাবনা যথেষ্টই আছে। বাংলাদেশের সীমান্তের খুব কাছে পশ্চিমবঙ্গের ফারাক্কা থানায় তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মনে করা যায় যে, দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে এক সময় বাংলাদেশে এসেছিল তাম্র-প্রস্তর যুগের অনেক মানুষ; যারা উপনিবেষ্টিত হয়েছিল এই দেশে। যাদের ধরা যেতে পারে এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। আর এক কথায় আদিবাসী।

সাধারণভাবে বাংলাভাষী মানুষের মাথার আকৃতি হল মাঝারি থেকে গোল। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মানুষের মত তাদের মাথার আকৃতি লম্বা নয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মানুষের মাথার আকৃতি লম্বা। কিন্তু উত্তর ভারতের মানুষের মাথার মধ্যভাগ হতে দেখা যায় উঁচু। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মানুষের মাথা লম্বা হলেও তাদের মাথার মধ্যভাগ উঁচু হতে দেখা যায় না। অর্থাৎ উত্তর -দক্ষিণ ভারতের মানব ধারা এদিক থেকে হল ভিন্ন। বাংলাদেশের মানুষ উচ্চতায় মাঝারি। তাদের মুখে সাধারণত দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্য থাকতে দেখা যায়। তাদের অধিকাংশের চোখ আয়ত। গায়ের রং শ্যামলা। তাদের অধিকাংশের গণ্ডের হাড় উঁচু নয়। তাদের মুখমণ্ডল দেখে তাই মনেহয় না সমতল। কিন্তু বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের মধ্যে আছে মঙ্গলীয় মানবধারার প্রভাব। তাদের অনেকের গালের হাড় উঁচু। অক্ষি কোটর থেকে কপালের কাছে নাকের উচ্চতা বেশি নয়। তাই তাদের মুখমন্ডল দেখে অনেক সমতল মনে হয়। এটা মঙ্গলীয় মানব ধারার বৈশিষ্ট্য। এছাড়া মঙ্গলীয় মানব ধারাভুক্ত মানুষের চোখের ওপর পাতায় থাকে বিশেষ ধরণের ভাঁজ। যে কারণে তাদের চোখ দেখে মনে হয় ছোট। মঙ্গলীয় মানবধারাভুক্ত মানুষের মুখে দাড়ি গোঁফের পরিমাণ সাধারণত হয় যথেষ্ট কম। বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মানুষের অনেকের মধ্যে এইসব বৈশিষ্ট্য থাকতে দেখা যায়। বিশেষ করে বাংলাভাষী মুসলমানদের মধ্যে।

ইসলাম একটি প্রচারশীল ধর্ম। এর উদ্ভব হয়েছিল সেমেটিক মানবধারাভুক্ত মানুষের মধ্যে। সেমেটিক মানবধারার মানুষের গায়ের রং লালচে সাদা। চুলের রং কালো। মুখের আদল উপবৃত্তাকার। নাকের উপরিভাগ কতকটা ধনুকের মত বাঁকা। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে এরকম মানুষ বিশেষ চোখে পড়ে না। অর্থাৎ আমরা সেমেটিক মানবধারাভুক্ত নই। আমরা ধর্মে মুসলমান। ইসলাম ধর্ম যে শুধু বাংলাদেশের মানুষ গ্রহণ করেছে এমন নয়। মালেশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ গ্রহণ করেছে ইসলাম। যারা হল মঙ্গলীয় মানবধারাভুক্ত। বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া মিলে এখন হল পৃথিবীতে সবচেয়ে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল। বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানই সেমেটিক মানবধারাভুক্ত নন। মুসলমান বলতে কোন বিশেষ মানবধারাভুক্ত মানুষকে বুঝায় না।

www.pathagar.com

ধর্ম এবং মানবধারা সমার্থক নয়। ভাষা ও মানবধারাকেও এক করে দেখা যায় না। আমরা বাংলাভাষায় কথা বলি। অনেকের মতে বাংলা হল আর্য গোষ্ঠীর ভাষা। কিন্তু বাংলাভাষায় ক্রিয়াপদ ছাড়াও বাক্য গঠন করা চলে। যা আর্য পরিবারের অন্যভাষায় যায় না। আর্য বা ইন্দোইউরোপীয় পরিবারভুক্ত ভাষায় যারা কথা বলে তারা সকলে এক মানবধারাভুক্ত নয়। যেমন ইউরোপে যারা ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় কথা বলে তাদের মধ্যে কম করে দেখা যায় তিনটি মানবধারা। যথা– নর্দিক (Nordic), আলপাইন, (Alpine) এবং মেডিটেরিনিয়ান (Mediterranean)। রুশ ভাষাও ইন্দোইউরোপিয়ান পরিবারভুক্ত। কিন্তু রুশরা প্রধানত পড়ে পূর্ব-বালটিক (East-Baltic) মানবধারায়। তবে এরা সবাই হল বৃহৎ ককেশিয় মানবশাখাভুক্ত। ইংরেজ আমলে লোক গণনার বিবরণে ট্রাইব শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ট্রাইব বলতে বুঝানো হয় এমন লোক সমষ্টি যারা সংখ্যায় বেশি নয়। যাদের আছে একটি নিজস্ব ভাষা। যারা বাস করে সাধারণত দুর্গম বন ও পাহাড়ি অঞ্চলে। যারা নিজেদের মধ্যে অনুভব করে বিশেষ আবেগগত একতা। এবং মনে করে তাদের মধ্যে আছে উদ্ভবগত ঐক্য। অর্থাৎ এদের আদি পূর্বপুরুষ হলো এক। এদের ধর্ম বিশ্বাসও হল একই। ইংরেজি ট্রাইব কথাটার বাংলা করা হয় উপজাতি। উপজাতি বলতে বুঝানো হয়, এরা মূল জাতি নয়। অন্য মূল জাতির মধ্যে এদের বাস। যারা এদের তুলনায় অনেক অগ্রসর। ইংরেজ আমলে সাঁওতালদের একটি উপজাতি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সাঁওতালের বাস। কিন্তু তারা এই অঞ্চলের আদিবাসী নয়। তাদের এই অঞ্চলে নিয়ে আসে ইংরেজ নীলকর সাহেবরা; নীল চাষে সাহায্য হবে ভেবে। সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কথা। সাঁওতালরা অধিকাংশ বাস করেছে সাবেক বিহার প্রদেশের ছোট নাগপুর বিভাগে এবং সাঁওতাল পরগোনা জেলায়। যা ছিল সাবেক বিহার প্রদেশের ভাগলপুর বিভাগের একটি জেলা। কিন্তু বর্তমানে সাবেক ছোট নাগপুর বিভাগ এবং সাঁওতাল পরগোনা জেলাকে নিয়ে গঠন করা হয়েছে ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশ। ঝাড়খণ্ড প্রদেশে সাঁওতাল ছাড়া আরো উপজাতি আছে। যেমন ওরাঁও, মুন্ডা, হো। কিন্তু এই নতুন ঝাড়খণ্ড প্রদেশের সরকারি ভাষা করা হয়েছে হিন্দি; কোন উপজাতি ভাষাকে নয়। অথচ বাংলাদেশে দাবি করা হচ্ছে সরকারীভাবে সাঁওতালি ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের। সাঁওতালরা বাংলাদেশে দলে দলে খৃস্টান হচ্ছে। তারা ঝুকে পড়ছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির দিকে। অথচ সেই একই সঙ্গে দাবি করা হচ্ছে সাঁওতালী সংস্কৃতি সংরক্ষণের।

২০০৭ সালে বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী' নামে একটি বই প্রকাশ করেছে। এরকম বই এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে কেন প্রকাশ করা হয়েছে তা আমার বোধগম্য নয়। কারণ, বইটি পড়ে মনে হতে পারে বাংলাদেশে আছে অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী। যা আসলে আদৌ সত্য নয়। বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলায় যে আরাকানী (রাখাইন) বাস করে, তাদের এই বইতে বলা হয়েছে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের আদিবাসী। অথচ এই অঞ্চলে এদের পূর্বপুরুষেরা এসে উপনিবেষ্টিত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এর আগে এরা এই অঞ্চলে ছিল না। মগ বলতে আমরা বাংলাভাষায় সাধারণভাবে বুঝি আরাকান থেকে বাংলাদেশে আগত মঙ্গলীয় মানবধারাভুক্ত মানুষকে।। কক্সবাজার জেলার মহেশখালী দ্বীপে অনেক মগ বাস করে। এদের পূর্ব পুরুষ এই অঞ্চলে আসে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। আরাকান, যাকে এখন বলা হচ্ছে রাখাইন তা দক্ষিণ ব্রহ্মের (মিয়ানমারের) রাজা বোদবপায়া ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে দখল করে। বোদবপায়ার সৈন্যরা আরাকানে অনেক অত্যাচার ও লুটপাট করতে থাকে। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আরাকান থেকে অনেক মগ পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় কক্সবাজার ও মহেষখালীতে। মগদেরও এশিয়াটিক সোসাইটির এই বইতে বলা হয়েছে আদিবাসী। যা ঐতিহাসিক দিক থেকে আদৌ সত্য নয়। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, কক্সবাজার, মহেষখালী, বরগুনা ও পটুয়াখালীতে যেসব মগ বা রাখাইন বাস করে তাদের বলা চলে না অনগ্রসর জনগোষ্ঠী। সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাদের ধরতে হয় খুবই উন্নত।

বাংলাদেশে জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (শন্তু লারমা) গড়েছেন আদিবাসী ফোরাম। যার লক্ষ হচ্ছে তথাকথিত আদিবাসীদের নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গড়া। কিন্তু বাংলাদেশে সব উপজাতি কোন একটা বিশেষ ভৌগলিক এলাকায় বাস করে না। কথা বলে না কোন একটি মাত্র ভাষায়। তাদের ইতিহাস ধর্ম বিশ্বাস অর্থনৈতিক জীবন এক নয়। সর্বপরি তারা সকলে এক মানবধারাভুক্তও নয়। খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বন্দরবন জেলায় মগ(মারমা) এবং চাকমাদের মধ্যে লেগে আছে বিবাদ বিসংবাদ। শান্তু লারমার এক রাষ্ট্রের ধারণা বাস্তবায়ন তাই সহজ সাধ্য নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশে বাংলাভাষী মানুষ হল এদেশের ভূমিজ সন্তান। তারা যুগযুগ ধরে বাস করছে এখানে। আজকের পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ হল তাদের সংগ্রামের ফল। এদেশ রক্ষা করবার জন্যে যুদ্ধ করতে হলে অবশ্যই তারা তা করবে। সে মনোবল তাদের আছে। তারা শান্তু লারমার মত কারও হুংকারের ভয়ে ভীত হবার নয়। পর্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের মধ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে শেখ মুজিব তাদের বলেছিলেন বাঙালি হতে। কিন্তু বর্তমানে বলা হচ্ছে যে, সাবেক পর্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপজাতিরা স্বাধীন হবার যোগ্য। পর্বত্য চট্টগ্রাম বিচ্ছিন্ন হবার অর্থ দাঁড়াবে বাংলাদেশের ১০ ভাগের একভাগ ভূমি চলে যাওয়া। বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ হারানো এবং সেই সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়া। বাংলাদেশের মানুষ সেটা হতে দিতে পারে না। নানা ষড়যন্ত্র চলেছে। সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অনেক উপজাতি খৃস্টান হয়েছে। কিছু বিদেশী খৃস্টান মিশনারী নাকি চাচ্ছে পার্বত্য অঞ্চলকে পূর্ব তিমুরের মত একটি খৃস্টান রাষ্ট্রে পরিণত করতে। শন্তু লারমা কাদের এজেন্ট আমরা জানি না। আমরা জানি না বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটি কাদের অর্থে চলেছে। বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী এমন অনেক কিছু করছে যা হচ্ছে না

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের একাংশের কার্যকলাপ যেন হয়ে উঠতে চাচ্ছে খুবই স্বদেশ বিরোধী।

এবার (২০১২) রাজশাহী শহরে আদিবাসী দিবসে বেরিয়েছিল বিরাট সাঁওতাল মিছিল। একটি বিশেষ তথাকথিত রাজনৈতিক দল এখানে সাঁওতাল নিয়ে বিশেষভাবে মেতে উঠেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে সাঁওতাল নিয়ে বাম রাজনীতি নতুন নয়। ১৯৫০ সালে কম্যুনিস্ট ইলামিত্র ও তার স্বামী রমেন মিত্র চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার(তখন মহকুমা) নাচোল থানায় ঘটান সাঁওতাল বিদ্রোহ। সাঁওতালরা নাচোল থানার তিনজন কনস্টেবল ও দারোগাকে হত্যা করে। জনগণ ক্ষেপে যায় সাঁওতালদের ওপর। তদানীন্তন সরকার নাচোলে সৈন্য পাঠায় সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করতে। রমেন মিত্র দেশ ছেড়ে পালান। কিন্তু তার স্ত্রী ইলা মিত্র ধরা পড়েন সরকারী সৈন্যদের হাতে। তার বিচার হয় রাজশাহী আদালতে। তিনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলেন– সাঁওতালরা অশিক্ষিত, বন্য, বর্বর। তিনি দারোগা ও কনস্টেবলকে হত্যা করতে বলেননি। এই হত্যার জন্যে সাঁওতালরা কেবল দায়ী। তিনি নন। এখন আবার বামরা সাঁওতালদের নিয়ে রাজনীতি করতে চাচ্ছেন। জানি না সাঁওতালদের ক্ষেপিয়ে তাদের আবার কোন বিপদের মধ্যে নিয়ে ফেলা হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নাচোলে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে পরে কম্যুনিস্টরা বলেছিল যে, এটা ছিল সংকীর্ণ বাম রাজনৈতিক বিচ্যুতির ফল। বৃহত্তর জনসমাজকে বাদ দিয়ে কোন ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠিকে নির্ভর করে সমাজে বিপ্লব হতে পারে না। আজ সারা পৃথিবীতে কম্যুনিস্টরা আর আগের মত রাজনৈতিক শক্তি নয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়েছে। রাশিয়ার মানুষ চাচ্ছে উদার বহুদলীয় গণতন্ত্র। সে দেশে কম্যুনিস্টরা আর ক্ষমতায় নেই। চীনে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায় আছে। কিন্তু তারা পরিত্যাগ করেছে কম্যুনিস্ট সমাজ দর্শন। হয়ে উঠেছে উগ্র হান চীনা জাতীয়তাবাদী। চীনে এক দলীয় কম্যুনিস্ট শাসন আর কতদিন টিকবে আমরা তা জানি না। চীনে বিদ্রোহ করছে উইঘুর মুসলমানরা। বিদ্রোহ করছে তিবক্ষতিরা। তারা মানতে চাচ্ছে না হান চীনা আধিপত্য। তবে চীন, রাশিয়া আমাদের ভাবনার বিষয় নয়। আমাদের ভাবনার বিষয় বাংলাদেশ। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ পরিচালিত হচ্ছে এককালের কম্যুনিস্টদের কিছু চিন্তা চেতনার দ্বারা। সম্প্রতি এরশাদের মত নেতা বলেছেন (বাংলাদেশ প্রতিদিন; ১১ আগস্ট ২০১২) যে, সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত ও মতিয়া চৌধুরি, এমন কি কখনো কখনো পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্য শুনলে চিন্তায় পড়তে হয়, এটা আওয়ামী লীগ সরকার না কম্যুনিস্ট সরকার ? যা হোক এবার বাংলাদেশ সরকার সরকারীভাবে আদিবাসী দিবস প্রতিপালন করল না। এর জন্য তাদের জানাতে হয় মোবারকবাদ।

***

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

বাংলাদেশের ইতিহাসকে বুঝতে হলে বৌদ্ধধর্ম ও তার ওপর নির্ভরশীল সংস্কৃতিকে কিছুটা জানতে হয়। এই উপমাহদেশের অনেক অঞ্চল থেকে বৌদ্ধধর্মের বিলুপ্তির পর তা অনেক দিন টিকে ছিল বঙ্গ-মগধে। মগধ বলতে বোঝায়, বর্তমান দক্ষিণ বিহারের একটি অংশকে। প্রাচীনকালে বঙ্গ-মগধ ছিল একই পাল বংশের রাজাদের নিয়ন্ত্রণে। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। বঙ্গ-মগধ ছিল যথেষ্ট বৌদ্ধধর্মীর বাস। যদিও এই বৌদ্ধধর্ম আদি বৌদ্ধধর্ম থেকে হয়ে পড়েছিল অনেক ভিন্ন। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে একে আর ঠিক বৌদ্ধধর্ম বলাই চলে না। প্রাচীন যুগে এ সময় বৌদ্ধধর্ম বহুদূর বিস্তৃত ছিল। এখনো তার বিস্তার যথেষ্ট অঞ্চল জুড়ে। গৌতম বুদ্ধের অহিংসা পরম ধর্ম এই মত প্রবাহিত করে চলেছে বহু মানুষের কর্মকাণ্ডকে। সম্ভবত এক সময় বৌদ্ধধর্ম সিরিয়াতে ছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল আরবের হেজাজ অঞ্চলেও। ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা কার যায় না। কিন্তু কিছুক্ষেত্রে এই দুই ধর্মের মধ্যে থাকতে দেখা যায় সঙ্গতি। কাবাগৃহ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় তীর্থস্থান। মক্কায় হজ্জ ও ওমরাহ করতে গেলে মুসলমানদের এখনো পরিধান করতে হয় সেলাই না করা জামা। কতকটা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের চীবরের মতো। হতে হয় মুণ্ডিত মস্তক (এখন অবশ্য চুল ছোট করে কাটলেও হয়)। মুন্ডিত মস্তকও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। হজের সময় কাবা গৃহকে প্রদক্ষিণ করতে হয় সাতবার। বৌদ্ধধর্মে বৌদ্ধস্তুপকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হলো রীতি। মক্কায় কাবাগৃহের কাছে কোন প্রাণী হত্যা করা চলে না। যার মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে একটা অহিংস নীতির। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, হজের সময় পুরুষ ও মহিলারা একত্রে পরিক্রমা করে কাবাগৃহকে। এ পরিক্রমার সময় মহিলাদের মুখ খোলা রাখা রীতি। কী করে ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে একই ধরণের তীর্থ পদ্ধতির উদ্ভব হতে পেরেছে সেটা নিয়ে এখনো হতে পারে গবেষণা। তবে অনেকের মতে এটা এসেছে বৌদ্ধধর্ম থেকে। খলিফা আবুবকর (রা) তাঁর সৈন্যদের মুণ্ডিত মস্তক বিশিষ্ট সাধুদের কোন ক্ষতি করতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর বক্তৃতায়। এ কথা আমরা জানতে পারি স্যার সৈয়দ আমীর আলীর লিখিত History of Saracens বইতে। এ থেকে এটুকু অনুমান করা যায় যে, ইসলামের সূচনাতেও বৌদ্ধধর্মের কিছু প্রভাব মধ্যপ্রাচ্যে ছিল। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, মানুষকে হতে হবে মধ্যপন্থী। ইসলামেরও অন্যতম বক্তব্য হলো মধ্যপন্থার অনুসরণ। ইসলামে দুস্থ অভাজনদের দান করতে বলা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মেও বলা হয়েছে দান-ধ্যানের কথা। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে যেমন সংসার ত্যাগ করে মানুষকে সন্যাসী হওয়ার উপদেশ দেয়া হয়েছে, ইসলামে তা দেয়া হয়নি। ইসলামে মানুষকে বলা হয়েছে গৃহী জীবনযাপন করতে। ইসলাম ধর্ম জগৎকে স্বীকার করতে

www.pathagar.com

বলে। একে অস্বীকার করে চলতে বলে না। তবে বৌদ্ধধর্মের মতো ইসলামও বাসনাকে কমিয়ে সুখী হতে বলেছে মানুষকে। বৌদ্ধধর্মে এখন গৌতম বুদ্ধের মুর্তিকে পূজা করা হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে এরকম কোন মুর্তি গড়ে পূজার রীতি ছিল না। গৌতম বুদ্ধকে প্রতীকের মাধ্যমে স্মরণীয় করা হয়েছে। এসব প্রতীকের মধ্যে যুগ্ম পদচিহ্ন, শূন্য সিংহাসন, বৌদ্ধচক্র এবং অশ্বত্থ গাছ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধের মূর্তি গড়া শুরু হয় অনেকের মতে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী থেকে। বাংলাদেশে যে বৌদ্ধধর্ম পালিত হতো, তাতে বহু দেবদেবীর মুর্তি গড়ে পূজা করা হতো। এসব মূর্তি সাধারণত গড়া হয়েছে কালো পাথর কেটে। বাংলাদেশে ও মগধে বৌদ্ধ ভাস্কর্য পেয়েছে বিশেষ রূপ। বৌদ্ধধর্মের দুটি বড় শাখা আছে। একটি শাখাকে বলা হয় মহাযান আর অপরটিকে বলা হয় হীনযান বা থেরাবাদী। বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল বজ্রযান রূপ। বজ্রযান আবার রূপান্তরিত হয়েছিল তান্ত্রিক প্রভাবে অনেক শাখায়। এখন বাংলাদেশে বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম আর নেই। এখানে বৌদ্ধরা হলেন থেরাবাদী (হীনযান)। বাংলাদেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম টিকেছিল খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভকাল পর্যন্ত। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে দলে দলে বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেন। আর এ কারণেই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল হয়ে ওঠে মুসলিম প্রধান। বৌদ্ধরা যে কেবল বাংলাদেশেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন এমন নয়। বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেও। আর আজ তাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হতে পেরেছে মুসলিম জনসংখ্যার প্রাধান্য। বাংলাদেশে হিন্দুরা এক সময় মুসলমানদের বলেছেন 'নেড়ে'। বৌদ্ধরা মাথা ন্যাড়া করতেন। নেড়ে নামটার উদ্ভব হতে পেরেছে এ কারণেই। বাংলাদেশের সাথে মালয়েশিয়ার ও ইন্দোনেশিয়ার ছিল নিকট যোগাযোগ। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার লোকের মতো বাংলাদেশের মুসলমান লুঙ্গি পরেন। এক সময় এ দেশে হিন্দুরা লুঙ্গি পরতে চাইতেন না। তারা লুঙ্গিকে মনে করতেন মুসলমানি পোশাক। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচারিত হতে পেরেছে প্রধানত দক্ষিণ আরব উপদ্বীপে মুসলিম আরব বণিকদের চেষ্টায়। এই অঞ্চলে মুসলমানেরা প্রধানত সাফি মাজহাবভুক্ত। তবে বাংলাদেশের মুসলমানরা প্রধানত মধ্য এশিয়ার তুর্কি মুসলমানদের মত হানাফি মাজহাবভুক্ত। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার নিয়ে এখনো যথেষ্ট গবেষণা হয়নি। যা হওয়া দরকার।

বৌদ্ধরা স্তুপের পূজা করেন। স্তুপকে সাধারণত তিনভাগে ভাগ করা যায়। শরীস্তুপ, পরিভৌগিক স্তুপ এবং নির্দেশিত স্তুপ। শরীস্তুপ বলতে বোঝায় এমন স্তুপকে, যেখানে বুদ্ধদেব অথবা তার অনুচর ও শিষ্যবর্গের দেহবাশেষ রক্ষিত আছে বলে মনে করা হয়।

পরিভৌগলিক স্তুপ বলতে বোঝায় এমন স্তুপকে, যেখানে বুদ্ধের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি রক্ষিত আছে বলে মনে করা হয়। নির্দেশিক বা উদ্দেশিক স্তুপ বলতে বোঝায় এমন

www.pathagar.com

স্তুপকে, যা নির্মিত হতে পেরেছে বৌদ্ধ ধর্মের সাথে জড়িত কোন ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে। এ শ্রেণির স্তুপকে বড় হলঘরের মধ্যে নির্মাণ করে পূজা করা হতো। স্তুপের তিনটি অংশ: স্তুপের অনুচ্চগোলাকৃতি অধঃভাগের ওপর গুম্বুজাকৃতির মধ্যম বা প্রধান অংশ এমনভাবে তৈরি করা হত, যাতে অধঃভাগের খানিকটা স্থান মুক্ত থাকে। যার উপর দিয়ে গম্বুজের চারদিকে ঘুরে আসা যায়। ভক্তরা এই পথ ধরে স্তুপের গম্বুজ আকৃতির অংশকে প্রদক্ষিণ করতো। গম্বুজের উপর থাকতো একটি গোলাকৃতি চাকা। এ ছিল প্রাচীন স্তুপের সাধারণ আকৃতি। পরে এর কিছু হেরফের হয়। প্রাচীন বৌদ্ধস্তুপের একটি বিশেষ নিদর্শন হল সাঁচীর বৌদ্ধস্তুপ। এটি নির্মিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। এই স্তুপটি আবার পুনর্নির্মিত হয় আদর্শ স্তুপের নিদর্শন হিসাবে ইংরেজ আমলে। বাংলাদেশে সুলতানী আমলে যেসব মসজিদ নির্মিত হয়েছে তাদের গম্বুজগুলো করা হয়েছে কতকটা বৌদ্ধস্তুপের অনুকরণে। চৈত্য বলতে বোঝাত এমন হলঘর, যেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সমবেত হয়ে প্রার্থনা করতেন। বাংলাদেশের সুলতানী আমলের মসজিদগুলোর মিল আছে বৌদ্ধ চৈত্যের সাথে। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের উপর এক পর্যায়ে পড়েছে বৌদ্ধ স্থাপত্যের প্রভাব। বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের বিশ্লেষণ করতে হলে তাই জানতে হয় এ দেশে ইসলাম পূর্ব বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে। গৌড়ে (যা এখন ভারতের অংশ) আছে কদম-রসুল। সেখানে কালো পাথরের উপর সংরক্ষিত আছে হযরত মুহাম্মদ (স)- এর যুগল পদচিহ্ন। বাংলাদেশে দু একটি স্থানেও রয়েছে হযরত মুহাম্মদ (স)- এর কথিত পদচিহ্ন। এই যে পদচিহ্নের প্রতীক, এটা কতটা বৌদ্ধ ধর্মের অনুসরণে কৃত, তা আমরা বলতে পারি না। তবে বাগদাদেও এরকম পদচিহ্ন সংরক্ষিত ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম আর বৌদ্ধ দর্শন সমার্থক নয়। গৌতম বুদ্ধকে অনেকে বলেন শাক্যমণি। গৌতমবুদ্ধ বা শাক্যমণি ঈশ্বর আছেন কি নেই সেই সম্পর্কে কিছু বলেননি। তিনি বলেছেন, সুখী হবার একটি উপায় হল, জীবনের চাওয়াকে বা অভিলাষকে কমানো। গৌতম বুদ্ধ বিলাসব্যসনকে পছন্দ করেননি। কিন্তু তিনি পরে পূজিত হয়েছেন তাঁর ভক্তদের দ্বারা। তিনি হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর। তাঁর ভক্তরা তাঁর মুর্তি গড়েছেন স্বর্ণ দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) গৌতমবুদ্ধের দর্শনকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন, মানুষের বাসনাকে কমিয়ে দুঃখ যন্ত্রণাকে কমাতে হবে; এই মতবাদ দিয়ে। তিনি বলেন, নির্বান লাভ সম্ভব হতে পারে একমাত্র আমাদের পাওয়ার ইচ্ছাকে সংযত করে। আমরা ইচ্ছাকে যত কমাই ততই হতে পারি সুখী। গৌতম বুদ্ধ এভাবেই মানুষকে নির্বাণ অর্থাৎ সুখী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্বান অর্থ প্রদীপ নিভে যাওয়া। রূপক অর্থে মানুষের কামনা বাসনা নির্বাপিত হওয়া। সোপেনহাওয়ারের মতে, বৌদ্ধধর্মের ব্যাখ্যা এদেশে অনেককে গৌতম বুদ্ধের চিন্তাকে নতুনভাবে উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করে।

www.pathagar.com

জার্মান গবেষকরা বৌদ্ধধর্ম নিয়ে এযাবৎ সবচেয়ে বেশি এবং মূল্যবান গবেষণা করেছেন। বিখ্যাত জার্মান পালি ভাষাবিদ গাইগার প্রথম বলেন- গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে। বুদ্ধ ৮০ বছর জীবিত ছিলেন। তিনি জন্মেছিলেন খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে। এই মত এখন অধিকাংশ পণ্ডিতের সমর্থন লাভ করেছে। আর এর ওপর নির্ভর করেই লিখিত গৌতম বুদ্ধের ঐতিহাসিক জীবনবৃত্তান্ত। গৌতম বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদন এবং মাতার নাম মহামায়া। শুদ্ধোদন ছিলেন তৎকালীন গণতন্ত্রমূলক শাক্য রাজ্যের নায়ক বা রাজা। শাক্য রাজ্যের রাজধানী কপিলাবস্তুর অনতিদূরে লুম্বিনী উদ্যানে গৌতমবুদ্ধের জন্ম হয়। জন্মের সাতদিন পরে মাতা মহামায়ার মৃত্যু ঘটে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর খালা (শুদ্ধোদনের অপর স্ত্রী) মহাপ্রজাপতির কাছে পালিত হন। গৌতম বুদ্ধ যশধরা বা গোপা নামে এক সুন্দরীর পাণি গ্রহণ করেন। তাঁর এক সন্তান হয়। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ পিতা, নবজাতক পুত্র ও সুন্দরী তরুণী স্ত্রীকে ছেড়ে ২৯ বছর বয়সে মানুষের দুঃখ- যন্ত্রণাকে লাঘবের উপায় নিরূপণের জন্য গৃহ ত্যাগ করেন। পৃথিবীতে এরকম ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশি নেই। তিনি প্রতিপালিত হন ঐশ্বর্যের মধ্যে। কিন্তু ঐশ্বর্য তাকে ধরে রাখতে পারেনি। বর্তমান বুদ্ধ-পূর্ণিমা উদযাপিত হয়। এর সাথে গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক প্রজ্ঞার কোন সুদূর যোগাযোগ নেই। বুদ্ধ পূর্ণিমায় গৌতম বুদ্ধের পূজা করা হয়। যে পূজা গৌতম বুদ্ধ কখনোই কাম্য বলে মনে করেননি।

***

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বৌদ্ধ মুসলিম সম্পর্ক

কদিন ধরে পত্রপত্রিকায় চট্টগ্রাম বিভাগের বৌদ্ধ- মুসলিম সংঘাতের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। বৌদ্ধ- মুসলিম সংঘাত যতনা ঘটছে ধর্মীয় কারণে, তার চাইতে অধিক ঘটছে রাজনৈতিক কারণে। কিন্তু যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম জড়িয়ে পড়ছে রাজনীতির সঙ্গে, তাই বৌদ্ধ ধর্মের কিছু সাধারণ আলোচনা হয়ে উঠেছে প্রাসঙ্গিক।

ধর্ম চেতনার দিক থেকে আদিতে বৌদ্ধধর্ম ছিল অন্য ধর্মের থেকে যথেষ্ট আলাদা। একে ঠিক একটি ধর্ম চেতনা বলা যায় না। ধর্মের ভিত্তি হল ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা। কিন্তু গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে চাননি কিছু বলতে। তিনি চেয়েছেন, মানুষের দুঃখ নিবৃত্ত করতে। চেয়েছেন মানুষের জীবনে আনতে প্রশান্তি। যাকে আর এক কথায় বলা হয় নির্বাণ। মানুষের দুঃখের একটা কারণ হল, বাসনা। মানুষ অনেককিছু পেতে চায়। কিন্তু তা সে পেতে পারে না। আর যেহেতু সে পেতে পারে না, তাই হয় অসুখী। হয় না পাবার দুঃখে ভারাক্রান্ত। সুখী হতে হলে তাই বাসনাকে কমাতে হবে। তা হলে লাঘব হতে পারবে আমাদের বেদনা। কারণ কমবে না পাবার দুঃখ। এ হল বৌদ্ধ ধর্মের একটি সাধারণ অনুজ্ঞা। দুঃখের আর একটি বিশেষ কারণ হল- হিংস্রতা। সুখি হতে হলে তাই করতে হবে হিংস্রতা পরিহার। গৌতমবুদ্ধের শিক্ষার একটি মূলমন্ত্র তাই হতে হয়েছে অহিংসা বা হিংস্রতা থেকে নিবৃত্তি। গৌতম নিষিদ্ধ করেছেন প্রাণী হত্যা। কারণ, প্রাণী হত্যার মাধ্যমে প্রশ্রয় পায় মানুষের হিংস্রতা প্রবৃত্তি। বৌদ্ধ মতে উদ্ভিদের জীবন আছে কিন্তু আত্মা নেই। তাই তাদের আহার করা চলে। তাতে মানুষের হিংস্রতার প্রসার ঘটতে পারে না। আধুনিক বিজ্ঞান বলে প্রাণীদের মত, উদ্ভিদের নেই বেদনাবোধ। উদ্ভিদ ভোজনকে তাই অহিংসার পরিপন্থী বলা চলে না। বৌদ্ধ ধর্মে দুদ্ধকে ধরা হয় নিরামিষ। কারণ দুদ্ধপানে প্রাণী হত্যা হয় না। বৌদ্ধধর্মে অবশ্য অনেকদিন তর্ক চলেছে বৃক্ষের আত্মা আছে কি নেই, সেটা নিয়ে। কিন্তু এক পর্যায়ে এসে বৌদ্ধরা মনে করেছেন বৃক্ষের আত্মা নেই। তাই তাদের নেই মানুষের মত সুখ দুঃখের অনুভব। তবে বৃক্ষের মধ্যে অশরীরী আত্মারা আশ্রয় নিতে পারে। যাদের বলা হচ্ছে যক্ষ। যক্ষরা ইচ্ছা মত নানা রূপ ধারণ করতে পারে। যক্ষের ধারণা বৌদ্ধধর্মে অধিকার করেছে বিশেষ স্থান। বৌদ্ধরা চেয়েছেন নানাভাবে অপ-যক্ষের প্রভাব এড়াতে। বৌদ্ধধর্মে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। গৌতমবুদ্ধ ছিলেন মুর্তিপূজার বিরোধী। কিন্তু শেষে বৌদ্ধরা হয়ে উঠেছেন মুর্তি পূজারি। যে গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বর আছেন কি নাই, সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাননি, সেই তিনিই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছেন পরম ঈশ্বর। বৌদ্ধ ধর্মে ঢুকে পড়েছে স্বর্গ, নরক আর নানা দেবদেবীর ধারণা। যা গৌতমবুদ্ধের চিন্তা চেতনা থেকে হয়ে পড়েছে বিশেষভাবেই ভিন্ন। বৌদ্ধধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য হল স্তুপের পূজা। প্রাচীন যুগে কোন মানুষ মারা গেলে তার স্বজনরা তাকে

www.pathagar.com

কবর দিয়ে তার ওপর গড়েছে মাটির ঢিবি। আর অনেক ক্ষেত্রে এই মাটির ঢিবি বা স্তুপকে প্রদক্ষিণ করে করেছে মৃত আত্মার পূজা। এক পর্যায়ে স্তুপের পূজা বিশেষ করে যুক্ত হয়ে পড়েছে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে। বৌদ্ধদের স্তুপ হল চার প্রকার: শরীর স্তুপ, পরিভৌগিক স্তুপ, নির্দেশিক স্তুপ ও নিবেদন স্তুপ। শরীর স্তুপ বলতে বুঝায়, বুদ্ধদেব এবং তার অনুচর ও শিষ্যবর্গের দেহবশেষ যেসব স্তুপে রক্ষিত আছে অথবা আছে বলে মনে করা হয়, সেইসব স্তুপকে। পরিভৌগিক স্তুপ বলতে বুঝায়,– সেইসব স্তুপকে, যাদের মধ্যে গৌতমবুদ্ধের ব্যবহৃত জিনিস রক্ষিত আছে অথবা আছে বলে মনে করা হয়। নির্দেশিক বা উদ্দ্যেশিক স্তুপ বলতে বুঝায়, বুদ্ধদেবের জীবন- ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত স্থানে নির্মিত স্তুপকে। নিবেদন স্তুপ বলতে বোঝায় কেবলই পূজার জন্যে নির্মিত স্তুপকে।

ইসলামে মুর্তিপূজা নেই। নেই স্তুপের পূজা। কিন্তু তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের ছাত্ররা ইসলাম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তুলনা করতে যেয়ে কতগুলি বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। কাবাগৃহ হল মুসলমানদের সর্বচ্চ পবিত্র তীর্থস্থান। হজব্রত পালনের সময় কাবাগৃহকে সাতবার প্রদক্ষিণ করা হয়। চারবার দ্রুত এবং তিনবার মন্থর বেগে। যা হল কতকটা বৌদ্ধদের স্তুপ প্রদক্ষিণেরই মত। হজ করবার সময় পুরুষেরা কোন সেলাই করা জামা পরতে পারেন না। তাদের পরিধান করতে হয় দুই টুকরা সেলাই না করা বস্ত্র। এক টুকরা কাপড় ব্যবহার করতে হয় দেহের নিম্নভাগ ঢাকবার জন্যে। আর অপর টুকরা কাপড় দিয়ে আবৃত করতে হয় বক্ষ ও স্কন্ধ। মাথা অনাবৃত রাখতে হয়। আগে নিয়ম ছিল হজের সময় পুরুষের মস্তক মুণ্ডায়ন করবার। কিন্তু এখন চুল খুব ছোট করে কাটলেও চলে। পুরুষের এই পোশাক মনে করে দিতে চায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের (সন্যাসীদের) পরিধেয় বস্ত্রের কথা। মহিলারা হজ করবার সময় স্বাভাবিক জামা পরিধান করতে পারেন। কিন্তু তাদের মুখমণ্ডল রাখতে হয় অনাবৃত। মেয়েরা বোরখার মত কোনকিছু পরিধান করতে পারে না হজের সময়। কাবাগৃহ ও তার নিকটস্থ কোন স্থানে প্রাণী হত্যা একেবারে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ হজব্রত পালনের সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায় বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে। আর এরমধ্যে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায় অহিংসার প্রবণতা। ইসলাম মানুষকে কেবল নিরামিষভোজী হতে বলেনি। কিন্তু খাদ্য হিসাবে প্রাণী হত্যাকে সমর্থন করলেও ইসলামে তা করতে বলা হয়েছে প্রাণীদের সবচেয়ে কম কষ্ট দিতে। ইসলামের এই নির্দেশের মধ্যেও থাকতে দেখা যায় একটা অহিংসতার প্রবণতা। ইসলাম মানুষকে হিংস্র হতে উৎসাহ যোগায়নি। কুরআন শরীফে আছে ১১৪ টি অধ্যায় বা সুরা। এরমধ্যে একটি ছাড়া সবকটি সুরা শুরুর প্রারম্ভেই বলা হয়েছে আল্লাহ পরম করুণাময় এবং ক্ষমাশীল। করুণা ও ক্ষমা ইসলামেরও অন্যতম দুটি অনুজ্ঞা। খলিফা আবুবকর তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন– 'ন্যায়পরায়ন হবে। কারণ, অন্যায় আচরণকারীরা শেষ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না। সাহসী হবে, মৃত্যুবরণ করবে,

www.pathagar.com

আত্মসমর্পন করবে না। সদয় ব্যবহার করবে। বৃদ্ধ, শিশু ও স্ত্রী লোকের গায়ে হাত তুলবে না। ফুলগাছ নষ্ট করবে না। নষ্ট করবে না খাদ্যশস্য ও গৃহপালিত পশু। কদাচ রূঢ় ব্যবহার করবে না আশ্রমবাসী সন্যাসীদের ওপর। (Syed Ameer Ali; History of the Saracens, Chapter- 4)| ঐতিহাসিকদের মতে এক সময় সিরিয়া অঞ্চলে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র। সিরিয়াতে ছিল বৌদ্ধ সন্যাসীদের আশ্রম। এখানে আশ্রমবাসী বলতে মূলত বোঝানো হয়েছে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের। তারাই বাস করতেন ঐসব আশ্রমে। রাজা অশোক সিরিয়া অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

ইসলামে জিহাদ করবার কথা বলা হয়েছে। জিহাদ হল তিন প্রকার: কাজের দ্বারা (ফিল), কথার দ্বারা (কাওল),এবং অস্ত্রের দ্বারা (কোৎল)। ইসলামী মতে ভালকাজ করে মন্দকাজ প্রতিরোধ হল জিহাদ। উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে সৎ পথে আনার চেষ্টা করাও হল জিহাদ। অস্ত্রের দ্বারা আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ ও পরাভূত করা হল জিহাদ। কিন্তু ইসলামে প্রথমে অস্ত্র ধারন করতে বলা হয়নি। অস্ত্র ধারণ করতে বলা হয়েছে শেষপর্বে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে– আল্লাহ আক্রমণকারীকে পছন্দ করেন না (সুরা ২; ১৯০-১৯৩)। ইসলামী মৌলবাদ নিয়ে বেশ কিছুদিন হল অপপ্রচার চলেছে। কিন্তু ইসলাম মানুষকে রক্তপাতে উৎসাহ প্রদান করে না। ইসলামের মূল শিক্ষা ক্ষমা, মৈত্রী ও ভালবাসা; রক্তপাত নয়। আমরা এসব কথা বলছি এই জন্যে যে, এখন বোঝাবার চেষ্টা চলেছে ইসলাম একটা জঙ্গিবাদী ধর্ম। কিন্তু ইসলামে শক্তি প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে জুলুম বন্ধ করবার জন্য। জুলুম করবার জন্যে নয়। জুলুমের বিরুদ্ধে জিহাদ ইসলামে অবশ্য-কর্তব্য (ফরজ)।

চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঠিক কী হয়েছে সে বিষয়ে আমরা বিস্তারিত জানি না। কিন্তু মনে হয়, এ থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা হবে যে, মুসলমানরা চাচ্ছেন বৌদ্ধধর্মীদের বিনাশ করতে। কারণ মুসলমানরা হলেন নীতিগতভাবেই জঙ্গিবাদী। তারা চান অস্ত্রের জোরে অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিনাশ করতে। কিন্তু এটা কোন ঐতিহাসিক ঘটনা নির্ভর ধারণা নয়। প্রাচীন বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, পালবংশের রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। পালবংশের রাজারা রাজত্ব করেছেন বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। এবং বর্তমান বিহারের মগধ অঞ্চলে। তারা ছিলেন বঙ্গ মগধের শাসনকর্তা। পাল রাজত্বের পর বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসেন সেন বংশের রাজারা। সেন বংশের রাজারা ছিলেন গোড়া হিন্দু। এদের রাজত্বকালে বৌদ্ধদের ওপর বাড়ে হিন্দুদের অত্যাচার। সেন রাজাদের পতন ঘটে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খালজির হাতে। হিন্দু রাজাদের এই পরাজয়কে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা করেন বিশেষভাবেই স্বাগত। তাদের কাছে মনে হয়েছিল, মধ্য এশিয়া থেকে আগত তুর্কি মুসলমানদের হিন্দু অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার জন্যে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রেরিত বাহিনী হিসাবে। বাংলাদেশে গৌতমবুদ্ধকে এক পর্যয়ে ধর্মঠাকুর হিসাবে পূজা করা শুরু হয়। ধর্ম

www.pathagar.com

ঠাকুরের পূজা সম্পর্কে লিখিত একটি পুথি পাওয়া গিয়েছে। পুথিটির নাম 'ধর্মপূজা বিধান'। যার বয়সকাল নির্ধারণ করা যায়নি। এই পুথিতে 'নিরঞ্জনের রুস্মা' নামে একটি কবিতা আছে (নিরঞ্জন অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধ)। ব্রাহ্মনেরা ধর্মঠাকুরের ভক্তদের সাথে কী রকম দুর্ব্যবহার করতেন তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে এই কবিতায়। ব্রাহ্মনদের অত্যাচারের ভয়ে ধর্মঠাকুরের পূজারিরা ভয়ে কম্পমান হয়ে উঠেছিল। বিচলিত ভক্তরা ধর্মঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য। তাদের প্রার্থনা শুনে বৈকুণ্ঠে (স্বর্গে) ধর্মঠাকুরের তথা বুদ্ধের আসন টলে ওঠে। এই কাবিতায় লেখা হয়েছে–

ধর্ম্মে হৈলা যবনরূপী শিরে পরে কাল টুপি
হাতে ধরে ত্রিকচ কামান,
চাপিয়া উত্তম হয় দেবগণে লাগে ভয়
খোদায় হইল এক নাম।
ব্রহ্মা হৈল মোহাম্মদ বিষ্ণু হৈল পেগম্বর
মহেশ হইল বাবা আদম,
গণেশ হইল কাজী কার্ত্তিক হইল গাজী
ফকীর হইল মুণিগণ।
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল শেখ
পুরন্দর হইল মৌলানা,
চন্দ্র সূর্য্য আদি যত পদাতিক হইল শত
উচ্চস্বরে বাজায় বাজনা।
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তেঁহ হইল হায়া বিবি
পদ্মা হইল বিবি নূর,
যতেক দেবতা গণ করিল দারুণ পণ
প্রবেশ করিল জাজপুর।

এইভাবে দেবতাগণ মুসলমানের রূপ ধারণ করে জাজপুরে প্রবেশ করে ভাঙল হিন্দুদের মন্দির। সৃষ্টি করল মহা অনর্থ। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদাদেরর মতে দলে দলে বৌদ্ধরা মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেন এবং গ্রহণ করেন ইসলাম(শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার; বংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ)। বাংলাদেশে তাই কেবল গায়ের জোরে ইসলাম প্রচারিত হয় এই দাবিকে ঐতিহাসিক বলে সমর্থন দেয়া যায় না। এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতে দলে দলে বৌদ্ধ তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে গ্রহণ করতে থাকেন ইসলাম। এই অঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের ছিল নিবিড় বাণিজ্য সম্পর্ক। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ইসলাম প্রচারের একটা প্রভাব সম্ভবত এসে পড়েছিল বাংলাদেশের বৌদ্ধদেরও ওপর।

দক্ষিণ ভারতে জাফর শরীফ নামে এক ব্যক্তি 'কানন-ই-ইসলাম' নামে একটি বই লেখেন। বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন G. A. Herklot। বইটির নাম দেন

www.pathagar.com

Islam in India। পরে এই অনুবাদকে ১৯২১ সালে ঢেলে সাজান বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক W. Crooke। এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছদে ক্রুক বলেন– বাংলাদেশে হিন্দুরা মুসলমান হননি, হয়েছেন বৌদ্ধরা। তাই বাংলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যায় হতে পেরেছে এত বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকমা এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার বড়ুয়া মগরা দাবি করছেন, তাদের পূর্ব পুরুষরা চট্টগ্রাম অঞ্চলে গিয়েছিলেন বিহারের মগধ অঞ্চল থেকে। বড়ুয়া মগদের দাবি, তাদের মগ বলা হয়, কারণ তাদের পূর্ব পুরুষ এসেছিলেন মগধ থেকে। মগধ থেকেই হতে পেরেছে মগ নামের উদ্ভব। কিন্তু চাকমা মগ এবং বড়ুয়া মগরা যে বৌদ্ধধর্মকে এখন অনুসরণ করছেন, তা হল থেরাবাদী বৌদ্ধধর্ম। যা এসেছে মিয়ানমার থেকে; বিহারের মগধ থেকে নয়। মগ নামের উৎপত্তি সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদ আছে। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' কলকাতা থেকে প্রকাশিত ভারত কোষের সপ্তমখণ্ডে বলা হয়েছে– মগ বলতে বোঝায় আরাকানবাসী ও ১৮শ শতাব্দীর শেষে চট্টগ্রামে পুনর্বাসিত আরাকানী উদ্বাস্তুদের। মগ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সম্ভবত বর্মী উপাধী 'মোভ' থেকে মগ নামের উদ্ভব হয়েছে। ভারত কোষে আরও বলা হয়েছে, আরাকানী মগরা শোড়ষ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জলদস্যুদের সঙ্গে একত্রে অথবা পৃথকভাবে শুরু করে জলদস্যুতা। এদের এই জলদস্যুতার ফলে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের ভয়ংকর ক্ষতি হয়। মগ জলদস্যুরা বাংলাদেশ থেকে শতশত মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করত দাসরূপে। বাংলাভাষায় তাই 'মগের মুল্লুক' বলতে বুঝায় ভীতিপ্রদ অরাজক রাষ্ট্রিক পরিস্থিতিকে। ১৬৬৬ খৃস্টাব্দে শায়েস্তা খাঁন চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ফলে ঘটতে পারে মগ জলদস্যুদের অত্যাচারের অবসান। এর আগে বাংলাদেশের রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত করবার একটি কারণ ছিল সুবেবাংলাকে মগ জলদস্যুদের হাত থেকে রক্ষা করা। পরে যখন অষ্টাদশ শতাব্দির শেষভাগে আরাকান ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে তখন ব্রহ্মরাজের ভয়ে ভীত হয়ে বহু আরাকানবাসী সাবেক চট্টগ্রাম জেলার প্রান্তভাগে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই মগদের সন্তানসন্ততিকে এখন আমরা বলি প্রকৃত মগ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যাদের বলা হয় প্রকৃত মগ, তারা বাস করেন প্রধানত কক্সবাজার জেলায়। এরা হলেন বড়ুয়া মগদের থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন। বড়ুয়া মগদের নিজস্ব কোন ভাষা নেই। তারা কথা বলেন চট্টগ্রামের বাংলায়। পক্ষান্তরে, মগরা এখনো তাদের নিজ ভাষায় কথা বলেন নিজেদের মধ্যে। তারা তাদের এই ভাষা লিখবার জন্যে ব্যবহার করেন বর্মী (ম্রনমা) অক্ষর। মগদের ছেলে মেয়েরা প্রাথমিক লেখাপড়া শেখে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে। মগ ও বড়ুয়া মগদের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আমরা যথাযথভাবে অবগত নই। উত্তম কুমার বড়ুয়া নামক একজন বৌদ্ধ বড়ুয়া মগ কুরআন শরীফের অবমাননা করেছে। প্রকৃত মগরা এর সঙ্গে কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট নন। উত্তম কুমার বড়ুয়ার অপরাধে সব মগদের অভিযুক্ত করা হচ্ছে খুবই

www.pathagar.com

বিভ্রান্তিকর। এই বিভ্রান্তির জন্যে ঘটতে পেরেছে প্রকৃত মগদের ওপর সাম্প্রতিক কক্সবাজার জেলায় হামলা। অনেক কিছুই ঘটছে। যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন, উত্তম কুমার বড়ুয়া ফেইসবুকে কুরআন শরীফ অব মাননার ছবি প্রকাশ করার আধা ঘণ্টা না যেতেই শুরু হতে পারল রামুতে হাঙ্গামা। মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যে এতলোক একত্রিত হয়ে লুটপাট চালাতে পারে না। লুটপাটের সময় প্রশাসন থাকল উদাসীন হয়ে। তাই মনে হচ্ছে যা কিছু ঘটছে তার মূলে আছে একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্র। আওয়ামী লীগ সরকার প্রচার করতে ব্যস্ত এটা ইসলামী মৌলবাদীদের চক্রান্তের ফল। কিন্তু ক্ষমতা এখন কোন মৌলবাদী সরকারের হাতে নেই। ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ সরকার। তারা কেন যথা সময়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করল না? বর্তমান মন্ত্রীসভার একজন শক্তিধর মন্ত্রী হলেন দিলীপ বড়ুয়া। যতদূর জানি, দিলীপ বড়ুয়া হলেন বড়ুয়া মগ সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই নানা প্রশ্ন দেখা দিতে পারছে জনমনে।

বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদ নিয়ে খুব সরব ছিল এবং এখনো আরো সরব হয়ে উঠেছে ভারতের প্রচার মাধ্যম। এটা হওয়া তাদের দিক থেকে খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থা কি খুবই ভাল? ১৯৫০-এর দশকে ভারতের বিখ্যাত নিম্নবর্ণের হিন্দু নেতা, ভারতের সংবিধানের অন্যতম রচক ড. আম্বেদ কর ভারতের সব নিম্নবর্ণের হিন্দুকে বলেছিলেন বৌদ্ধ হতে। ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা আম্বেদ করের উপদেশ শুনে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু এরফলে হিন্দুদের কাছে তারা উন্নত ব্যবহার পেতে পারছেন না। তারা তুচ্ছই থাকছেন। তারা উচ্চবের্ণের হিন্দুদের কাছে আছেন আগের মতই ঘৃন্য ও অস্পৃশ্য হয়ে। কিন্তু মুসলমানদের কাছে বাংলাদেশে বৌদ্ধরা কি এভাবে অবহেলিত? পত্রিকা পড়ে জানলাম, বাংলাদেশের কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু দাবি তুলেছেন– বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষিবাহিনী পাঠাবার। কিন্তু এরকম দাবি ওঠানো কি খুবই সঙ্গত হচ্ছে? জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী নেই। অন্য দেশের সেনাবাহিনীর সৈন্যরা চুক্তি ভিত্তিকভাবে কাজ করেন জাতিসংঘের রক্ষীবাহিনীতে। জাতিসংঘের সেনাবাহিনীতে যারা অধিক সংখ্যায় কাজ করেন, তার হলেন ভারত ও বাংলাদেশের সৈন্য। বাংলাদেশে যদি জাতিসংঘের হয়ে ভারতীয় সৈন্যরা আসতে চান, তবে চীন তার আপন স্বার্থেই করবে এর বিরোধীতা। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ দুর্বল রাষ্ট্র হলেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ কখনই চাইতে পারেন না এদেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যদি বিদেশী হস্তক্ষেপ কামনা করতে থাকেন, তবে তাদের সঙ্গে বাড়তে থাকবে এদেশের বৃহত্তর জনসমাজের, অর্থাৎ বাংলাভাষী মুসলমানদের মনোমালিন্য। সৃষ্টি হবে আরো জটিল সংঘাতময় পরিস্থিতির। বাংলাদেশে মুসলমান-বৌদ্ধ সংঘাত যদি দুটি সভ্যতার সংঘাতে রূপ নিতে চায় তবে পরিস্থিতি হয়ে উঠবে আরো ভিন্ন। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ অনেক মুসলিম দেশ সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে পারে বাংলাদেশের দিকে। সমস্যাটি হয়ে উঠতে চাইবে আন্তর্জাতিক। মনে রাখা প্রয়োজন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বহু মুসলমানের বাস। আর মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রধর্ম হলো ইসলাম।

***

www.pathagar.com

চাকমা রাজনীতিতে হিন্দুত্ব

'হিন্দুত্ব' কথাটার অভিধানিক অর্থ হল, হিন্দু ধর্মানুযায়ী ভাব। কিন্তু এই উপমহাদেশে এর বাস্তব অর্থ দাঁড়িয়েছে মুসলিম বিদ্বেষকে পুঁজি করে রাজনীতি করা। চাকমারা নিজেদের দাবি করেন বৌদ্ধ হিসাবে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা হলেন হিন্দু মনোভাবাপন্ন। তাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনা উদ্ভূত হতে পেরেছে ও পারছে হিন্দুত্ব থেকে। চাকমারা নিজেদের বৌদ্ধ বলে দাবি করলেও তারা করেছেন এবং এখনো করেন নানা হিন্দু দেব দেবীর পূজা। এদের মধ্যে আছেন- হিন্দু দেবী লক্ষ্মী, আছেন দেবী কালী। তবে হিন্দুদের থেকে চাকমাদের হিন্দু দেবদেবী পূজার রকম হতে পেরেছে বেশ কিছুটা ভিন্ন। ১৯০১ সালের আদমশুমারের রিপোর্টে বলা হয়েছে চাকমারা লক্ষ্মী পূজা করেন। কিন্তু লক্ষ্মী তাদের কাছে হলেন ফসলের দেবী। তারা লক্ষ্মী পূজা করেন ফসলের ফলন বৃদ্ধির লক্ষে। তারা লক্ষ্মীর কোন মূর্তি গড়ে পূজা করেন না। লক্ষ্মী পূজার জন্যে একটি পৃথক ঘরে একটি প্রস্তরখণ্ড স্থাপন করেন। লক্ষ্মী পূজার সময় এই পাথরের বেদীতে মুরগি, শুকুর ইত্যাদি প্রাণী বলি দেন। পরে তারা এই বলিপ্রদত্ত প্রাণীদের মাংশ রান্না করে পালন করেন মহাভোজ উৎসব। জে ডি এন্ডারসন (J. D. Anderson) এক সময় ছিলেন বৃটিশ আমলের চট্টগ্রাম জেলার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বাংলা ও আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে চাকরি করেন। বাংলা ভাষার ওপর তার ছিল গভীর টান। তিনি এই ভাষা শেখেন যথেষ্ট আগ্রহ ও মনোযোগ দিয়ে। শেষ বয়সে তিনি হন বিলাতের বিখ্যাত কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা সাহিত্যের অধ্যাপক। তিনি একটি বই লেখেন The Peoples of India নামে। তাঁর এই বইয়ের এক জায়গায় (পৃষ্ঠা-৮) চাকমাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন– চাকমারা হলেন তিব্বতি-বর্মী (Tibeto- Burman) মানবধারার লোক। কিন্তু এখন তারা অংশত হয়ে পড়েছেন হিন্দু (Partly Hinduised)। চাকমারা বাস করেন বাংলা প্রদেশের পূর্বপ্রান্তে। চাকমারা আধা হিন্দু। একথা বলেছেন এন্ডারসন ১৯১৩ সালে। এন্ডারসনের এই বক্তব্যকে ভিত্তি করে চাকমাদের বিচার করলে চাকমা রাজনীতির বর্তমান ধারাকে উপলব্ধি করা হয়ে ওঠে সহজ। চাকমারা হিন্দু মনোভাবাপন্ন এটা শুধু আমরা বলছি না। আরো একাধিক বৃটিশ পর্যবেক্ষকও করেছেন এই বিষয়ে একই রকম মন্তব্য। কেবল আমরা (বাংলাভাষী মুসলমান) এরকম মন্তব্য করলে উঠতে পারত মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এই সাম্পদায়িকতার অভিযোগ ওঠা সম্ভব নয়। চাকমারা কেন হিন্দুভাবাপন্ন হয়েছেন সেটার ব্যাখা করা সহজ নয়। কারণ, তারা এক সময়ে ঠিক হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন না। বরং ছিলেন মুসলিম ভাবাপন্ন। চাকমাদের সম্পর্কে একটা খুব নির্ভরযোগ্য বই লেখেন শ্রী সতীশচন্দ্র ঘোষ। বইটির নাম 'চাকমাজাতি'। বইটি

www.pathagar.com

প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। এই বইটিতে তিনি বলেছেন (পৃষ্ঠা- ৬)– এক সময় চাকমা ভূ-পতিরা নিজেদের নাম রাখতেন মুসলমানী প্রথায়। যেমন– জামুল খাঁ, শেরমুস্ত খাঁ, শের দৌলত খাঁ, জানবক্স খাঁ, টবক্ষর খাঁ, ধর্মবক্স খাঁ প্রভৃতি। চাকমা ভূ-পতিদের স্ত্রীরা তাদের নামের আগে বিবি সম্বোধন যোগ করতেন। চাকমারা খেদ অথবা বিশ্ময়ের আবেগ প্রকাশের সময় বলতেন খোদা। একে অপরের সঙ্গে দেখা হলে দিতেন সালাম। নমস্কার নয়। কেন কী কারণে চাকমারা পরে হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারলেন সেটার ব্যাখ্যা এখনো কেউ করবার চেষ্টা করেননি। তবে অনুমান করা চলে, চাকমারা বিশেষভাবে হিন্দু মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন বৃটিশ শাসনামলে, তার আগে নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এক সময় আরাকানের রাজারা ছিলেন গৌড়ের সুলতানদের সামন্ত। আরাকানের রাজারাও রাখতেন মুসলমানী কায়দায় নাম। এমনকি তাদের মুদ্রিত মুদ্রায় তাঁরা উৎকীর্ণ করেছেন কালেমা তাইয়্যেবা। সম্ভবত এই আরাকান রাজাদের একটা প্রভাব এসে পড়তে পেরেছিল চাকমা ভূপতিদের ওপর। সতীশচন্দ্র ঘোষের মতে, চাকমা নামটা এসেছে ব্রহ্মদেশীয় 'ছাক' অথবা 'ছক' নাম থেকে। বর্মী (ম্রনমা) ভাষায় চাকমাদের এই নামে ডাকা হয়। ছাক থেকে হয়েছে ছাকমা। আর ছাকমা থেকে হয়েছে চাকমা। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক রিজলে চাকমা নামের উদ্ভব সম্পর্কে প্রায় এই একই মত প্রকাশ করেছেন। কথাগুলি বলতে হচ্ছে এই কারণে যে, বর্তমানে প্রচার করা হচ্ছে চাকমা নামটি সৃষ্টি হতে পেরেছে সংস্কৃত 'শক্তিমান' শব্দ থেকে। এই শক্তিমান নামটি নাকি প্রদান করেছিলেন মিয়ানমারের কোন রাজা। কিন্তু মিয়ানমারের রাজা কেন সংস্কৃত নাম দিতে যাবেন তা বোঝা দুষ্কর। কারণ বর্মী বা ম্রনমা ভাষা হল তিব্বতি-চীনাভাষা পরিবারভূক্ত। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে ইন্ডো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের সঙ্গে তার (বর্মীভাষার) সুদূর যোগাযোগ কল্পনা করা যায় না। কিন্তু ভারত থেকে এখন প্রচার করা হচ্ছে চাকমা নামটি হল সংস্কৃত ভাষা থেকে আসা। 'শক্তিমান' শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষমতা সম্পন্ন। বোঝাবার চেষ্টা হচ্ছে, চাকমারা হলেন ক্ষমতাধর জাতি। এটা একটা বিশেষ রাজনৈতিক অভিসন্ধি। মানবধারার দিক থেকে চাকমারা হলেন মঙ্গলীয়শাখাভুক্ত। এটা তাদের চেহারা দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের কোনভাবেই 'আর্য' বলা যায় না। চাকমারা দাবি করছেন যে, তাদের পূর্বপুরুষ চম্পা নগর থেকে এসে উপনিবিষ্ট হন চট্টগ্রামে। তারা আসলে হলেন আর্য বংশোদ্ভব। চম্পা নগর ছিল বর্তমান বিহারের মগধ অঞ্চলের কোনস্থানে অবস্থিত। কিন্তু এই ধারণার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয় না। বিহারের মগধ অঞ্চলের মানুষের চেহারা চাকমাদের মত মোটেও মঙ্গলীয় নয়। বিহারের মানুষের সাথে চাকমাদের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আসলে চাকমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা বিষয়গতভাবে এখনও খুববেশি কিছু জানি না। কারো কারো মতে এই চম্পা (Champa) নগর মগধের চম্পা নগর নয়। এ হল বর্তমান ভিয়েতনামের

www.pathagar.com

চম্পা। যে চম্পা রাজ্যের এক সময় উদ্ভব হয়েছিল বর্তমান ভিয়েতনামের দক্ষিণভাগে। চম্পার ইতিহাস আমরা ভালভাবে জানি না। কিন্তু এখানে এক সময় অবস্থিত ছিল চম্পাপুর বা চম্পা নগরী। মাটি খুঁড়ে যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। এখানকার মানুষ এক সময় বিশ্বাস করত হিন্দুধর্মে। রাজাকে মনে করত, দেবতা শিব। তারা পূজা করত রাজলিঙ্গের। পরে এই অঞ্চলে প্রচারিত হয় থেরাবাদি বৌদ্ধ ধর্ম। থেরাবাদি বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হতে পেরেছিল শ্রীলংকার বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাধ্যমে। চম্পাপুর থেকে থেরাবাদি বৌদ্ধধর্ম এসেছিল মিয়ানমারে। বৃটিশ শাসনামলে আর এইচ হাচিনসন (R. H. Hutchinson) সংকলন করেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার গেজেটিয়ার। যা প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। এতে বলা হয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যেতে পারে 'ম্রো' এবং 'কুকিরা' প্রথমে এসে এখানে বসতি করেছিলেন। চাকমারা প্রথমে এসে বসতি করেছিলেন চট্টগ্রাম জেলার (সাবেক) মধ্যভাগে ম্রো এবং কুকিদের সরিয়ে দিয়ে। ম্রো এবং কুকিরা সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উত্তর-পূর্বভাগে। পরে বার্মা যুদ্ধের সময় মগ'রা (যাদের এখন আমরা বলছি মারমা) এসে উপনিবিষ্ট হতে থাকেন চট্টগ্রামে। মগরা এসে চাকমাদের মধ্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। চাকমারা বাধ্য হন রাঙামাটির গভীর বনাঞ্চলের বাসিন্দা হতে। চাকমারা, এই বর্ণনা সত্যি হলে বলতে হবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নন। চাকমাদের সম্পর্কে আমাদের মনে নানা ভুল ধারণা সঞ্চিত হয়ে আছে। যেমন আমরা মনে করি, চাকমাদের জীবনধারা বহন করছে নব্যপ্রস্তর যুগের ঐতিহ্য। জুমচাষ হল খুবই প্রাচীন চাষ পদ্ধতি। চাকমারা করেন জুমচাষ। আমি ১৯৫২ সালে একবার রাঙামাটি বেড়াতে গিয়েছিলাম। এ সময় দেখেছি চাকমা জুম চাষিরা বনের গাছ কাটছেন লোহার দা দিয়ে। বনে গাছ কাটার পর জুম চাষিরা ঐসব গাছকে কিছু দিন ধরে রোদে শুকাতে দেন, তারপর ঐসব কাটা গাছে ধরান আগুন। আগুন ধরিয়ে তারা বের করেন জমি। তারপর সেই জমিতে গর্ত করে বপন করেন বীজ। তারা জমিতে গর্ত করেন লোহার দা দিয়ে। জুম চাষ খুব প্রাচীন চাষ পদ্ধতি। অনেক নৃতাত্ত্বিক এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কারও কারও মতে, নব্য প্রস্তর যুগে মানুষ বনের গাছ কেটেছে পাথরের কুড়াল দিয়ে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এরকম কোন পাথরের তৈরি কুড়ালের অস্তিত্ব কোনদিন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও অন্যান্য উপজাতিরা বনের গাছ কেটেছেন লোহার দা দিয়ে। অর্থাৎ তাদের বলতে হয় আমাদের মতই লৌহ যুগের মানুষ। প্রাচীন ও নব্য প্রস্তর যুগের সংস্কৃতিকে তারা বহন করছেন না। চাকমা ও অন্যান্য পার্বত্য উপজাতির মধ্যে অবশ্য কোন লোহার কামার নেই। কামাররা সবাই হলেন বাঙালি। কিন্তু বাঙালি কামাররা যেয়ে তাদের কর্মশালা খুলেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নানা

www.pathagar.com

জায়গার হাটে বাজারে। তারা হয়ে উঠেছেন উপজাতি সমাজের অংশ। অন্যদিক থেকেও পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীকে বলা যেতে পারে না আদিম সমাজভুক্ত। তাদের মধ্যে সর্দার প্রথা ছিল। কিন্তু বৃটিশ শাসনামলে তাদের মেনে চলতে হয়েছে রাষ্ট্রিক আইন। অবশ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বিচার পদ্ধতি ছিল অন্য জেলার থেকে ভিন্ন। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচার করতেন ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার। তিনি বিচারক ছিলেন ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার। এখানে কোন জজ সাহেব ছিলেন না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বৃটিম শাসনামলে একমাত্র খুনের মামলা ছাড়া আর কোন মামলায় পেশাদার উকিল নিযুক্ত করা যেত না। কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের রায়ের বিপক্ষে কোলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা যেত। আর সেখানে ভূমি সংক্রান্ত মামলাতেও নিযুক্ত করা যেত উকিল। এইসব কথা বলতে হচ্ছে এই জন্যে যে, এখন দাবি করা হচ্ছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বৃটিশ শাসনামলে কোন রাষ্ট্রিক আইনের দ্বারা শাসিত হত না। পরিচালিত হত কেবল সনাতন প্রথাগত উপজাতি আইনের দ্বারা। কিন্তু এটা সত্য নয়। বৃটিশ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল হাইকোর্টের এখতিয়ারভুক্ত। হাইকোর্ট পারতো পার্বত্য চট্টগ্রামে আইন বলবত করতে।

আমরা বলেছি চাকমারা মনোভাবের দিক থেকে হলেন হিন্দু ভাবাপন্ন। আমরা মনে করি তাদের রাজনীতি এখন পরিচালিত হতে পারছে হিন্দু প্রবণতা দিয়ে। এ ক্ষেত্রে আমাদের কিছুটা বিশদ হবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি। যেটা করতে যেয়ে বলা প্রয়োজন, বৃটিশ শাসন আমলের রাজনীতি নিয়ে কিছু কথা। বৃটিশ আমলে হিন্দুদের মধ্যে যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে, সেটা ছিল হিন্দুত্ববাদী। এই জাতীয় চেবতনার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আছে *মন্দেমাতরম্* গানটি। এই গানটি হল বিশেষভাবে হিন্দু জাতীয়তাবাদী। এই গান একদিন হয়ে উঠেছে ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক চেতনার মূল উৎস। যার সঙ্গে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা কোনভাবেই একাত্ম হতে পারেনি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, *বন্দেমাতরম্* গানটির সুর বঙ্কিমচন্দ্র দেননি। সুর দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ভারত স্বাধীন হবার পর, ভারতের রাষ্ট্র গঠন পরিষদ (The Constituent Assembly) ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, ভারতের জাতীয় সঙ্গীত হবে দুটি। একটি হল বঙ্কিমচন্দ্রের *বন্দেমাতরম*, অপরটি হল রবীন্দ্রনাথের *জনগণমন*। এখন হিন্দিতে অনুদিত রবীন্দ্রনাথের *জনগণমন* গানটি গীত হচ্ছে বেশি। কিন্তু তা বলে *বন্দেমাতরম্* বাদ পড়ে যায়নি। আসলে ভারতের হিন্দু রাজনীতি পরিচালিত হচ্ছে হিন্দুত্ব দিয়ে। আর *বন্দেমাতরম্* হচ্ছে তার উৎস। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই পঁচিশ বছর ধরে বৃটিশ বাংলায় চলেছে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। সন্ত্রাসবাদীরা মনে করেছেন যে, নিয়মতান্ত্রিক পথে আন্দোলন করে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটানো যাবে না। করতে হবে বল প্রয়োগ। করতে হবে সাহেব কর্মচারীদের খুন। সৃষ্টি করতে হবে

www.pathagar.com

আতঙ্কের পরিবেশ। যা ভেঙে দেবে বৃটিশ মনোবল। আর এদেশে বিলুপ্তি ঘটাবে তাদের শাসনের। চট্টগ্রাম শহর হয়ে উঠেছিল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। চট্টগ্রামের সন্ত্রাসবাদী দলের সদস্যরা ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল ৯টা ৪৫ মিনিটে করেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। যা এই উপমহাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। চট্টগ্রামের ঘটনার প্রভাব সামান্য হলেও কিছু পরিমাণে নিশ্চয় রাঙামাটিতে গিয়েও পৌঁছেছিল। বর্তমান চাকমা নেতারা চট্টগ্রাম শহরের সন্ত্রাসবাদী অভ্যুত্থানের কাহিনী শ্রবণ করেছেন তাদের জ্যেষ্ঠদের কাছে। আর প্রভাবিত হয়েছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ধ্যানধারণার দ্বারা। চাকমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনাকে উপলব্ধি করতে হলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাসকে মনে রাখতে হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এখন আর বিশেষভাবে আলোচিত হয় না। কিন্তু আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু এর সাথে মুসলমানদের কোন সংশ্লিষ্টতা ছিল না। হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা মুসলমানদের করতেন ঘৃণা। তারা মুসলমানদের গ্রহণ করেননি তাদের দলে। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সম্পর্কে ভারতের এককালের বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহমদ তার আত্মজীবনী 'আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি' গ্রন্থে বলেছেন (ঢাকা সংস্করণ ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-১০)– *বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলন নিঃসন্দেহে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ছিল। কিন্তু তা হিন্দু উত্থানের আন্দোলনও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু রাজত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।'* মুজফফর আহমদ আরও বলেছেন– সন্ত্রাসবাদীরা জেলে গিয়ে তাদের কারাকক্ষে টাঙাতেন মা কালীর ছবি। তারা মনে করতেন, মা কালী হল শক্তি প্রদায়ী দেবী। মা কালী প্রদান করবেন তাদের বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে শক্তি। আজকাল আমাদের দেশে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নিয়ে বই লেখা হচ্ছে। কিন্তু উল্লেখ করা হচ্ছে না যে, সন্ত্রাসবাদীরা বৃটিশ শাসন মুক্ত করে চেয়েছিলেন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। চাকমারা পরিচালিত হচ্ছেন আসলে হিন্দু জাতীয়তাবাদ দ্বারা। তাদেরও লক্ষ হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে হিন্দুরাজ্য স্থাপন। চাকমাদের মদদ যোগাচ্ছে ভারত। ভারত কাজে লাগাতে চাচ্ছে, চাকমাদের হিন্দুত্ববাদী মনোভাবকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে এক সময় কোন জেলা (মহাল) ছিল না। ১৭৬০ সালে বাংলার নবাব মীর কাসেম চট্টগ্রামের অধিকার ছেড়ে দিতে বাধ্য হন ইস্টইন্ডিয়া কম্পানীকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করা হয় এর একশত বছর পরে ১৮৬০ সালে। যতগুলো কারণে এই জেলা গঠন করা হয়, তার মধ্যে একটি কারণ ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচারের সুযোগ করে দেয়া। কিন্তুপার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদেও মধ্যে খৃস্টধর্ম সেভাবে প্রচারিত হতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামের দুটি প্রধান উপজাতি চাকমা ও মারমারা গ্রহণ করতে চাননি এবং এখনও চাচ্ছেন না খৃস্টান ধর্ম। খৃস্টন ধর্ম গ্রহণ করেছেন পাংখা, বনযোগী ও বমের মত খুব ক্ষুদ্র

www.pathagar.com

উপজাতি। তারা গ্রহণ করেছেন ব্যাপটিস্ট খৃস্টধর্ম। ভারতের মিজোরাম প্রদেশ বৃটিশ আমলে ছিল সাবেক আসাম প্রদেশের একটি জেলা। জেলাটির নাম ছিল লুসাই। লুসাই জেলার অধিবাসী লুসাইরা সকলে বৃটিশ শাসন আমলে গ্রহণ করেন ব্যাপটিস্ট খৃস্টধর্ম। লুসাইরা নিজেদের নাম পরিচয় দিতে শুরু করেন মিজো হিসাবে। ১৯৬০ এর দশকে মিজোরা আরম্ভ করেন তাদের স্বাধীনতা আন্দোলন। ভারত সরকার লুসাই জেলাকে সাবেক আসাম থেকে পৃথক করে গঠন করে মিজোরাম প্রদেশে। এর লক্ষ ছিল মিজোদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে শান্ত করা। কিন্তু মিজোদের স্বাধীনতা আন্দোলন চলতেই থাকে। মিজোরাম লিবারেশন আর্মি সদস্যরা মিজোরাম থেকে এসে আশ্রয় নিতে থাকে রাঙামাটির গহীন বনে। পাকিস্তান সরকার মিজোদের প্রদান করে সামরিক প্রশিক্ষণ। মিজোরা রাঙামাটি থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে যেতে থাকেন মিজোরামে। ১৯৭১ সালে প্রায় ২০০০ মিজো সৈন্য ছিল রাঙামাটিতে। তারা পাকিস্তান সৈন্যের অংশ হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেন। ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির পর পাক বাহিনীর অন্য সেনাদের সাথে ভারত থেকে মুক্তি পেয়ে তারা চলে যান করাচিতে। ভারত এখন চাকমাদের মদদ দিচ্ছে। তারা প্রধানত দুটি কারণে মদদ দিচ্ছে। যার একটি কারণ হল– চাকমা নেতৃত্বে যদি পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে তার সাহায্যে ভারত পারবে বাংলাদেশের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করতে। চাকমা রাষ্ট্র কার্যত হতে থাকবে ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত। ভারতের প্রভাব বলয়ের বাইরে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না। অন্য আর একটি কারণ হল, চাকমা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পেলে ভারতের পক্ষে সম্ভব হবে মিজো প্রদেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। মিজোরা আর কখনই করতে পারবে না স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পাওে যে, কিছু সংখ্যক লুসাই এখনও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলেও বাস করেন। এইসব লুসাইদের পূর্বপুরুষ বৃটিশ শাসনামলে গ্রহণ করেন ব্যাপটিস্ট খৃস্টান ধর্ম। কিন্তু এরা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংখ্যায় হলেন খুবই সামান্য।

পত্রিকার খবরে দেখলাম আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলছেন (নয়া দিগন্ত; ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১২)– পাহাড়িরাই কেবল হবেন পার্বত্য চট্টগ্রামের জমির মালিক। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব হবে? কারণ, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল একটি খুবই জনবিরল অঞ্চল। পাকিস্তান ও পরে বাংলাদেশ আমলে বহু বাংলাভাষী মুসলমান যেয়ে বাড়িঘর গড়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। করেছেন ফসলের আবাদ। তাদের কি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ছেড়ে চলে আসতে হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমিতে কি থাকবে না তাদের কোন অধিকার? এক দেশে দু রকম আইন কীভাবে হতে পারবে? একজন চাকমা জমি কিনে ঢাকায় বাড়ি করতে পারবেন, কিন্তু একজন ঢাকাবাসী রাঙামাটিতে কিংবা পার্বত্য চট্টগ্রামের আর কোন জায়গায় গিয়ে জমি কিনে বাড়ি করতে পারবেন না! এ

www.pathagar.com

ধরণের আইন কি বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী হবে না ? পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যা করতে চাচ্ছে, তার ফলে সৃষ্টি হতে পারে ভয়ংকর এক সংঘাতময় পরিস্থিতির। প্রথম কথা, বাংলাভাষী মুসলমান কখনই ছাড়তে চাইবেন না পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমির ওপর তাদের অধিকার। দ্বিতীয়ত, পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যতম উপজাতি মারমারা কখনই চাইবেন না পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি হয়ে উঠবে ভায়াবহ সংঘাতময়। বৃটিশ আমল থেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা ও চাকমাদের মধ্যে শুরু হতে পেরেছে মনোমালিন্য। ১৯৪৭ সালে চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্তি চেয়েছিলেন ভারতে। রাঙামাটিতে চাকমারা উড়িয়েছিলেন কংগ্রেসের পতাকা। অন্যদিকে মারমারা বন্দরবনে উড়িয়েছিলেন বর্মার দোবামা পার্টির পতাকা। মারমারা চেয়েছিলেন বন্দরবন এলাকাকে বর্মার (মিয়ানমারের) সাথে যুক্ত করতে। চাকমা নেতারা দাবি তুলেছেন- পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী রাখা চলবে না। তাদের এই দাবি মানলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। কার্যত হয়ে যাবে স্বাধীন। পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বাধীন হলে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের ভবিষ্যত হয়ে পড়বে অনিশ্চিত। লুসাই পাহাড় থেকে উদ্ভূত হয়ে কর্ণফূলী নদী পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছে চট্টগ্রামে এবং পড়েছে সমুদ্রে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ভারতের চাপে পড়ে করছেন চাকমাদের তোয়াজ। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বার্থ হতে যাচ্ছে বিশেষভাবে বিপন্ন। ১৯৭৩ সালে ১৩ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান রাঙামাটির এক জনসভায় বলেছিলেন– বাংলাদেশের সব অধিবাসী বাঙালী হিসাবেই বিবেচিত হবে। মনে হচ্ছে বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার সরে আসতে চাচ্ছে এই নীতি থেকে।

বাংলাদেশের উপজাতি সমস্যা নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি প্রবন্ধে।। কারণ আওয়ামী লীগের উপজাতি নীতি দেশকে ঠেলে দিতে পারে মারাত্মক সংকটেরই মধ্যে। আর বাংলাদেশকে দিতে পারে একাধিক ভাগে বিভক্ত করে। বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল জোর করে দখল করেনি। ১৯৪৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম তদানীন্তন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয় র‍্যাডক্লিক রোয়েদারের মাধ্যমে। কিন্তু এখন ইতিহাস এমন করে লেখা হচ্ছে, যেন পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশ গায়ের জোরে জয় করে সেখানে আধিপত্য করছে। সারা বিশ্বে চলেছে ভারতের পক্ষ থেকে সুকৌশলে নানা প্রচারণা। কিন্তু বিশেষ দুঃখজনক হলেও বাংলাদেশের এমন কিছু বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক আছেন যাদের বক্তব্য হয়ে উঠতে চাচ্ছে ভারতের বক্তব্যের সম্পূরক। তাই সংবাদপত্রের পাতায় আমাদের মত দু একজনকে লিখতে হচ্ছে বাস্তব পরিস্থিতি বুঝাবার জন্যে দীর্ঘ প্রবন্ধ। এর আগে আমি সাঁওতালদের নিয়ে লিখেছি একটি বড় প্রবন্ধ। অনেকে

www.pathagar.com

সাঁওতালদের নিয়ে অনেক কিছু লিখছেন। যাদের লেখা পড়ে মনে হতে পারে, সাঁওতালরা বাংলাদেশের মুসলমানের হাতে হচ্ছেন নিগ্রীহিত। কিন্তু বাস্তবে কি সেটা সত্য? সাঁওতালরা মুসলমানদের বলেন– 'তুড়ুক'। অর্থাৎ তুর্কী। কিন্তু ইতিহাস বলে, তুর্কীরা তাদের ঘরছাড়া করেননি। তারা ঘরছাড়া হয়েছেন বৃটিশ শাসনামলে। বৃটিশ শাসনামলেই ঘটেছে বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহ। মুসলিম নৃপতিদের শাসনামলে নয়। সাঁওতালরা বাঙ্গালি হিন্দুকে বলেন 'দেখু'। বিখ্যাত সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় অনেক দেখু খুন হন সাঁওতাল বিদ্রোহীদের হাতে। প্রধানত দেখুদের বাঁচাবার জন্যে ১৮৫৫ সালের ১০ নভেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সরকার জারি করতে বাধ্য হয় মার্শাল ল। মার্শাল ল জারি করতে হয়েছিল বিহারের ভাগলপুর জেলায়, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং বীরভুম জেলায়। সাঁওতালরা এই বিস্তির্ণ অঞ্চল জুড়ে আওয়াজ তুলেছিল, 'হুল হুল'। অর্থাৎ বিদ্রোহ বিদ্রোহ। দেখু মহাজনদের সাঁওতালরা খুন করেছেন নির্বিচারে। সাঁওতাল বিদ্রোহীরা লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করেছেন নিরাপরাধ দেখুদের দোকানপাট ও বাড়ি-ঘরেও। এখন সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী লেখা হচ্ছে খুবই একপেশে ভাবে। কিন্তু ঘটনাটি তা ছিল না। আমার মতে উপজাতিদের কথা ভাবতে হবে জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। জাতীয় স্বার্থকে খাটো করে উপজাতীয় স্বার্থকে কোনভাবেই প্রাধান্য প্রদান করা যেতে পারে না। কারণ, উপজাতি জাতি নয়, জাতির একটা ক্ষুদ্র জনসমষ্টি মাত্র। যারা একটি জাতির অংশ হয়ে পড়েছে ইতিহাসের ধারায়।

***

www.pathagar.com

মহেশখালী দ্বীপের আয়তন বাড়ছে

১৯৪০ সলে বৃটিশ শাসনামলে তখনকার পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে কর্তৃক বাংলা ভাষায় একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, যার নাম ছিল 'বাংলায় রেলভ্রমণ'। বইটির লক্ষ ছিল তখনকার বাংলায় রেলভ্রমণ বাড়ানো। কিন্তু বইটি পড়ে আমার কাছে অদ্ভুদ মনে হয়েছে, কারণ এতে আছে তখনকার বাংলা প্রদেশের ভূগোল ও ইতিহাসের এমনসব উপকরণ যা এখনো আমাদের এ অঞ্চলের ভূগোল ও ইতিহাসকে বুঝতে নানাভাবেই সাহায্য করে। বইটি আমাকে আমাদের দেশ সম্পর্কে জানতে নানাভাবে সাহায্য করেছে। আমার কাছে মনে হয়েছে বইটি খুবই মূল্যবান। এরকম বই বাংলাভাষায় আর লিখিত হয়নি। আমরা যদি এখন বর্তমান বাংলাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এরকম কোন বই লিখতে পারতাম, তবে তা এদেশের মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির এবং দেশকে চিনবার বিশেষ সহায়ক হতে পারত। মানুষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চিন্তা করে। তাই দেশ সম্পর্কে ভাবতে গেলে দেশ সম্পর্কে নানা তথ্য জানতে হয়। আর সেগুলি একত্রে পেলে আমাদের তথ্য সংগ্রহের জন্যে শ্রম করতে হয় কম। এই বইটিতে মহেশখালী বা মহিষখালী দ্বীপ সম্পর্কে লেখা হয়েছে – চট্টগ্রাম থেকে স্টিমার যোগে দ্বীপটিতে যেতে হয়। এই দ্বীপে হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্থ আদিনাথ অবস্থিত। আদিনাথ হল শিবের মন্দির। এই দ্বীপের মৈনাক নামক পাহাড় বা টিলার উপর আদিনাথ তীর্থ অবস্থিত। মৈনাক পাহাড়ে সমতল ভূমি থেকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। এই সিঁড়িতে ধাপের সংখ্যা হল ৬৯ টি। চট্টগ্রাম থেকে যেতে হয় মহেশখালী। চট্টগ্রাম পর্যন্ত যাওয়া যায় রেলওয়ের মাধ্যমে। সেখান থেকে মহেশখালী দ্বীপের দুরত্ব হল ৭৫ মাইল। স্টিমারে করে সেখানে যেতে ৭/৮ ঘণ্ট সময় লাগে। চট্টগ্রাম থেকে কর্ণফুলী নদী দিয়ে যেতে হয় বঙ্গোপসাগরে। তার পরে বামদিকে ঘুরে যেতে হয় মহেশখালি দ্বীপে। মহেশখালী দ্বীপ মহেশখালী নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত। বইটিতে আরও বলা হয়েছে– মহেশখালী দ্বীপে বহু মগ বাস করেন। অষ্টদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রহ্ম ও আরাকান রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মরাজের (নিম্ন ব্রাহ্ম) সৈন্যরা ছিল ভয়ংকর অত্যাচারি। আরাকানে (বর্তমান রাখাইন প্রে) মগরা এই অত্যাচারে ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে আসতে থাকেন তখনকার চট্টগ্রাম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে। গড়ে তোলেন মগ উপনিবেশ। যেসব স্থানে তারা উপনিবিষ্ট হন, তাদের মধ্যে একটি ছিল মহেশখালি দ্বীপ। মহেশখালি দ্বীপে প্রচুর মগ বাস করেন। এরা সবাই হলেন আরাকান থেকে আগত মগদের সন্তানাদি। মহেশখালি দ্বীপে আদিনাথের শিব মন্দীর থেকে কিছু দূরে মগদের একটি সুন্দর বৌদ্ধ মন্দির আছে। মগরা এই মন্দীরে পূজা করেন গৌতমবুদ্ধের মূর্তির। মগরা সকলেই বৌদ্ধ। এই বৌদ্ধ মন্দির থেকে আধা মাইল দূরে আছে মগদের একটি বিশেষ ধর্মধাম। যাকে বলা হয় চেরাং ঘর। চেরাং ঘরে তিন চারটি বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত। এতে আছে শ্বেতপাথর ও পিতলের সুন্দর বুদ্ধমূর্তি। মগরা

www.pathagar.com

তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলেন। তবে তারা এখন বাংলা ভাষাও যথেষ্ট ভাল জানেন। এ হল ১৯৪০ সালের দেয়া মহেশখালি দ্বীপের কিছু বিবরণ।

এরপরে ইতিহাসে অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু সাবেক পাকিস্তান আমলে এবং তার পরে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে এদেশের মূল জনসমাজের সঙ্গে মগদের কোন বিবাদ দেখা দেয়নি। মহেশখালীর বাংলাভাষী মুসলমানরা মগদের থেকে পৃথকভাবে চললেও হিন্দু সমাজ মগদের যেমন ম্লেচ্ছ ভাবে, মুসলমানরা তা ভাবেন না। যদিও মগদের থেকে তারা সামাজিক দুরত্ব বজাই রেখেই চলেন। কিন্তু তারা তাদের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন না। মগরা এদেশে তাদের নিজেদের ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ, অর্থাৎ পড়তে লিখতে ও গুণতে শিখতে পারেন। তাতে কোন বাধা নেই। তারা এই ভাষা লিখে থাকেন বর্মী (ম্রনমা) অক্ষরে। যার উদ্ভব ঘটেছে এক সময়ের প্রাচীন পালি অক্ষর থেকে। যা দেখতে গোল গোল। মগদের ভাষাকে ভাষা তাত্ত্বিকরা স্থাপন করেন বৃহৎ চীনা ভাষা পরিবারে। কিন্তু এই বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে প্রাচীন পালি বর্ণমালা থেকে। যা লেখা হয় বাংলার মত বাম দিক থেকে। অক্ষরগুলির উচ্চারণ কতকটা বাংলা অক্ষরের মত। মগরা তাদের ভাষাকে বলেন বৌদ্ধভাষা।

মহেশখালি দ্বীপ নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে আমার মনে মগদের কথা বিশেষভাবে আসছে। এর কারণ, বর্তমান আরাকানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। আরাকানের মগদের সাথে চলছে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বিবাদ। কিন্তু বাংলাদেশের মগরা বাংলাদেশের নাগরিক। তারা এই বিবাদ সৃষ্টির জন্য মোটেও দায়ী নন। তবে ব্রহ্মদেশের (মিয়ানমার) সরকারের জানা প্রয়োজন, সম্ভবত তারা সেটা জানেন যে, বাংলাদেশ ও আরাকানের মধ্যে দুদিক থেকেই ঘটেছে জন-চলাচল। বাংলাদেশ থেকে অতীতে মানুষ যেমন আরাকানে গিয়েছে তেমনি আবার আরাকান থেকে মানুষ (মগ) এসে উপনিবিষ্ট হয়েছে বাংলাদেশে। এর ফলে সে আমলে কোন সংঘাত সৃষ্টি হয়নি। আমাদের দেশের কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি, যাদের কেউ কেউ আবার বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংশিষ্ট, তারা বাংলাদেশে উপনিবিষ্ট মগদের বলছেন আদিবাসী (Aborigine)। জানি না মগদের ক্ষেত্রে আদিবাসী শব্দটি কীভাবে ব্যবহার করা যায়। কারণ, মগরা যে এদেশে বিদেশ থেকে আগত সেটা সাধারণ ইতিহাসের ঘটনা। যে কোন ইতিহাস বই থেকে এর বিবরণ পাওয়া যায়। নিম্নব্রহ্মের রাজা, বোদবপয়া ১৭৮৫ খৃস্টাব্দে আরাকান অধিকার করেন। আর আরাকান থেকে মগরা এ সময় দলে দলে পালিয়ে আসতে থাকেন তখনকার বাংলাদেশে। এদেরকে তাই ঐতিহাসিকভাবে এখানকার আদিবাসি আদৌ বলা চলে না। তাছাড়া এই মগরা কখনই অনুসরণ করতেন না আদিম সংস্কৃতি। তারা জানতেন চাষাবাদ করতে। জানতেন সুন্দর করে কাপড় বুনতে। আরাকানে ছিলেন রাজা। তারা ছিলেন রাজতন্ত্রের অধিনে। রাজার ছিল রাজধানী। যা ছিল উন্নত শহর। মগদের তাই বলা চলে না কোন আদিম জনসমষ্টি। অন্তত কক্সবাজার জেলার মগদের বলা যেতে পারে না বন্য ও অনগ্রসর। কক্সবাজারে মগরা গড়ে তোলে সামুদ্রিক মাছের বিরাট ব্যবসা। তাদের তৈরি লুঙ্গি পায় বিশেষ খ্যাতি। তাদের তৈরি চুরুট এক সময় হয়েছে

www.pathagar.com

বিশেষভাবে বিক্রি। আমরা মগদের সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখি না। তাই তাদের বলছি আদিবাসী। অবশ্য যেসব পণ্ডিতরা তাদের আদিবাসী বলছেন, তারা যথেষ্ট পাণ্ডিত্ব সম্পন্ন। কিন্তু তথাপি তারা কেন এদের আদিবাসী বলছেন, আমি তা জানি না। আমার আদিবাসীর ধারণা এদের আদিবাসীর ধারণার সঙ্গে মিলতে চায় না। যে অর্থে অস্ট্রেলিয়ার কালো মানুষ, সেই মহাদেশের আদিম নিবাসী, মগরা মোটেও সেরকম আদিবাসী নন। নৃ-তত্ত্বের পরিভাষায় তাই এদের আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, এরা হলেন অনেক উন্নত স্তরের সভ্যতার অধিকারী।

পত্রিকার খবরে পড়লাম (নায়া দিগন্ত; ৩ জুলাই- ২০১২) মহেশখালী দ্বীপের ক্ষেত্রফল বাড়ছে। কারণ, দ্বীপটির চারধারে জমছে নদী বাহিত মৃত্তিকা। পড়ছে চর। ভরাট হচ্ছে চারপাশের সমুদ্র। ২০০ বছর আগে, মহেশখালী দ্বীপের ক্ষেত্রফল ছিল ১৮৮ বর্গ কিলোমিটারের কাছাকাছি। সেখানে এখন তার আয়তন হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩৮৮ বর্গ কিলোমিটার। দ্বীপটির আয়তন বাড়ছে। কিছুদিন পরে এই দ্বীপটি জুড়ে যাবে কক্সবাজার জেলার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে। এরকম জুড়ে যাওয়া মোটেও অস্বাভাবিক হবে না। খবরটি পড়ে আমি তাই বিস্মিত হইনি। ২০০ বছর আগে কক্সবাজার জেলার কাছে ছিল শাহরপুরী নামে একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটি এখন যুক্ত হয়ে গেছে কক্সবাজারের সঙ্গে। এখন কক্সবাজার থেকে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় এক সময়ের শাহরপুরী দ্বীপে। মহেশখালী দ্বীপের আয়তন বৃদ্ধির খবর আমার ভাল লাগলো। কারণ, আমার দেশের কিছু পরিবেশ বিজ্ঞানী বলছেন, বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়ছে। যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রার পরিমাণ। এভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলে বাড়বে সমুদ্রের পানির পরিমাণ। বঙ্গোপসাগরের পানির পরিমাণ বাড়লে বাংলাদেশের অনেক জায়গা ডুবে যাবে সমুদ্রের পানিতে। কিন্তু বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে নদী বাহিত পলি মৃত্তিকার কারণে চর পড়ছে। ভরাট হচ্ছে সমুদ্র। যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বাংলাদেশের জমির পরিমাণ। এদিক থেকে দেখলে বলতে হবে সমুদ্রের পানি বাড়বার কারণে বাংলাদেশ ডুবে যাবে না; যেমন অনুমান করেছেন আমাদের কিছু পরিবেশ বিজ্ঞানী। অনেক পরিবেশ বিজ্ঞানী বলছেন সমুদ্রের পানি বাড়বার ফলে ভবিষ্যতে ডুবে যাবে মালদ্বীপের মত দ্বীপপুঞ্জ। এটা হতে পারে। কারণ, মালদ্বীপের দ্বীপগুলো হল প্রবাল দ্বীপ। এর চারধারে জমছেনা পলিমাটি। প্রবাল দ্বীপগুলো গড়ে ওঠে প্রবাল পোকার দেহ নিঃসৃত ক্যালসিয়াম কার্বোনেট থেকে।(প্রবাল পোকা আসলে পোকা নয়। যদিও সাধারণ বাংলায় একে বলে পোকা। প্রবাল, হল সিলেন্টারোটা পর্বভূক্ত প্রাণী।) বাংলাদেশের সেন্টমার্টিন দ্বীপকে সাধারণত উল্লেখ করা হয় প্রবাল দ্বীপ হিসাবে। কিন্তু এই দ্বীপের মাটির মধ্যে যে পাথর পাওয়া যায়, তা নিকটবর্তী ভূ-ভাগের পাথরেরই মত। তাই মনে হয় সেন্টমার্টিন দ্বীপ এক সময় ছিল তার কাছের ভূ-ভাগের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু পরে তা কোন কারণে ধীরে ধীরে বিযুক্ত হয়ে পড়েছে। প্রবাল দেহ নিঃসৃত চুনা পাথর জমছে সেন্টমার্টিন দ্বীপে। কিন্তু তা বলে দ্বীপটি গঠিত হয়নি কেবলই প্রবাল দেহবাশেষ জমে জমে। যেমনভাবে সৃষ্টি হতে পেরেছে মালদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জের দ্বীপসমুহ।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকার বিশ্বের কাছে অনুদান চাচ্ছে বাংলাদেশকে সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাবার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু এই অনুদান সে কতটা পেতে পারবে সেটা হয়ে উঠেছে প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ, বিশ্ব এখন ভাবতে শুরু করেছে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে খুবই দুর্নীতি যুক্ত দেশ। তাকে আর্থিক সাহায্য প্রদান করলে তাই হবে না তার যথাযথ প্রয়োগ। বিশ্বব্যাংক পদ্মাসেতু নির্মাণে ঋণদান বন্ধ করায়, আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিশেষভাবে বিবর্ণ হল। সুনাম অর্জন করা কঠিন। দুর্নাম কাটিয়ে ওঠা সে তুলনায় আরো কঠিন। পরিবেশ সংরক্ষণের নামে তাই বিদেশী অনুদান লাভ বাংলাদেশের জন্যে সহজ হবে না। বাংলাদেশকে তার সমস্যার সমাধান করতে হবে নিজের সামর্থের ওপর নির্ভর করে।

বিজ্ঞানের ধারণা বদলে গেছে। আমার ছাত্র জীবনে অর্থাৎ প্রায় ৬০ বছর আগে, পড়ানো হত, বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়া হবে আমাদের জন্যে উত্তম। কেননা, এতে বাড়বে সবুজ উদ্ভিদে সালোকসংশ্লেষণের মাত্রা। আর এর ফলে বৃদ্ধি পেতে পরবে ফসলের উৎপাদনের হার। বলা হত, দেশে কলকারখানা বাড়লে বাতাসে বাড়বে কার্বনডাই অক্সাইড। যা সাধারণভাবে সহায়ক হবে ফসল বৃদ্ধিতে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইড বাড়লে বাড়বে ধরিত্রীর উষ্ণতা। যার ফলে পৃথিবীর দুই মেরুর বরফ গলবে। বরফ গলার ফলে বাড়বে সমুদ্রের পানি। আর তাই পানিমগ্ন হবে পৃথিবীর অনেক দেশের ভূমি। যেসব দেশ পানিমগ্ন হবে, তার মধ্যে একটি হল বাংলাদেশ। কিন্তু আমরা দেখছি বাংলাদেশে জমি বাড়তে পারছে নদী বাহিত পলিমাটির জন্যে। এছাড়া পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে, অনেক জায়গায় ফসলের আবাদ করা যেতে পারবে; যেখানে এখন যাচ্ছে না আবাদ করা। সাইবেরিয়া ও কানাডার অনেক জায়গায় ফসল উৎপাদন করা যায় না। কারণ এসব জায়গা থাকে বরফে ঢাকা। কিন্তু তাপমাত্রা বাড়বার ফলে এসব জায়গায় বরফ থাকবে না। ফলে এসব জায়গায় চাষাবাদ করা সম্ভব হবে। গড়ে ওঠা সম্ভব হবে জনপদ। অবশ্য অন্যদেশ থেকে এসব জায়গায় মানুষ যেয়ে উপনিবিষ্ট হতে পারবে কিনা, সেটা নিয়ে থাকছে রাজনৈতিক প্রশ্ন। কারণ, পৃথিবীর সবরাষ্ট্র মিলে একটা বিশ্ব সরকার গড়ে ওঠার কোন সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এরকম কিছু হতে আরো সময় নেবে। মানুষের সমস্যা যত না প্রাকৃতিক তার চাইতে অনেক বড় হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক। মানুষই মানুষের জন্যে হয়ে উঠেছে চরম সমস্যার কারণ।

বৃটিশ শাসনামলে, ১৯৩১ সালের লোকগণনার বিবরণে, একজন বৃটিশ বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করেছিলেন, বাংলাদেশের জনসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু এই নিয়ে খুব ভীত হবার কারণ নেই। বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে পড়ছে চর। এইসব চর অঞ্চলে মানুষ যেয়ে গড়ে তুলছে জনপদ। করছে চাষাবাদ। বাংলাদেশের জনবৃদ্ধিকে অনেকেই যতটা ভীতপ্রদ মনে করছেন, তাকে তাই অতটা ভীতিকর মনে করবার কিছু নেই। তাঁর এই মন্তব্য মনে হয়, এখনও একেবারে অবান্তর হয়ে যায়নি। যা মহেশখালী দ্বীপের আয়তন বৃদ্ধি থেকে আমরা নতুন করে প্রমাণ পেতে পারছি। ***

www.pathagar.com

জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

কক্সবাজার জেলায় ঠিক কী ঘটেছে তা এখনো আমরা বিস্তারিতভাবে জানতে পারিনি। কেবল জেনেছি কিছু বৌদ্ধ মূর্তি ভাঙবার কথা। জেনেছি কিছু বৌদ্ধদের বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ ও লুটপাট করবার কথা। যা ঐ অঞ্চলে ইতোপূর্বে কখনো ঘটেনি। প্রমাণ করবার চেষ্টা চলেছে, এসবই হচ্ছে মুসলিম মৌলবাদীদের কার্যকলাপের ফল। আমাদের দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষকরা কক্সবাজারের ঘটনার প্রতিবাদে পালন করছেন মানব বন্ধন। অনেকে চাচ্ছেন, এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক তদন্ত। কিন্তু এরা ভুলে যাচ্ছেন যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। এর আছে নিজস্ব আইন ও আদালত। এখানে আন্তর্জাতিক তদন্তের একটা অর্থ দাঁড়ায়, বিশ্বের কাছে নিজেদের দেশের ভাবমূর্তি বিবর্ণ করে তোলা। এমন কি নিজেদের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে করে তোলা প্রশ্নের সম্মুখীন। রামুতে যাই-ই ঘটুক, সেটা বাংলাদেশের ঘরোয়া ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে বাইরের হস্তক্ষেপ কোনভাবেই কাম্য হতে পারে না। খবরে প্রকাশ, ওআইসি চেয়েছিল আরাকানে তাদের দপ্তর খুলতে। কিন্তু মিয়ানমার সরকার তাদের আবেদন প্রত্যাখান করেছে। মিয়ানমার সরকার এক্ষেত্রে প্রদর্শন করেনি কোন আন্তর্জাতিক উদারতা। মিয়ানমারের বক্তব্য হল, তাদের দেশের মানুষ আরাকানে ওআইসি'র কোন দপ্তর খুলতে দিতে ইচ্ছুক নয়। মিয়ানমার সরকার তাই আরাকানে ওআইসি'র দপ্তর খুলতে দিতে পারছে না। অর্থাৎ মিয়ানমার আমাদের মত দেখাতে চাচ্ছে না কোন ঔদার্য। ওআইসি আরাকানে দপ্তর খুলতে চেয়েছিল আরাকানের মুসলমানদের আর্থিক সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু মিয়ানমার সরকার সেটা গ্রহণযোগ্য বলে ভাবতে পারল না। আমাদের দেশের কোন কথিত বুদ্ধিজীবী অথবা সংস্থা এখনো মিয়ানমার সরকারের এই সিদ্ধান্তকে বলছেন না সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। কিন্তু এরা রামুর ঘটনা সম্পর্কে চাচ্ছেন, আন্তর্জাতিক তদন্ত। মিয়ানমারের যতটুকু আত্মস্বাতন্ত্রবোধ আছে, মনে হচ্ছে বাংলাদেশের কথিত বুদ্ধিজীবীদের তা আদৌ নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতার কথা আমরা যথেষ্ট শুনছি। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা কখনই একতড়ফা ব্যাপার হতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষ হতে হলে সব পক্ষকেই হতে হবে সমভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে কি তা হতে পারছে? রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। মানুষকে নিয়েই রাষ্ট্র। মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ না হলে রাষ্ট্র কখনো ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত যার বিশেষ দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমানের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা করছেন রাজনীতি। দেশটা চলেছে সেনা ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়ন্ত্রণে। তাই ওআইসি মানবিক সাহায্য দেবার জন্যে দপ্তর খুলতে চেয়ে

www.pathagar.com

তা খুলবার অনুমতি পেতে পারল না আরাকানে। এর মধ্যে প্রতিফলন ঘটেছে মিয়ানমারের বৌদ্ধ সংকীর্ণতাবাদী মনোভাবেরই। কিন্তু আমরা একে সমালোচনা করছি না বৌদ্ধ মৌলবাদ হিসাবে। আমরা মিয়েনমারের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বলছি না বৌদ্ধ মৌলবাদী। অথচ রামুতে যা ঘটেছে, তাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি মুসলিম মৌলবাদের অভিব্যাপ্তি হিসাবে। আমাদের এই মনোভাব কতটা যুক্তিযুক্ত সেটা নিয়ে তাই উঠছে প্রশ্ন। মনে হচ্ছে বাংলাদেশে হতে পারছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বাড়াবাড়ি। যা হয়ে উঠতে পারে আমাদের জাতীয় স্বার্থের অন্তরায়। বাদ পড়তে পারে রাজনীতিতে আমাদের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া। কিন্তু আমরা মনে করি, এটা হবে আত্মঘাতি। আমাদের রাজনীতিতে জাতীয় স্বার্থকে দিতে হবে অগ্রাধিকার। আমাদের করতে হবে জাতি গঠনের রাজনীতি। এই জন্যেই আমরা চেয়েছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা। কিন্তু আজ এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা যেন হতে চাচ্ছি বিচ্যুত।

বাংলাদেশে বৌদ্ধদের ওপর কোন অবিচার হোক সেটা আমাদের কাম্য নয়। কিন্তু বৌদ্ধরা যদি চান, একটা পৃথক রাষ্ট্র গড়তে, আমরা সেটা হতে দিতে পারি না। আমরা বাংলাদেশের বৌদ্ধদের মেনে নিতে পারি না একটা পৃথক জাতি হিসাবে। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা, বাংলাদেশেরই নাগরিক। তাদের থাকতে হবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য। কিন্তু এদেশের বৌদ্ধরা যেন হয়ে উঠেছেন বিশেষভাবে মিয়ানমারের প্রতি আনুগত্যশীল। এদেশের কোন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আরাকানে যা ঘটেছে তার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেনি; অথচ উচিত ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে দুঃখ প্রকাশের। বর্তমানে রামুতে যা ঘটলো সেটাকে আরাকনে যা ঘটছে, তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। কারণ, এখানকার মগ বৌদ্ধরা নিজেদের দাবি করছেন রাখাইন হিসাবে, বাংলাদেশী হিসাবে নয়। তাই তাদের এই মনোভাব বাংলাদেশের বৃহত্তর জনসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেই পারে না। এদিক থেকে দেখলে বলতে হয়, রামুতে যা ঘটেছে সেটা আরাকানের ঘটনাবলীর বিশেষ প্রতিক্রিয়া। আরাকান শান্ত থাকলে শান্ত থাকত কক্সবাজার জেলা। কক্সবাজার জেলায় বাস করেন অনেক মগ। যাদের পূর্ব পুরুষ এসেছিলেন আরাকান থেকে। কেবল বৌদ্ধ বলে যে তাদের সাথে এদেশের বৃহত্তর জনসমাজের বিরোধ সৃষ্টি হতে পারছে তা নয়। এই বিরোধের মূলে কাজ করছে অতীত ইতিহাস। সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট অবগত নই। মগদের সম্পর্কে ইংরেজ আমলে কিছু গবেষণা হয়েছিল। কিন্তু তারপর এবিষয় নিয়ে গবেষণা বিশেষ কিছু হয়নি। বৃটিশ নৃ-তাত্ত্বিক হার্বাট রিজলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগদের তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। এক ভাগকে তিনি বলেছেন, জুমিয়া মগ। যারা জুমচাষ করে খান। এরা আরাকান থেকে এসেছিলেন অন্য আর সব মগ বলে পরিচিতদের আগে। এদের পরে যেসব মগ আরাকান থেকে এসেছেন, তারা মারমাগিরি, রাজবংশী, বড়ুয়া অথবা ভুঁইয়া মগ বলে পরিচিত। এরা জুমচাষী নন। এরা ব্যবসা

www.pathagar.com

করে অথবা সাধারণভাবে জমি চষে জীবিকা নির্বাহ করেন। পাচক হিসাবে এরা যথেষ্ট খ্যাতিমান। এরা ইংরেজ রাজকর্মচারীদের বাড়িতে যথেষ্ট উচ্চ বেতনে পাচকের কাজ করতেন। রিজলে আর এক রকম মগকে বলেছেন মারমা মগ। যারা ব্যবসা বাণিজ্য করেন এবং জীবনযাত্রার দিক থেকে অনেক অগ্রসর। রিজলে এই তিন শ্রেণীর মগকে বলেছেন, আরাকান থেকে আগত। এদের ভাষা আরাকানী ভাষার হেরফের মাত্র। আরাকানী ভাষা আবার হল প্রাচীন বর্মী (ম্রনমা) ভাষার প্রকার মাত্র। বর্মীভাষার সঙ্গে আরাকানী ভাষার পার্থক্য ব্যকরণগত নয়, পার্থক্য হল মূলত উচ্চারণগত। রিজলে এসব কথা বলেছেন, তাঁর বিখ্যাত Tribes and Castes of Bengal নামক বইতে। বইটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। মগদের সম্পর্কে আলোচনা আছে বইটির প্রথম খণ্ডে। রিজলের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫১ সালে তদানীন্তন বৃটিশ বাংলা সরকারের পক্ষ থেকে। রিজলে তাঁর এই বইতে বলেছেন, বড়ুয়া মগরা দাবি করেন যে, তাদের পূর্ব পুরুষ চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছিলেন, বিহারের মগধ অঞ্চল থেকে। তাই তাদের বলা হয় মগ। তারা আরাকানী মগদের থেকে হলেন ভিন্ন। কিন্তু রিজলে বড়ুয়া মগদের এই দাবির সমালোচনা করেছেন। কারণ বড়ুয়া মগরা চেহারার দিক থেকে হলেন, অন্য মগদের মত মঙ্গলীয় মানবশাখাভুক্ত। রিজলের কথার সাথে আমরাও এক মত। আমরা এরসাথে আরও যোগ করতে পারি যে, বড়ুয়া মগরা থেরাবাদী বা হীনযান বৌদ্ধ। তাদের বৌদ্ধধর্ম আর মিয়ানমারের বৌদ্ধধর্ম হল অবিকল এক। কিন্তু বিহারের মগধে প্রচলিত ছিল মহাযান বৌদ্ধধর্ম। বড়ুয়া বা অন্য মগরা কেউ-ই মহাযান বৌদ্ধধর্মের অনুসারী নন। বর্তমানে বড়ুয় মগরা নিচ্ছেন ইসলাম বিরোধী প্রচারে বিশেষ অংশ। তাই বড়ুয়া মগদের সম্পর্কে দেখা দিয়েছে জানবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। বড়ুয়া মগদের মন মানসকিতা নিয়ে হওয়া উচিত বিশেষ সমীক্ষা। কিন্তু সেটা করা হচ্ছে না। যে বড়ুয়া মগ যুবকের কারণে রামুতে মুসলিম মানস ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, তাকে এখনো ধরা যায়নি। অথচ একাধিক মুসলিম যুবককে ধরা হয়েছে রামুর ঘটনার জন্য। এধরণের একতরফা ধরপাকড় পরিস্থিতিকে জটিল করেই তুলবে। আমাদের দেশে পত্রপত্রিকায় বলা হচ্ছে, বৌদ্ধ মুসলিম সংঘাত বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধুবিহীন করে তুলবে। কিন্তু খলেদা জিয়া চীনে গিয়ে পেতে পেরেছেন বিশেষ সম্বর্ধনা। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, চীন বাংলাদেশকে বক্সবাজারে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণে সাহায্য করবে। আর সেই সঙ্গে সাহায্য করবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আরো আধুনিক করে তুলবার জন্যে। রামুর ঘটনা তাই বাংলাদেশকে বন্ধুবিহীন করে তুলছে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চীনে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত, তা হল মহাযান বৌদ্ধধর্ম। মিয়ানমারের মত তা থেরাবাদী বা হীনযান বৌদ্ধধর্ম নয়। বিশ্বে বেশিরভাগ বৌদ্ধ হলেন মহাযানপন্থী। বাংলাদেশ তাই থেরাবাদী বৌদ্ধদের সাথে মুসলমানদের কোন বিবাদ দেখা দেবার অর্থ হতে পারে না সারা বৌদ্ধ জগতের সাথে বিবাদ সৃষ্টি হওয়া। বৌদ্ধ চিন্তায় আছে

www.pathagar.com

রকমফের। সব বৌদ্ধরাই যে একইভাবে ভাবছেন, এমন নয়। তা ছাড়া, বর্তমান মহাচীন মিয়ানমারের মত পরিচালিত হচ্ছে না বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা। আসলে মহাচীনে এখন আর কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু নেই। সেখানে সকলকেই জীবিকা অর্জন করতে হয় শ্রম করে। ভিক্ষু হয়ে অপরের ওপর নির্ভর করে বাঁচবার কোন ভিত্তি নেই সেখানে। চীনে খালেদা জিয়ার বিপুল সম্বর্ধনা বাংলাদেশের মানুষকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করছে স্বাধীনভাবে আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখবার জন্যে। বিশেষ করে চীন যেভাবে বলছে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে শাক্তিশালী করতে, সেটাকে গ্রহণ করতে হবে খুবই বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে। কারণ, এখনো পৃথিবী চলছে, শক্তির যুক্তিকে অনুসরণ করে। আর সেনাবাহিনী হল একটি জাতির শক্তির বিশেষ উৎস। সব দেশকেই মনোযোগী হতে হচ্ছে শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলবার ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে না।

ইংরেজ আমলের মানচিত্র ধরলে নাফ নদীর ওপারে বেশ কিছুটা জায়গা পড়ে বাংলাদেশের মধ্যে। কিন্তু আমরা আর এখন এই জায়গা আমাদের বলে দাবি করতে পারি না। কারণ, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এই জায়গার দাবি পরিত্যাগ করে বর্মার সঙ্গে নাফ নদীকে সীমানা হিসাবে গ্রহণ করে চুক্তি করে গিয়েছেন। কিন্তু আমরা মিয়ানমারের কাছে আর ভূমি হারাতে ইচ্ছুক নই। সবদিক বিবেচনা করে গড়তে হবে বাংলাদেশের জাতীয় নীতি। জাতীয় স্বার্থকে দিতে হবে অগ্রাধিকার।

***

www.pathagar.com

বাংলাদেশে বাংলাভাষী মানুষই আদিবাসী

'নৃতত্ত্ব' বলতে বোঝায় সেই বিজ্ঞানকে, যার আলোচ্য বিষয় মানুষ ও তার সংস্কৃতির উদ্ভব বৃত্তান্ত। নৃতত্ত্বকে বিজ্ঞান বলা হলেও এর অনেক কিছুই হয়ে আছে খুবই অস্পষ্ট। আর এই অস্পষ্টতাকে ঘিরে সৃষ্টি হতে পেরেছে আমাদের চিন্তার নানা জটিলতা। নৃতত্ত্বে ট্রাইব (Tribe) শব্দটা ব্যবহৃত হয় একাধিক অর্থে। এর একটা অর্থ হলো এমন জনসমষ্টি, যার একটা নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু ভাষাটি লিখিত নয়। ট্রাইবের মধ্যে কোনো রাষ্ট্রচেতনা গড়ে ওঠেনি। ট্রাইবরা সাধারণত থাকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে। ট্রাইব-এর অন্তর্গত মানুষের জীবনযাপন প্রণালী প্রায় আদিম। প্রত্যেক ট্রাইবের আছে নির্দিষ্ট নাম। একেকটি ট্রাইবের লোক মনে করে, তারা সবাই রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ এবং তারা সবাই উৎপন্ন হয়েছে একই পূর্বপুরুষ থেকে। ট্রাইব কথাটার বাংলা করা হয়েছে উপজাতি।

উপজাতিরা এখন সাধারণত বাস করে বৃহত্তর জাতি দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে; যারা সভ্যতায় অনেক অগ্রসর এবং যাদের জীবনধারা আদিম অর্থাৎ প্রস্তর যুগের পর্যায়ে পড়ে নেই। ইংরেজরা ১৭৭০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় অবতরণ করে। সেখানে ইংরেজরা বসতি গড়তে আরম্ভ করে ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। অস্ট্রেলিয়ায় বাস করত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ। যারা জীবনযাত্রার দিক থেকে পড়েছিল আদিম প্রস্তর যুগে। এই কালো মানুষদের বলা হতে থাকে Aborigine। আমেরিকায় অনেক আদিম অধিবাসীকেও একইভাবে বলা হয় Aborigine। এই Aborigine কথাটার বাংলা করা হয় আদিবাসী। এ অর্থে আদিবাসী শব্দটার একটা বিশেষ মূল্য আছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে ঘটতে চলেছে আদিবাসী' শব্দটির অপপ্রয়োগ। এ দেশে যাদের আদিবাসী বলে উল্লেখ করা হচ্ছে, তারো মোটেও এ দেশের আদিম নিবাসী নয়। এ ছাড়া এ দেশে কৃষিজীবী মানুষ বাস করছে কয়েক সহস্র বছর ধরে। যাদের আদিবাসী বলা হচ্ছে, তাদের তুলনায় এরা এ দেশে নব্য আগত জনসমষ্টি নয়। তারা এ দেশের বাসিন্দা বহু যুগ ধরে।

নৃতাত্ত্বিকরা মনে করেন, একসময় সব মানুষই বাস করত বনে। মানুষ বনের ফলমূল আহরণ ও শিকার করে জীবনযাপন করত। মানুষের আদিম এই জীবনধারাকে সাধারণভাবে বলা হয় 'আহর্য আহরক' (Food gatherer)। পরে মানুষ হয়েছে 'আহর্য' উৎপাদক' (Food producer)। মানুষ শুরু করেছে চাষাবাদ ও পশুপালন। পরে চাষাবাদ ও পশুপালনের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ নির্দিষ্ট ভূভাগে গড়ে তুলেছে সমৃদ্ধ স্থায়ী জনপদ। উদ্ভব হতে পেরেছে সভ্যতার। কেন কিছু মানুষ বনে জঙ্গলে থাকার জীবনকেই শ্রেয় মনে করেছে, সভ্য হতে চায়নি অথবা পারেনি, তা ব্যাখ্যা করা কঠিন। মানুষ একসময় কেবল পাথর দিয়ে তৈরি অস্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে। পরে সে শুরু করেছে ধাতুর ব্যবহার। এসব ধাতুর মধ্যে

www.pathagar.com

মনে করা হয়, তামার মতো ধাতুর ব্যবহারই হলো সর্বপ্রাচীন। কারণ তামা দিয়ে তৈরি অস্ত্র ও জিনিসপত্র পাওয়া গিয়েছে মাটি খুঁড়ে, অনেক গভীরে। এর থেকে অনেক কম গভীরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে লোহা দিয়ে তৈরি অস্ত্র ও জিনিসপত্র। যে সময় মানুষ তামার ব্যবহার আরম্ভ করেছে, কিন্তু প্রস্তর অস্ত্রের ব্যবহারও করেছে যথেষ্ট, সেই সময়টাকে বলা হয় তাম্র-প্রস্তর যুগ (Chalcolithic Age)। আর এই সভ্যতাকে বলা হয় তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা। আসলে তাম্র-প্রস্তর যুগ দিয়েই প্রত্নতত্ত্বে ধরা হয় সভ্যতার সূচনালগ্ন। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬২-১৯৬৪ সালে বর্ধমান ও বীরভূম জেলার অজয়, কুনুর এবং কোপাই নদীর ধারে অনেক স্থানে ভূগর্ভ উৎখননের ফলে খুব প্রচীন তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে তামা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার বড়শি, যা থেকে বোঝা যায় এরা তামার বড়শি দিয়ে মাছ ধরত। বীরভূমের মহিষাদল নামক জায়গায় পাথরের ছিলকা দিয়ে তৈরি অস্ত্র ও তামার খন্তা পাওয়া গিয়েছে। এখানে একটি মৃৎপাত্রে পাওয়া গিয়েছে কয়লা হয়ে যাওয়া কিছু ধান। *রেডিও অ্যাকটিভ কার্বন- ১৪* পদ্ধতিতে এর বয়স নিরূপিত হতে পেরেছে খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৮০ থেকে ৮৫০ অব্দের মধ্যে। এ ধান থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, এই অঞ্চলের তাম্র-প্রস্তর যুগের মানুষের প্রধান খাদ্য ফসল ছিল ধান। এসব মানুষ মাছ-ভাত খেয়ে বাঁচত। বাংলাভাষী মানুষের খাদ্য হলো মাছ-ভাত। সাধারণভাবে এখনো মাছ-ভাত খেয়েই তারা বাঁচে। এই সব তাম্র-প্রস্তর যুগের মানুষ মৃতদেহকে কবর দিত। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার উত্তরভাগে অবস্থিত 'পাণ্ডু রাজার ঢিবি' নামক জায়গায় তাম্র-প্রস্তর যুগের যেসব কবর পাওয়া গিয়েছে সেই সব কবরের মৃত মানুষের মাথার খুলির আকৃতি ছিল মধ্যমাকৃতি (Mesocephalic)। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে থাকতে দেখা যায় মধ্যমাকৃতি মানুষের মাথার প্রাধান্য। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে কোনো তাম্র-প্রস্তর যুগের নিদর্শন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু হতে পারে। বাংলাদেশের সীমানার খুব কাছে পশ্চিমবঙ্গে ফারাক্কায় তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান করা চলে অতীতে পশ্চিম দিক থেকে বহু মানুষ এসেছে বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্বে। বাংলাদেশের কৃষিজীবী মানুষের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। এ দেশকে তাই বলা চলে তাদের গড়া দেশ। তারাই হলো এ দেশের আদিবাসী। আরেক কথায় ভূমিজ সন্তান (Autochthones)।

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অনেক সাঁওতালের বাস। সাঁওতালের একটি ভাষা আছে। আছে নিজস্ব সমাজজীবন। এই সাঁওতালদের ধরা হয় বৃহত্তর জনসমাজের (জাতি) মধ্যে একটি উপজাতিবিশেষ। সাঁওতালরা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি দিন আগে আসেনি। এসেছে মাত্র ইংরেজ আমলে। এই সাঁওতালরা একসময় বনে বাস করত। তাদের জীবন ছিল আহার্য আহরক পর্যায়ের। ইংরেজ আমলে তারা শিখেছে কৃষিকাজ। নীলকুঠির সাহেবরা প্রথমে তাদের বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নিয়ে আসেন

www.pathagar.com

নীল চাষে সাহায্য করতে। সেটা বেশি দিন আগের ঘটনা নয়। সাঁওতালরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। এদের মাথার চুল মসৃণ ও তরঙ্গাকৃতি। মাথার আকৃতি প্রধানত লম্বা। নাকের অগ্রভাগ চওড়া ও মাংসল। কিন্তু তা বলে চেপ্টা নয়। দেহের উচ্চতা খর্বকায়। এদের দেখে স্থানীয় লোকদের থেকে সহজেই পৃথক করে চেনা যায়। সাঁওতালী ভাষা প্রথমে কোনো লিখিত ভাষা ছিল না। এখন বাংলাদেশে লিখিত হচ্ছে রোমক বর্ণমালায়, আর ভারতের ঝারখণ্ড প্রদেশে তা লিখিত হচ্ছে হিন্দির অনুকরণে নাগরী অক্ষরে। সাঁওতালরা একসময় নানা রকম আত্মার (বোঙ্গা) পূজা করত। কিন্তু এখন এরা দলে দলে রোমান ক্যাথলিক খ্রিষ্টান হচ্ছে। করছে না আর বোঙ্গার পূজা। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (যা ১৯৮৪ সালের পর খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বন্দরবন এই তিনটি জেলায় বিভক্ত হয়েছে।) অনেক উপজাতির বাস : চাকমা, আরাকানি (এরা নিজেদের বলে মারমা অথবা রাখাইন এবং বাংলায় এদেরকে সাধারণত বলা হয় মগ। মগের স্থলে মারমা বলা আরম্ভ হয় ১৯৫১ সাল থেকে।), টিপরা অথবা ত্রিপুরা, মুরং, তনচঙ্গ্যা, খুমী, পাঙ্খ, কুকি, রিয়ং, বম, ম্রো, খয়ং, বনযোগী এবং সাক। এদের মধ্যে চাকমারা হলো সংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি। এর পরে সংখ্যার দিক থেকে আসে আরাকানিদের নাম। বাংলা ভাষায় এখনো এদের অনেকে বলেন 'মগ' বা 'মঘ'। ইংরেজ আমলে ১৯৩১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টেও এদের মগ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রিটিশ নৃতাত্ত্বিক রিজলে (Herbert Risley) এদের বলেছেন 'আরাকানি' মগ'। পার্বত্য চট্টগ্রামের তৃতীয় বৃহৎ উপজাতি হলো টিপরা। এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন উপজাতি হিসেবে মনে করা হয় মুরংদের। পার্বত্য চট্টগ্রামের সব উপজাতি হলো বৃহৎ মঙ্গোলীয় মানব শাখাভুক্ত। এদের মাথার চুল সোজা ও খড়খড়ে প্রকৃতির। এদের মুখে দাড়ি গোঁফ হতে দেখা যায় কম, চোখের ওপর পাতায় থাকতে দেখা যায় বিশেষ রকম ভাঁজ। তাই এদের চোখকে দেখে মনে হয় ছোট ও বাঁকা। এদের গালের হাড় উঁচু। তাই মুখমণ্ডল দেখে মনে হয় অনেক সমতল। এসব উপজাতির কোনো সাধারণ ভাষা নেই। এক উপজাতি অপর উপজাতির সাথে কথা বলে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক বাংলায়। আরাকানিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে আরাকানি ভাষায়। তারা তা লিখে থাকেন বর্মী (ম্রনমা) অক্ষরে। চাকমারা যে ভাষায় কথা বলেন তা প্রধানত গড়ে উঠেছে চট্টগ্রামের বাংলা উপভাষার ওপর নির্ভর করে। ব্রিটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ গ্রিয়ারসন একে উল্লেখ করেছেন 'চাকমা বাংলা' হিসেবে। আমরা আদর্শ বাংলায় যখন বলি, *আমি যাব*, তখন চাকমারা বলে, *মুই যেইম*। চাকমাদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বর্মী ও পালিভাষার সংমিশ্রণে লেখা। যে হরফে এই বইগুলো লেখা, তার সাথে বর্মী অক্ষরের ব্যাপক মিল আছে। কিন্তু এই ভাষা চাকমারা আর এখন সাধারণভাবে বোঝেন না। পারেন না এর অক্ষর পড়তে। এই ভাষায় শিক্ষাদান ও সাহিত্যচর্চা সম্ভব নয়। চাকমারা লেখাপড়া শিখছেন বাংলাভাষারই মাধ্যমে। তারা সাহিত্যচর্চাও

www.pathagar.com

করছেন বাংলাভাষাকেই গ্রহণ করে। ১৮৭২ সালের দিকে চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মের জ্ঞান বাংলা ভাষার মাধ্যমে লাভ করতে প্রয়াসী হন। বিখ্যাত চাকমা জমিদার রাজা ধর্মবক্স খানের বিধবা স্ত্রী কালিন্দী রানী বর্মীভাষায় লিখিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'থার্দুতাং'-এর বাংলা অনুবাদ করান; যাতে করে চাকমারা সহজেই বৌদ্ধ ধর্মে জ্ঞান লাভ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্য উপজাতিরা পারিবারিক জীবনে তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করে। এইসব ভাষা প্রধানত হল তিব্বতী-চীনা ভাষাপরিবারভুক্ত। দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রামে মারমা ভাষা একসময় বেশি চলত। এই ভাষা বাংলা ও আরাকানি ভাষার সংমিশ্রণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ওপর বাংলাভাষা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া ভাষা নয়। এই ভাষার প্রভাব তাদের ওপর পড়েছে প্রধানত ব্যবসা-বাণিজ্যগত কারণেই। চট্টগ্রামের বাঙালিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে যেত ব্যবসা করতে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামের হাটে বাজারে গিয়ে লোহার তৈরি দা, কুড়াল, কাঁচি এবং বিভিন্ন প্রকার মৃৎপাত্র ও চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে যাওয়া লবণ বিক্রি করত। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কিনে আনত বাঁশ, বেত, কার্পাস তুলা, সরিষা প্রভৃতি। এর ফলে উপজাতিদের মধ্যে প্রসার ঘটে চট্টগ্রামের বাংলা ভাষার। এভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের সাথে চট্টগ্রামের বাংলাভাষীদের গড়ে ওঠে ভাষার একাত্মতা। ইংরেজ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ চট্টগ্রাম জেলাকে একবার জুড়ে দেয়ার চেষ্টা হয় (১৮৯২) তদানীন্তন আসাম প্রদেশের সাথে। কিন্তু এই সময়ে এর বিপক্ষে বিশেষ প্রতিবাদ ওঠে। ফলে এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম এভাবেই হয়ে থাকে বৃটিশ শাসনামলে বাংলাদেশের অংশ। মুঘল আমলে সুবে বাংলা অনেকগুলো প্রশাসনিক ভাগে বিভক্ত ছিল। এই ভাগগুলোকে বলা হতো 'সরকার'। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল এরকম একটি সরকার। ১৭৬০ সালে নবাব মীর কাসেমের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চট্টগ্রামের ইজারা বন্দোবস্ত লাভ করে। চট্টগ্রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন হয়। ১৮৬০ সালে গঠিত হয় চট্টগ্রামের পার্বত্য মহাল (Chittagong Hill Tracts). কিন্তু এই মহাল বা জেলাকে পরে আবার চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের অধীনে একটি বিশেষ ধরনের মহকুমায় পরিণত করা হয়। পরে ১৯০০ সালে এই মহকুমাকে চট্টগ্রাম জেলা থেকে কিছু জায়গা দিয়ে পরিণত করা হয় একটি জেলায়। এটাই হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ইতিহাস, যাকে এখন উপজাতি অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে ফেলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সেটা সফল হলে বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র হারাবে তার দশ ভাগের এক ভাগ ভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা এই অঞ্চলে এসেছে মাত্র কয়েক শ' বছর আগে, মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন) ও চীন প্রদেশ থেকে। কিন্তু এখন এদের দাবি করা হচ্ছে এই অঞ্চলের 'আদিবাসী' হিসেবে। সেটা সত্য নয়। উপজাতি বলে কথিতরা প্রথমে এসেছে দক্ষিণ চট্টগ্রাম অঞ্চলে। তারপর সেখান থেকে তারা ক্রমশ সরে গেছে উত্তর-

www.pathagar.com

পূর্বাঞ্চলে। কিন্তু তারা মেনেছে মুঘল বশ্যতা। দিয়েছে মুঘল সরকারকে রাজস্ব। পরে মুঘলদের কাছ থেকে রাজত্ব পায় ইংরেজরা। এডোয়া ট্রাইট ডালটন তাঁর Description Ethnology of Bengal বইতে বলেছেন– দুইজন জুমিয়া মগ সর্দার বৃটিশ সরকারকে পার্বত্য চট্টগ্রামে উৎপাদিত কার্পাস তুলার মাধ্যমে খজনা প্রদান করেন। ডালটনের বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭২ সালে, সরকারী প্রেস কলকাতা থেকে। এই বইটি পড়ে তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন উপজাতি এবং বাংলার হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে অনেক তথ্য উপাত্ত পাওয়া যায়। এদিক থেকে এটি একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ডালটন তাঁর বইতে বাংলার হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে বলতে যেয়ে লিখেছেন– বাংলার হিন্দু সমাজে উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজের মত বৈশ্যধর্ম নেই। বাঙ্গালী হিন্দুর সমাজ জীবনকে তাই বলতে হয় উত্তর ভারতের হিন্দু সমাজ জীবন থেকে বেশ কিছুটা ভিন্ন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে বর্ণ নিয়ে বিরোধ আগের মত বড় হয়ে নেই। কিন্তু ভারতের অনেক অঞ্চলে বিভিন্ন বর্ণভুক্ত জনসমষ্টির মধ্যকার বিরোধ, যাকে বলে 'জাত-পাতের বিরোধ' তা একটা বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা হয়ে আছে। ভোটের সময় যা একটি বড় কথা হয়ে উঠতে চায়।

১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাকিস্তান। পার্বত্য চট্টগ্রাম আসে তদানীন্তন পাকিস্তানে। করে এটা হতে পেরেছিল খুবই শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে বাংলাভাষী মুসলমানরা জোর করে ওই অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। সেটারও কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে ২০০৭ সালে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম 'আদিবাসী জনগোষ্ঠী'। বইটি সম্পাদনা করেছেন মেসবাহ কামাল, জাইদুল ইসলাম এবং সুগত চাকমা। এই বইতে আদিবাসীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'আদিবাসী বলতে বোঝায় এমন একটি জনগোষ্ঠী, যারা মোটামুটিভাবে একটি অঞ্চলে সংগঠিত, যাদের মধ্যে রয়েছে সংস্কৃতির ঐক্য এবং যার সদস্যরা মনে করে, তারা একই সাংস্কৃতিক এককে অন্তর্ভুক্ত।' আদিবাসীর এ রকম কোনো সংজ্ঞা নৃতত্ত্বের আর কোনো বইতে চোখে পড়ে না। ইংরেজ আমলে যথাযথভাবে আদমশুমারি আরম্ভ হয় ১৮৭১ সাল থেকে। আদম শুমারির রিপোর্টে কেবল লোক গণনার হিসাবই থাকত না; থাকত এই উপমহাদেশের মানুষ সম্পর্কে বহু তথ্য। যাদের আমরা এখন সাধারণত উল্লেখ করি 'উপজাতি' হিসেবে, তাদের আদমশুমারির রিপোর্টে প্রথম দিকে উল্লেখ করা হতো অ্যানিমিস্ট (Animist) বা আত্মা উপাসক হিসেবে। পরে ১৯৩১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টে তখনকার বাংলা প্রদেশে ৩০ টি আদিম উপজাতির নাম পাওয়া যায়। বাংলাদেশে এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে আদিবাসীর নামে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে এমন অনেক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর নাম পাওয়া যাচ্ছে, যাদের উপজাতি না বলে বর্ণ (Caste) বলাই বোধ হয় হবে অধিক বিধেয়।

সম্প্রতি বাংলাদেশের বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী বদরুউদ্দীন উমর তার একটি লেখায় (দৈনিক যুগান্তর ২৯ মে ২০১১) বলেছেন, উপজাতিরা আসলে হলো সংখ্যালঘু জাতি।

www.pathagar.com

বাংলাদেশে এদের একত্র হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখেছি বাংলাদেশের সব উপজাতি এক অঞ্চলে বাস করে না। আর তাদের মোট সংখ্যা হলো খুবই কম। তারা উমর সাহেবের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করলে কতটা অধিকার আদায়ে সক্ষম হবে, বলা যায় না। বরং বাড়বে বৃহত্তর বাংলাভাষী জনসমাজের সাথে তাদের মনোমালিন্য। ইতিহাসে দেখা যায়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরকম সংখ্যালঘু জনসমষ্টিকে ধীরে ধীরে মিশে যেতে হয়েছে দেশের বৃহত্তর জনসমাজের সাথে। একই পত্রিকায় ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী 'আদিবাসী প্রসঙ্গে কিছু কথা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার মতে, আদিবাসী শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে, একটি অঞ্চলে সুপ্রাচীন অতীত থেকে বাস করছে এমন একটি জনগোষ্ঠী। তার মতে এই বিচারে আজকের বাংলাদেশে আদিবাসী হচ্ছে এ দেশের কৃষিজীবী মানুষ। ক্ষুদ্রজাতি, উপজাতি হলেই আদিবাসী বা আদিম বাসিন্দা হবে, তেমন কোনো কথা নেই। বাংলাদেশের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে আদিবাসী বা আদি বাসিন্দাদের উত্তরসূরি হওয়ার প্রথম দাবিদার হলো এ দেশের কৃষক সম্প্রদায়।

যাদের বলা হয় উপজাতি, তারা কৃষিকাজ জানত না। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিরা এক রকম চাষ করে, যাকে বলে জুম পদ্ধতিতে চাষ। জুম শব্দটা পার্বত্য কোনো উপভাষা থেকে আসেনি। জুম শব্দটার ব্যুৎপত্তি নিয়ে আছে সংশয়। এই পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমে বনে গাছ কেটে কিছুদিন ধরে কর্তিত গাছ শুকাতে হয়, এরপর এতে আগুন লাগিয়ে বন পরিষ্কার করে কৃষি ভূমি বের করা হয়। তারপর সুচালো কাঠ, লোহার খন্তা অথবা দা দিয়ে মাটি খুঁড়ে গর্ত করে তাতে বীজ বপন করা হয়। এসব উপজাতি লাঙল দিয়ে চাষ করে না। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আগে লাঙল দিয়ে চাষ ছিল অজ্ঞাত। লাঙল দিয়ে চাষাবাদ শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে লোক গিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে নদীর ধারে অবস্থিত সমভূমিতে চাষাবাদ করার ফলে। উপজাতি বলে কথিতদের জীবনযাত্রা কৃষিকর্মের দিক থেকে পড়েছিল আদিম পর্যায়ে। কিন্তু তাই বলে তারা যে কোন অঞ্চলের আদিবাসী, সেটা প্রমাণিত হয় না। এরা থেকেছে অর্ধ যাযাবর। কারণ, জুম পদ্ধতিতে এক জমিতে কয়েক বছর চাষ করলে জমি আর চাষের উপযোগী থাকে না। বাংলাদেশে এখন উপজাতিরা প্রায় হয়ে উঠেছে এদেশের বৃহত্তর জনসমাজের জীবনব্যবস্থার অংশ। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে তারা তাদের আদিমতা পরিত্যাগ করে সাংস্কৃতিক দিক থেকে এ দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির মানুষের মতো হয়ে উঠবে। ড. কোরেশী তার সুলিখিত প্রবন্ধে বলেছেন, ইউরোপ-আমেরিকার কিছু কিছু সংস্থা এখন দেশে দেশে আদিবাসী খুঁজে বেড়াচ্ছে। তারা চাচ্ছে এদের খ্রিষ্টান করতে। এদের খ্রিষ্টান করে পাশ্চাত্যের কয়েকটি শক্তিমান রাষ্ট্র তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক স্বার্থে সহযোগী করে তুলতে চাচ্ছে এসব জনসমষ্টিকে। এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হওয়া প্রয়োজন। আমার মনে হয়, এ প্রসঙ্গে এই প্রবীণ রাজনীতিকের সঙ্গে অনেকেই একমত হবেন।

***

www.pathagar.com

বিবিধ প্রসঙ্গ

আর্য ও অনার্য:

ভাষাতত্ত্বের ধারণা আমাদের ইতিহাস লেখকদের প্রভাবিত করেছে। আর বিভিন্ন ঐতিহাসিকের লেখা প্রভাব ফেলেছে আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা চেতনায়। এ সম্পর্কে তাই সাধারণভাবে কিছু জানা সকলের জন্যেই আবশ্যিক। মানুষের ভাষাসমুহকে তাদের অর্থবহ শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাকরণগত কাঠামোকে বিচার করে কতগুলি ভাষা পরিবারে বিভক্ত করা সম্ভব। সাধারণত মনে করা হয়, এক পরিবারভুক্ত ভাষায় যারা কথা বলে তারা অতীতে ছিল এক জাতিভুক্ত। কিন্তু এটা সত্য নাও হতে পারে। কারণ, একদল মানুষের ভাষা আর একদল মানুষ শিখতে পারে। আর তা হয়ে উঠতে পারে তাদেরও ভাষা। তবে সাধারণভাবে ভাষা ও জাতিসত্ত্বার ধারণা হল একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাই ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্ন অনেক ক্ষেত্রে নিতে পেরেছে জটিল রূপ। বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নত জাতি কথা বলে ইন্ডো-ইউরোপীয়ান পরিবারভুক্ত ভাষায়। উন্নত সভ্য মানুষ বলতে ধরা হচ্ছে প্রধানত তাদের, যাদের ভাষা উন্নত বলে বিবেচিত। একটি উন্নত জাতির মধ্যে গ্রামে থাকা কৃষিজীবী মানুষের ভাষায় শব্দ সম্পদ থাকতে দেখা যায় কম। পক্ষান্তরে নগরবাসী মানুষের ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে শব্দ সম্পদ থাকতে দেখা যায় বেশি। মানুষের সভ্যতা যত অগ্রসর হয়েছে, অগ্রসর জনসমষ্টির ভাষার শব্দ সম্পদ হতে পেরেছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃদ্ধি। নতুন জিনিসের নামকরণ ও বর্ণনা করতে যেয়ে বেড়েছে শব্দ সম্পদ। ভাষার অগ্রগতি দিয়ে তাই চলতে পারে পরোক্ষভাবে সভ্যতার জরিপ।

টমাস ইয়ুং (১৭৭৩-১৮২৯) ছিলেন বিলাতের একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক। তিনি আলোকের গতিবেগ মাপনের জন্যে বিশেষ পন্থা আবিষ্কার করেন। যা তাকে প্রদান করেন পদার্থ বিজ্ঞানী হিসাবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি। অন্যদিকে তিনি হতে পারেন তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের একজন পথিকৃত। প্রাচীন মিশরের চিত্রলিপি বা হাইরোগ্লিপিকস্ পড়বার ক্ষেত্রে যারা প্রথম অংশ নেন, তিনি হলেন তাদের মধ্যে একজন। তিনি প্রথম ইন্ডো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের বিশেষ ধারণা প্রদান করেন। আর সম্ভবত এই ভাষা পরিবারের নামকরণ তিনিই প্রথম করেন। তার আগে ইন্ডো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবারের ধারণা পরিচ্ছন্নভাবে কেউ প্রদান করেননি। এই ভাষা পরিবারে যেমন পড়ে ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরেজি, জার্মান প্রভৃতি ভাষা। তেমনি আবার পড়ে প্রাচীন বৈদিক সংস্কৃত, পরবর্তী সংস্কৃত, হিন্দি ও বাংলার মত ভাষা। ইন্ডো-ইউরোপীয়ান ভাষা পরিবার হল একটা বিরাট ভাষা পরিবার। এবং এই পরিবারের প্রধান ভাষাসমূহ হল খুবই অগ্রসর। এই ভাষা পরিবারের একটা অংশকে জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ম্যাক্সম্যুলার (১৮২৩-

www.pathagar.com

১৯০০) নাম দেন আর্য। আর্য বলতে তিনি যেমন একদল ভাষাকে বুঝিয়েছেন, তেমনি আবার ইঙ্গিত করেন যে, আর্য ভাষায় প্রথমে যারা কথা বলতে আরম্ভ করেন, তারা সবাই ছিলেন একই মানবধারার (Race) মানুষ।

ম্যাক্সম্যূলার জাতিতে ছিলেন জার্মান। কিন্তু তাঁর কর্মজীবন কেটেছে ইংল্যান্ডে। তিনি ছিলেন বিলাতের বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক। আর তাঁর সময়ের একজন খুবই নামকরা প্রাচ্যবিদ (Orientalist)। তিনি বৈদিক সংস্কৃত ভাষা থেকে ইংরেজিতে ঋগবেদের অনুবাদ করে ছাপিয়ে প্রকাশ করেন(১৮৭৫)। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। বেদ হল চারটি। এরমধ্যে ঋগবেদের গুরুত্ব হল সর্বাধিক। ম্যাক্সম্যূলার বেদ প্রকাশের পর এই উপমহাদেশে ঘটে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী চিন্তা চেতনার উত্থান। ভারতে গঠিত হয় গোড়া গুজরাটি ব্রাহ্মণ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নেতৃত্বে আর্য সমাজ(১৮৭৫)। দয়ানন্দ ছিলেন বিশেষভাবে মুসলিম বিরোধী। এই উপমহাদেশে তাঁন কার্যকলাপে সৃষ্টি হতে পারে ভয়ংকর মুসলিম বিদ্বেষ। অন্যদিকে এই আর্য জাতির ধারণা, জার্মানীতে জন্ম দেয় প্রভূ-জাতির (Herrenvolk) ধারণা। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দিয়ে জার্মানীতে পায় বিশেষ প্রাবল্য। জার্মান পণ্ডিতেরা দাবি করেন যে, আর্যরা হল শ্রেষ্ঠ মানুষ। তারাই সৃষ্টি করেছে বিশ্বের নানা উন্নত ভাষা ও সভ্যতা। জার্মানরা হল খাঁটি আর্য। তাই আছে তাদের বিশ্বকে জয় করে শাসন করবার এবং আরো উন্নততর সভ্যতা গড়ে তুলবার একান্ত অধিকার। জার্মানরা যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হেরে না যেত, তবে তাদের এই প্রভু-জাতির ধারণাটাকে মেনে নিতে হত আমাদেরও। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর মিত্র ছিল জাপান। জাপান আর্যবাদে বিশ্বাস করত না। এই উপমহাদেশে হিন্দুদের মধ্যে হিটলারের প্রতি সহানুভূতি হয়ে উঠেছিল তীব্র। যতগুলি কারণে মুসলমানরা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি ওঠায়, তার মধ্যে একটি ছিল এই উপমহাদেশের মুসলমানদের ওপর আর্য তথা হিন্দু আধিপত্যের ভীতি (Fear Complex)। হিন্দু আর্য জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি সৃষ্টি হতে পারে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা। যাকে নির্ভর করে উদ্ভব হতে পেরেছিল সাবেক পাকিস্তান। সাবেক পাকিস্তান ভেঙে সৃষ্টি হতে পেরেছে আজকের পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ। আজকের বাংলাদেশের গঠনকে বুঝতে হলে তাই মনে রাখতে হয় এই ইতিহাসের ধারা।

বৃটিশ শাসনামলে আর্য ও অনার্যের ধারণা আমাদের দেশের ইতিহাস পাঠ্যবইতে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করে। আগে আর্য জাতির কোন ধারণা ছিল না এই উপমহাদেশে। আর্যদের ধরা হয়েছে শ্রেষ্ঠ জাতি। পক্ষান্তরে যাদের বলা হয়েছে অনার্য, তাদের ধরা হয়েছে জন্মগতভাবেই কম তৎপর ও কম বুদ্ধিমান জাতি হিসাবে। পরে মাটি খুঁড়ে হরপ্পা(১৯২১) ও মহেনজোদারো(১৯২২) সভ্যতা আবিষ্কৃত হবার পর এই ধারণা বিশেষভাবে ধাক্কা খায়। সুদূর পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা রাজারা নিজেদের দাবি করেন আর্য বংশজাত হিসাবে।

www.pathagar.com

বর্ণাশ্রম:

বর্ণাশ্রম হিন্দু সমাজ জীবনের বৈশিষ্ট্য। 'বর্ণ' বলতে বোঝায় রং। মহাভারতের শান্তি পর্বে বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণরা হল দেখতে ফর্সা; ক্ষত্রিয়রা হল রক্তাভ; বৈশ্যরা দেখতে হল পীতাভ; আর শুদ্ররা হল কৃষ্ণকায়। হিন্দু সমাজে ব্রহ্মণদের গণ্য করা হয়েছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বর্ণ হিসাবে। তাদের কাজ হল ধর্ম ও বিদ্যা বুদ্ধির চর্চা। ক্ষত্রিয়দের কাজ হল যুদ্ধ করা। বৈশ্যদের কাজ হল ব্যবসা বাণিজ্য ও সুদে টাকা খাটানো। আর শুদ্রদের কাজ হল ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের সেবা করে জীবিকা নির্বাহ করা। কৃষি কাজ করা। হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় বলা হয়েছে, সমর্থ হলেও শুদ্রকে বেশি অর্থ সঞ্চয় করতে দেয়া উচিত হবে না। কেননা,. তাহলে সে তার নিজের কর্তব্য অর্থাৎ উচ্চজাতিকে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) সেবারূপ ধর্ম পরিত্যাগ করবে এবং তাতে হবে সমাজের অকল্যাণ। শুদ্ররা ছিল হিন্দু সমাজে সবচেয়ে অবহেলিত অংশ। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এদের ভাবত অস্পৃশ্য। এর মধ্যে যেন সুপ্ত হয়ে ছিল একটা সাদা-কালো ব্যবধান। বৃটিশ শাসনামলে বৃটিশ রাজকর্মচারীরা এদেশের কালো মানুষকে করেছেন ঘৃণা। তারা ট্রেনের এক কামরায় ভ্রমণ করতে চাননি কালো মানুষের সঙ্গে। তারা ট্রেনের কামরা থেকে জোর করে নামিয়ে দিয়েছেন কালো মানুষকে। আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ভাগের অনেক অঞ্চলে থাকতে দেখা যায় কালো মানুষের প্রতি প্রায় একই রকম ঘৃণা। হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা এই মহাদেশের রাজনীতিতে ফেলেছে বিরাট প্রভাব। বৃটিশ আমলে হিন্দুরা মুসলমানদের ভেবেছে শুদ্র। হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষ মুসলিম মনে সৃষ্টি করেছে পৃথক জাতীয়তাবোধ। সৃষ্টি করেছে পৃথক রাষ্ট্র গড়বার অবস্থা।

হিন্দু বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাকে ইংরেজিতে বলে Caste system। Caste শব্দটি ইংরেজি ভাষায় এসেছে পর্তুগীজ ভাষা থেকে। পর্তুগীজ ভাষায় Caste শব্দের অর্থ হল 'বংশ'। ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথমে পর্তুগীজরাই এই বিষয়ে করেন আলোচনার সূত্রপাত।

বাঙ্গালির উৎপত্তি:

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়(১৮৩৮-১৮৯৪) তার সম্পাদিত বিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার একটি সংখ্যায় 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন ('বাঙ্গালি' বানান বঙ্কিমচন্দ্রের)। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাভাষায় কথা বলা মানুষকে বাঙ্গালি হিসাবে গণ্য করলেও তাদের একজাতি হিসাবে বিবেচনা করেননি। তিনি তার প্রবন্ধে বাঙ্গালিদের চারভাগে বিভক্ত করেছেন: ১. আর্য হিন্দু বাঙ্গালি, ২. অনার্য হিন্দু বাঙ্গালি, ৩. আর্য ও অনার্য মিশ্রত হিন্দু বাঙ্গালি এবং ৪. বাঙ্গালি মুসলমান। বঙ্কিমচন্দ্র তার এই বিখ্যাত প্রবন্ধে ইংরেজদের বলেছেন- একজাতি। কিন্তু

www.pathagar.com

বাংলাভাষীদের বলেছন- বহুজাতি। তার মতে ইংরেজ জাতি গঠিত হয়েছে স্যাকশন, ডেন ও নরমান, এই তিনটি জাতির মিলনের ফলে। এই মিলন সম্ভব হয়েছে; কারণ সাকশন, ডেন ও নরমান রা সবাই হল আর্য বংশীয়। এবং তাই তারা সহজেই এক হয়ে ইংরেজ জাতিতে পরিণত হতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাভাষায় যারা কথা বলে, তারা সকলে আর্য বংশীয় নয়। বাংলাভাষাভাষীদের মধ্যে যে চারভাগ বিদ্যমান, তারা একে অপরের সঙ্গে মেলামেশা করে না। তারা পরস্পর থেকে পৃথক থাকতে চায়। তিনি তার প্রবন্ধে বাঙ্গালি ব্রহ্মণদের দাবি করেন খাঁটি আর্য হিসাবে। এবং সেই সুবাদে তাদের বলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। অন্যদিকে মুসলমানদের বলেন অনার্যদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্নস্তরের মানুষ। আমার মনে হয়, বর্তমান বাংলাদেশের উদ্ভব বৃত্তান্তকে বুঝবার কাজে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধ সাহায্য করে। কারণ, অনার্য বাংলাভাষী মুসলমানরাই বর্তমান বাংলাদেশের স্রষ্টা; আর্য হিন্দুরা নয়।

অস্ট্রিক জাতিঃ

অস্ট্রিক একটি ভাষা পরিবারের নাম। কোন বিশেষ মানবসমষ্টির নাম নয়। কোন বিশেষ সংস্কৃতির পরিচয়ও তা বহন করে না। অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের ধারণা ১৯০৬ সালে প্রদান করেছিলেন জার্মান ভাষাতাত্ত্বিক ভিলহেম সমিট (Wilhem Schmitd)। কিন্তু বর্তমানে এই ভাষা পরিবারের ধারণাকে অধিকাংশ ভাষাতত্ত্বিক আর সঠিক বলে মনে করছেন না। অস্ট্রিক ভাষা পরিবারে যেমন স্থাপন করা হত সাঁওতাল, মুন্ডা, হো ও সবর প্রভৃতি ইন্ডো-অস্ট্রলয়েড মানবধারার মানুষের ভাষাকে। তেমনি আবার স্থাপন করা হয় খাসিয়াদের মত মঙ্গলীয় প্রকারভুক্ত মানুষের ভাষাকেও। খাসিয়ারা মঙ্গলীয় প্রকারভুক্ত মানুষ, তবে এদের মাথার আকৃতি অন্য মঙ্গলীয়দের মত গোল না। এদের মাথার আকৃতি মাঝারি (Mesocephalic)। খাসিয়াদের গায়ের রং হালকা বাদামী। কিন্তু চোখ মঙ্গলয়েডদের মত। আর গণ্ডের হাড় উঁচু। তাই এদের মুখমণ্ডলকে অন্যান্য মঙ্গলীয় মানবপ্রকারভুক্ত মানুষের মত সমতল দেখায়। খাসিয়ারা ধান চাষ করে। এরা ধান চাষ করে দু'ভাবে। জুম পদ্ধতিতে মাটিতে গর্ত করে এবং স্থায়ীভাবে ক্ষেতে চাষ করে। স্থায়ী ক্ষেতে এরা জমি চাষ করে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে লাঙল। স্থায়ী ক্ষেতে এরা ধান বপন করে ছিটিয়ে। এক সময় বলা হত অস্ট্রিক জাতির মানুষ এদেশে এসে প্রথম ধানের আবাদ আরম্ভ করেছিল। কিন্তু এখন আর এই মতটাকে আগের মত সমর্থন করা হয় না। কারণ খাসিয়ারা রোপা ধানের চাষ করে না; কিন্তু আমরা করি। তাদের ধান চাষ পদ্ধতি আর আমাদের ধান চাষ পদ্ধতি এক নয়। এছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার এখন প্রমাণ করছে যে, এই অঞ্চরে ধানচাষ বহু প্রাচীন ঘটনা। খাসিয়ারা কথা বলে অস্ট্রিক ভাষার মন-খামের (Mon-khamer) উপ-পরিবারভুক্ত ভাষায়। এই ভাষার বিশেষ

www.pathagar.com

পরিচয় পাওয়া যায় দক্ষিণ ভিয়েতনামের সংলগ্ন খমের অঞ্চলে। কিন্তু সাঁওতাল ও অন্যান্যরা কথা বলে অস্ট্রিক ভাষার কোল বা মুণ্ডারী শাখায়। তবে বর্তমানে ভাষা তাত্ত্বিকরা বলছেন– মুণ্ডারী ও মন-খামের ভাষাসমুহের মধ্যে শব্দ ও ব্যকরণের কোন যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব নয়। এরা আসলে হল ভিন্ন পরিবারভুক্ত ভাষা। তাই বাংলাদেশে অস্ট্রিক জাতির যে ধারণা প্রচলিত হতে পেরেছে, তার কোন ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তি আছে, এমন আর দাবি করা চলে না। বিখ্যাত বৃটিশ ভাষাতাত্ত্বিক জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন(১৮৫১-১৯৪১) সামিটের অস্ট্রিক ভাষা পরিবারের ধারণাকে সমর্থন করেন। কিন্তু তিনি অস্ট্রিক শব্দটাকে জাতিবাচক অর্থে প্রয়োগ করেননি। অস্ট্রিক শব্দটা জাতিবাচক অর্থে বিশেষভাবে প্রয়োগ করেন ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালে তার লেখা বহুল পঠিত 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' নামক বইতে। তিনিই প্রথম প্রমাণ করতে চান যে, অস্ট্রিক ভাষী মানুষ বাংলাদেশে ধান, পান, কলা, নারিকেলের মত ফসল প্রথম লাগাতে শুরু করে। কিন্তু এর কোন বাস্তব প্রমাণ তিনি দিতে যে সক্ষম হয়েছিলেন তা নয়। তবে তার কথা শিক্ষিত সমাজ সাধারণভাবে মেনে নিয়েছিল। কারণ, সে সময় ভাষাতাত্ত্বিক এবং কিছুটা নৃ-তাত্ত্বিক হিসাবেও সুনীতিকুমারের ছিল যথেষ্ট সুনাম। এক সময় ভাবা হত ধান চাষের শুরু হয়েছিল চীনে। কারণ, ক্ল্যাসিকাল চীনা ভাষায় কৃষি ও ধানচাষ একই শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়। কিন্তু এখন আর আগের মত এই ধারণাকে সমর্থন করা হয় না। এখন অনেকে মনে করেন, বাংলাভাষী অঞ্চলেই সম্ভবত প্রথম হতে পেরেছিল পৃথকভাবে ধান চাষের শুরু। কারণ বাংলাভাষায় অন্ন অর্থাৎ ধান ও খাদ্য হল সমার্থক। আমাদের দেশে যেসব মঙ্গলীয় মানবধারার মানুষ বাস করে, তাদের তিনভাগে ভাগ করা যায়। একভাগের মাথা কিছুটা লম্বা ধরণের। ঠিক গোলকৃতি নয়। এদের গায়ের রং হালকা বাদামী। এদের মধ্যে পড়ে খাসিয়া, পোলিয়া, রাজবংশী এবং বাহে বলে পরিচিতরা। ২. গোল মাথা মঙ্গলীয় শ্রেণীর মধ্যে স্থাপন করতে হয় ত্রিপুরী, চাকমা এবং মারমাদের। গোটা মিয়ানমারের অধিবাসী হল এই একই রকম। এদের গায়ের রং হল গাঢ় বাদামী থেকে কিছুটা কালো। এক সময় এদের সকলকেই বাংলাভাষায় মোটামুটিভাবে বলা হত মগ বা মঙ। তিব্বতী মঙ্গলদের মাথার আকৃতি গোল কিন্তু মিয়ানমারের অধিবাসীদের মত অতটা গোল নয়। এছাড়া এদের গায়ের রং হল পীতাভ। নাক লম্বা কিন্তু নাকের অগ্রভাগ বোঁচা। এদের মূল বাসস্থান তিব্বত। নেপালেও এদের অনেক দেখা যায়। বৃটিশ নৃতাত্ত্বিক স্যার হার্বার্ট রিজলে (Sir Herbert Risley) বাংলাভাষী মানুষকে তাঁর People of India বইতে(১৯০৮) উল্লেখ করেছেন মঙ্গল-দ্রাবিড় (Monglo-Draidian) হিসাবে। তিনি বলেন, বাংলাভাষী জনসমষ্টির উদ্ভব হতে পেরেছে দ্রাবিড় এবং মঙ্গল মানবধারার সংমিশ্রণে। রিজলে সাঁওতালদের বলেছিলেন বিশুদ্ধ দ্রাবিড়। বাংলাদেশে পশ্চিম থেকে এসেছে সাঁওতালদের অনুরূপ দ্রাবিড় মানুষ আর পূব থেকে এসেছে

www.pathagar.com

মঙ্গল মানবশাখার মানব সমষ্টি। আর তাই ঘটতে পেরেছে এই দুই মানবধারার সংমিশ্রণ। কিন্তু তাঁর এই মতকে এখন আর মানা হয় না। কারণ বাংলাভাষী মানুষের গায়ের রং কালো হলেও তারা সাঁওতালদের মত দেখতে নয়। অন্যদিকে তাদের অধিকাংশের চেহারার মিল নেই মঙ্গলীয় মানবধারার মানুষের সঙ্গেও। বাংলাভাষী মানুষের কপালের গড়ন সাঁওতালদের মত নয়। তাদের নাকের অগ্রভাগ সাঁওতালদের মত মাংসল নয়। অন্যদিকে তাদের নাক সাধারণত চিকন এবং উঁচু। মঙ্গলীয়দের মত চেপ্টা নয়। তাদের চোখ আয়ত। তাদের মুখে সাধারণত যথেষ্ট দাড়ি-গোঁফ হতে দেখা যায়। রিজলে বাংলাভাষী মানুষের মাথাকে বলেছেন গোল। কিন্তু বাংলাভাষীদের মধ্যে আসলে থাকতে দেখা যায় মাঝারি মাথা-মানুষেরই প্রধান্য। তবে বাংলাদেশের মানুষের ওপর উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে পড়েছে বেশ কিছুটা মঙ্গলীয় মানবধারার প্রভাব। যেটা সাধারণ চোখে দেখেই বোঝা যেতে পারে। মোটামুটি এই হল বাংলাভাষী মানুষের নৃ-পরিচয়। বাংলাভাষী মানুষের সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে কোন অস্ট্রিক জাতির ধারণাকে টেনে আনা প্রয়োজনীয় নয়। যেমন করতে চান অনেকে।

জাতি গঠনে ধর্ম:

ধর্ম মানব জীবনের একটা বিরাট বাস্তবতা। একে বাদ দিয়ে মানুষের কথা ভাবা যায় না। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ এখন ধর্মে মুসলমান। ইসলামী মূল্যবোধ তাদের জীবনকে করে চলেছে নিয়ন্ত্রিত। ইসলামের জন্ম-কেন্দ্র হল আরবের হেজাজে। হেজাজের মানুষের গায়ের রং হল তামাটে সাদা। নাক সরু। কিন্তু নাকের মধ্যভাগ হল কিছুটা ধনুকের মত বাঁকা। মুখের সাধারণ আদল হল লম্বা উপবৃত্তাকার (Elliptical)। মাথার আকৃতি হল যথেষ্ট লম্বা। অতীতে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে আরব মুসলমানরা হয়তো রেখেছিলেন অবদান। কিন্তু আরব উপদ্বীপের মানুষের মত মানুষ বাংলাদেশে দেখা যায় না। বিশেষ করে হেজাজ অঞ্চলের মত মানুষ। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার শুরু হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে। এ সময় বাংলাদেশ নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে তুর্কী মুসলিম নৃ-পতিদের দ্বারা। তুর্কিদের চেহারা আরবদের মত নয়। তাদের মাথার আকৃতি খুবই গোল। মুখের আদল ডিম্বাকৃতি। আরবদের মত অতটা চাপা উপবৃত্তাকার নয়। তুর্কিদের নাক চিকন ও উঁচু। কিন্তু নাকের মধ্যভাগ ধনুকের মত বাঁকা নয়। তুর্কিদের চোখ আয়ত, তা মোটেও মঙ্গলীয়দের মত নয়। যদিও মাথার আকৃতির সঙ্গে মিল থাকতে দেখা যায় মঙ্গলীয় মানবধারার সঙ্গে। মধ্যএশিয়ার তুর্কিরা বাংলাদেশে আসার ফলে এদেশের জনসমষ্টির ওপর তার কতটা প্রভাব পড়েছিল সে সম্বন্ধে কোন গবেষণা এখনো হয়নি। তবে এর ফলে এ দেশের মূল মানবধারায় বিরাট পরিবর্তন এসেছিল এমন ভাবা যায় না। কারণ তুর্কি সৈন্যরা তাদের সঙ্গে করে তুর্কি স্ত্রী নিয়ে আসেন

www.pathagar.com

নি। তারা সবাই বিয়ে করেছিলেন এদেশেরই কন্যাদের। তাই মিশ্রণ ঘটেছিল এদেশের জনসমষ্টির সাথে মধ্য এশিয়া থেকে আসা মুসলিম তুর্কিদের। তুর্কিরা প্রথমে মুসলমান ছিল না। আরব মুসলমানগণ ৭১২ খৃষ্টাব্দে জয় করেন সমরখন্দ। যার প্রাচীন নাম ছিল মারাখন্দ। মধ্যএশিয়ার সমরখন্দ ও বোখারার মত শহরকে কেন্দ্র করে উদ্ভব হতে পেরেছিল এক বৈশিষ্ট্যময় মুসলিম সভ্যতার। যার ঐতিহ্য এদেশে বহন করে এসেছিলেন মধ্যএশিয়ার তুর্কি মুসলমানরা। মধ্যএশিয়া থেকে তুর্কি বা তুরানী মানবধারার মানুষ এর আগেও এই উপমহাদেশে এসেছেন। গড়ে তুলেছেন সারা দক্ষিণ এশিয়ার উত্তরভাগ জুড়ে বিশাল সাম্রাজ্য। কুশানরা ছিলেন তুর্কি মানবধারারই মানুষ। মথুরাতে কুশান সম্রাট কণিষ্কের পাথরের যে মূর্তি পাওয়া গিয়েছে, তাতে দেখা যায়, তার পায়ে আছে নাগরা জুতা। পরনে রয়েছে চুড়িদার পাজামা এবং আচকান। কোমরে ঝুলছে তুর্কি তলোয়ার। যা দেখে প্রথমে মনে হতে পারে, মুসলমান হিসাবে। কিন্তু কোণিষ্ক ধর্মে মুসলমান ছিলেন না। তাকে নির্ভর করে উদ্ভব হতে পেরেছিল মহাযান বৌদ্ধধর্ম। কুশানদের আদি ধর্ম বিশ্বাসকে অনেকে উল্লেখ করেছেন সামানিজম (Shamanism) সামনবাদ বলে। সামন বলতে বুঝাতো এমন সব মানুষকে, যারা হলেন দৈব ক্ষমতা সম্পন্ন।

বাংলাদেশের সুলতানী আমল বলতে বুঝায় তুর্কি মুসলমান সুলতানদের শাসনামলকে। ১৩৩৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি স্বাধীন সালতানাত। যাকে বলা হত সালতানাৎ-ই-বাঙ্গালাহ। এ আমলে গড়ে উঠেছিল বাংলার একটা নিজস্ব ইসলামী স্থাপত্য ধারা। এ আমলেই হতে পেরেছিল বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। হিন্দু শাসনকর্তারা পৃষ্টপোষকতা করেছেন দেবভাষা সংস্কৃতর। কিন্তু মুসলমান সুলতানরা করেছিলেন বাংলাভাষার পৃষ্টপোষকতা। একথা প্রথম বিশেষভাবে বলেন– দ্বিনেশচন্দ্র সেন তাঁর বিখ্যাত History of the Bengali Language and Literature নামক বইতে। বইটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয় ১৯১১ সালে। কেবল তাই নয়, দ্বিনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের পর বাংলাভাষা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা আরও অনেক অগ্রসর হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রচীন নিদর্শন হল 'ইউসুফ জুলেখা' নামক গ্রন্থ। যার রচক হলন শাহ মুহাম্মদ সগীর। তাঁর এই কাব্যগ্রন্থের ভণিতায় থাকতে দেখা যায় গৌড়ের সুলতান গিয়াস উদ্দিন আযম শাহ-এর প্রশস্তি। যার শাসনকাল ধরা হয় ১৩৮৯ থেকে ১৪১০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। ইউসুফ জুলেখাকে তাই ধরা চলে এতাবদ আবিষ্কৃত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে। সগীর তাঁর কাব্য রচনা করেছেন ফারসী 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্যকে নির্ভর করে। তাই ধরা যেতে পারে ফারসী কাব্য সাহিত্যের হাত ধরে হতে পেরেছে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ যাত্রা। এক সময় মনে করা হত ১২০০ খৃস্টাব্দ থেকে প্রায় দেড়শ

www.pathagar.com

বছর ধরে বাংলা সাহিত্য বা বিদ্যাচর্চার বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সে ধারণা সঠিক নয়। এখন এই সম্বন্ধে ভাবতে হয় বেশ কিছুটা ভিন্নভাবে।

সুলতান কথাটা আরবি ভাষার। সুলতান বলতে বুঝায় ক্ষমতা প্রাপ্ত। রাজনৈতিক অর্থে খলিফার কাছ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত। বাংলাদেশের সুলতানরা বাগদাদের খলিফার নামে মসজিদে খুৎবা পাঠ করতেন, নিজেদের নামে নয়। বাংলাদেশের অনেক সুলতানের মুদ্রায় সুলতানের নামের সঙ্গে খলিফার নামেরও উল্লেখ থাকতের দেখা যায়। এ সময় বাংলাদেশ হয়ে উঠেছিল বৃহত্তর মুসলিম বিশ্বের অঙ্গ। বাংলাদেশে মুঘল শাসনামলকে সাধারণত উল্লেখ করা হয় বাদশাহী আমল হিসাবে। কারণ, মুঘল বাদশারা কোন খলিফাকে মানতেন না। মুঘল আমলে মসজিদে খুৎবা পাঠ করা হত মুঘল বাদশাহর নামে। মুঘলরাও ছিলেন মানবধারার দিক থেকে তুর্কি। তবে তাদের মধ্যে ঘটেছিল মঙ্গলীয়ার মঙ্গলদের কিছুটা সংমিশ্রণ। এই কারণে বাবর, হুমায়ুন এবং আকবরের যে সব ছবি পাওয়া গিয়েছে তাতে তাদের চোখের বৈশিষ্ট্য হতে দেখা যায় মঙ্গলীয়। চোখ দেখে মনে হয় বাঁকা ও ছোট। মুঘল শাসনামলেও এদেশের জনসমষ্টির কতটা পরিবর্তন এসেছিল তা নিয়েও কোন গবেষণা হয়নি। তবে এদেশের মোট জনসমষ্টিতে মুঘল আমলেও যে খুব একটা বড় রকমের পরিবর্তন এসেছিল তা মনে হয় না। এদেশের সমাজ জীবন সেযুগে কেমন ছিল তার কিছুকিছু আভাস পাওয়া যায় বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ থেকে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রূপরাম চক্রবর্তী তার লেখা 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে সেকালের একটি ফৌজি মিছিলের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে–

কাল ধল রাঙ্গা টুপি সভাকার মাথে।
রামের ধনুক - শর সবাকার হাথে ॥
সকল বচনে তারা সঙরে খোদায়।
এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায় ॥
সর্দ্দার সিফাই সাজে বাহাদুর খাঁ।
গৌড়ে ইনাম যার বিশাশয় গাঁ ॥
সাজিল হাথির পিঠে বঙ্গ-মিঞা কাজী।
কর্ণের সমান দাতা রণে মর্দ্দ গাজী ॥

অতীতে এ দেশরে মুসলমানরা ফৌজ হয়ে যুদ্ধ করেছে। সেনাবাহিনীতে প্রধানত তাদেরই ছিল প্রধান্য। যুদ্ধের সময় তারা স্মরণ করেছে খোদার। যাকে তারা ভেবেছে সব শক্তির শেষ উৎস হিসাবে। মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে থেকেছে একটা সমতাবাদী মনোভাব। থেকেছে ভাগ করে খাবার ইচ্ছা। কবি তাই বলেছেন– 'এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়'। এই যুদ্ধের বর্ণনাটা আমার মনে পড়ছে একটা বিশেষ কারণে। আজকাল অনেক বাম বুদ্ধিজীবী প্রমাণ করতে চাচ্ছেন যে, মা দূর্গা হলেন বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জানি না, এরা এটা প্রমাণ করতে চাচ্ছেন কেন। আমার মনে পড়ে ১৯৭১ সালে এদেশের তরুণরা যুদ্ধ করতে অগ্রসর

www.pathagar.com

হয়েছিলেন খোদাকে স্মরণ করে। মা দূর্গাকে স্মরণ করে নয়। মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ নিয়েছিলেন, একটা হিসাব অনুসারে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল আশি হাজারের কাছাকাছি। এদের মধ্যে মাত্র দুইশত জন ছিলেন অমুসলমান। মুসলমান তরুণরা এই যুদ্ধের সময় মা দূর্গার কোন নাম নেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। খোদার কাছেই প্রার্থনা করেছেন শক্তির। খোদাকেই ভেবেছেন সকল শক্তির শেষ উৎস।

আমাদের ইতিহাসের আদিপর্ব:

ড. নিহাররঞ্জন রায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর লেখা 'বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব' গ্রন্থটি বাংলাদেশে খুবই আদ্রিত। কিন্তু এই গ্রন্থটি পড়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের আদিপর্ব সম্পর্কে আমাদের মনে যে কোন পরিস্কার ধারণা আসে, তা বলা যায় না। তিনি মধ্যএশিয়া থেকে আগত তুর্কি মুসলমানদের বাংলা জয়ের আগের ইতিহাসকে বলতে চেয়েছেন বাঙ্গালীর ইতিহাসের আদি পর্ব ; কিন্তু সে সময় বাংলাদেশ বলে কোন দেশ ছিল না। ছিল না প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা বলে কোন ভাষা। যাকে আমরা এখন বাংলাভাষা বলি, তার উদ্ভব ঘটেছে বাংলাদেশে স্বাধীন সুলতানদের শাসন আমলে। চর্যাপদ-এর ভাষাকে ঠিক বাংলাভাষা বলা যায় না। অনেকেই একে বলতে চান হিন্দি ভাষারই অংশ। এছাড়া উড়িয়া ও অহমিয়াভাষীরাও চর্যাপদকে দাবি করছেন তাদের ভাষার আদিরূপ হিসাবে। চর্যাপদের একটি পদে অবশ্য আছে–

বাজনাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

সিদ্ধার্থ ভুসুকু ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তিনি চণ্ডালীকে বিবাহ করে বাঙ্গালী হন। জানি না এর দ্বারা ঠিক কী বুঝানো হচ্ছে। বাংলাদেশ কি সেই সময় বিশেষভাবেই বিবেচিত ছিল চণ্ডাল তথা নমশূদ্রদের দেশ হিসাবে ? নমশূদ্ররা হিন্দু সমাজে কিছুদিন আগেও ছিলেন অস্পৃশ্য জনসমষ্টি হিসাবে বিবেচিত। যদিও নমশূদ্ররা আসলে হলেন খুবই কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান জনসমষ্টি। এরা হলেন উন্নত কৃষিজীবী। এবং নৌচালনায় যথেষ্ট দক্ষ। এদের গায়ের রং যথেষ্ট কালো। চেহারার বেশ কিছু মিল আছে ইন্ডো-অস্ট্রালয়েড মানবধারার মানুষের সঙ্গে। সিদ্ধার্থ ভুসুকুকে ধরা হয় খৃস্টীয় একাদশ শতকের লোক হিসাবে। যখন বিশ্বে ইসলাম একটি উদীয়মান শক্তি হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছে। এবং সৃষ্টি করে চলেছে নতুন সভ্যতা। কিন্তু নিহাররঞ্জন রায়ের লেখাতে থাকতে দেখা যায় না এর কোন স্বিকৃতি। আরব মুসলমানরা মধ্য এশিয়ায় চীনাদের কাছ থেকে কাগজ বানাতে শেখেন। কাগজের উপর শুরু হয় কালি কলম দিয়ে লেখা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'কাগজ' ও 'কলম' দুটিই আরবি শব্দ। তুর্কি

www.pathagar.com

মুসলমানগণ মধ্য এশিয়া থেকে উত্তর ভারত ও বাংলাদেশে নিয়ে আসেন কাগজ তৈরির কৌশল। এর আগে বাংলাদেশে তালপাতায় লেখা হত পুথিপত্র। আর তা লেখা হত ধাতু শলাকা দিয়ে। লেখা ছিল কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু মুসলিম শাসন আমলে এই অসুবিধা আর থাকে না। স্যার যদুনাথ সরকার ছিলেন একজন খুবই নামকরা ঐতিহাসিক। তাঁর লেখা একটি বই হল India Through the Ages। তিনি তাঁর এই বহুল পঠিত বইয়ের একটি জায়গায় বলেছেন- পুরাকালে হিন্দু লেখকগণ যখন সাধারণত তাদের লেখা লুকিয়ে রাখা পছন্দ করতেন, তখন পুস্তকের নকল ও প্রচার করে জ্ঞান বিস্তারে সহায়তা করবার উদ্যোগের জন্য আমরা মুসলমানদের কাছে ঋণী (ইংরেজি থেকে বাংলা)। বাংলাদেশেও এটা সুলতানী ও বাদশাহী আমলে ঘটেছিল। এসব কথা এখন আর বিশেষ আলোচনা করা হচ্ছে না।

ইসলাম এদেশের ধর্ম চেতনায় দিতে পেরেছে কিছুটা সাধারণ পরিচ্ছন্নতা। হিন্দুরা নানা দেবদেবীর মুর্তি গড়ে পূজা করে থাকেন। কিন্তু তারা ভগবানের মূর্তি গড়ে কোন পূজা করেন না। মনে হয় তাদের ভগবানের ধারণার উপর পড়তে পেরেছে ইসলামের নিরাকার শ্রষ্ঠার ধারণার প্রভাব। যে কারণে ভগবানের কোন বিশেষ মূর্তি গড়ে পূজা প্রশ্রয় পেতে পারেনি।

বাংলাদেশে সুলতানী আমলে উদ্ভব হতে পেরেছিল একটি বিশেষ স্থাপত্যরীতি। মধ্য এশিয়া থেকে বাংলাদেশে এসময় আসে গুম্বুজ ও প্রকৃত খিলান তৈরির কায়দা। যার প্রভাব পড়ে সুলতানী আমলের গৌড়ীয় স্থাপত্যে। মুসলমানরা মূর্তি গড়া পছন্দ করেননি। মসজিদের দেয়ালে তারা আঁকেননি কোন মানুষের অথবা জীবজন্তুর ছবি। তারা মসজিদের দেয়াল অলংকৃত করেছেন ফুল, লতা পাতা ও জ্যামিতিক আকার আকৃতির সাহায্যে কৃত নকশাকলা দিয়ে। পোড়ামাটির ইটে নকশা করা ছিল এদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। মুসলিম শাসনামলে পোড়া মাটির নকশা নিতে পারে একটি ভিন্নরূপ। এই নকশাকলার প্রভাব শেষে যেয়ে পৌঁছায় হিন্দু মন্দিরেও। হিন্দু মন্দিরে পড়ে মুসলিম স্থাপত্যরীতির ছাপ। মন্দির গড়া হয় খিলান করে। খিলানের নিম্নভাগ সমতল না করে অনেক ক্ষেত্রে করা হয় ঢেউ খেলানো। যেটাও হল মুসলিম স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের জাতিসত্তাকে উপলব্ধি করতে গেলে ইসলামকে বাদ দিয়ে সম্ভবপর হতে পারে না। ইসলাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়েছে এদেশের জাতিসত্তায়। ইসলামকে বলা চলে এদেশের জাতি গঠনের বিশেষ উপাদান (Ethno-formative factor)।

আমরা বিবিধ তথ্য প্রদান করতে যেয়ে অনেক কিছুর উল্লেখ করলাম। সংক্ষেপে বলতে যেয়ে অনেক কথা আসলো যথেষ্ট ভিড় করে। এখানে যা বলা হল তার প্রত্যেকটি বিষয় নিয়ে লেখা যেতে পারে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ। আমরা মনে করি বাংলাভাষী মুসলমান না থাকলে আজকের পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভব হতে পারত না। আজকের বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বাকে বুঝতে হলে তাই বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে

www.pathagar.com

বাংলাভাষী মুসলমানের মন-মানসিকতা। বাংলাদেশের মুসলমান জনসমাজ কেবলমাত্র একটি ধর্ম সম্প্রদায় নয়। তাদের ওপরই প্রধানত নির্ভর করছে এদেশের পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির লক্ষ্য হলো একটা জাতিকে শক্তিশালী করে গড়া। আর সেটা করতে হলে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হয় একটা জাতির জাতিসত্তার বিশেষতা সমুহকে। আমরা এই বিশেষতা জানবার কিছুটা চেষ্টা করলাম। এই জানবার ক্ষেত্রে গ্রহণ করতে চেয়েছি ইতিহাসের পদ্ধতি। অতীতের অস্তিত্ব বর্তমানকে এবং বর্তমান ভবিষ্যতকে অনেক পরিমাণেই নিয়ন্ত্রিত করে। যদিও বা সর্বত ভাবে নয়। তবে ইসলাম হল আমাদের রাজনীতির ভিত্তিভূমি।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগে একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেছেন– এটা আমার কাছে অজানা নয় যে, অনেক মানুষ এরকম মত পোষণ করেছে ও আজও করে যে, পার্থিব ঘটনাবলী এমনভাবে ভাগ্য ও ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে, মানুষ তাদের বিচক্ষণতা দিয়ে তাদের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। এই কারণে এইসব মানুষের মনে ধারণা জন্মেছে যে, এর কোন প্রতিকার নেই। তা রোধের জন্য পরিশ্রম করা হল অর্থহীন। কিন্তু আমি মনে করি, এটা সত্য হলেও হতে পারে যে, নিয়তি আমাদের অর্ধেক কাজগুলিকে শাসন করে। আর বাকি কাজগুলিকে আমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেয়। এর তুলনা আমি করব, প্রচণ্ড বেগে ধাববান নদী প্রবাহের সঙ্গে। যে নদী দুর্দান্ত হলে সমভূমি নিমগ্ন করে গাছপালা বাড়িঘর ভুপতিত করে এক স্থানের মাটি আর এক স্থানে নিয়ে যায়। প্রত্যেকে তার সামনে থেকে পালায়। কিন্তু তবুও, এরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, যখন তা শান্ত থাকে তখন মানুষই আবার তার বুকে বাঁধ বাধে, তৈরি করে পাড়; যাতে করে পানি স্ফিতি ঘটলে, সে হয় একটা খাদ দিয়ে প্রবাহিত হবে কিংবা তার প্রবাহ তত বন্য ও বিপদজনক হবে না। ভাগ্যের ব্যাপরটাও হল সেই রকম। (নিকোলো মেকিয়াভেলি; Il Principe, 1513)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

আত্মদর্শন

অনেক সময় কারো লেখা পড়তে পড়তে পাঠকের মনে লেখকের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা জাগে। বর্তমান পুস্তকটি পড়তে যেয়েও আমার সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা জাগতে পারে। তাই আমি আমার নিজের সম্বন্ধে দু কথা বলছি। আজ থেকে প্রায় তিরাশি বছর আগে রাজশাহী শহরে জন্মেছিলাম আমি। আমি লেখাপড়া করেছি রাজশাহীতে স্কুলে ও কলেজে। রাজশাহী শহরের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ আমার মন মানসিকতা গঠন করেছে। রাজশাহী বড় শহর ছিল না। আমি যখন স্কুলে পড়ি, তখনও এ শহরে বাঘ আসত। এই শহরের কাছে খুব ঘনঘন না হলেও শিরোইল নামক এলাকায় ছিল যথেষ্ট বন। যেখানে ছিল চিতাবাঘ। এই শহরে ছিল প্রচুর সাপ। যাদের অনেকেই ছিল বিষধর। শহরের কাছেই একটা এলাকায় অনেক অজগর সাপ ছিল। যারা খরগোশ গিলে খেত। অন্যদিকে রাজশাহী শহরে ছিল একটা প্রথম শ্রেণির কলেজ। আর ছিল বরেন্দ্র মিউজিয়াম। এখানে ছিল একটা শিক্ষার পরিবেশ। যা আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি বহু বিষয়ে ঘরে পড়াশোনা করে জানতে চেয়েছি। অনেক বিষয়ে ছিল আমার জানবার আগ্রহ। আমি আমার বাল্যকাল থেকেই জানতে আগ্রহি ছিলাম মানুষ সম্বন্ধে। ইচ্ছা ছিল নৃ-তত্ত্ব পড়বার। কিন্তু সেটার সুযোগ ঘটেনি। আমি ঢাকায় যেয়ে তেজগাঁ কৃষিশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়েছিলাম কৃষিবিদ্যা। তারপর বিলাতে যাই উদ্ভিদের রোগ-ব্যারাম সম্পর্কে পড়াশোনা করতে। বিলাতের লিড্‌স শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলাম উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব। বিলাতে ছিলাম মাত্র এক বছর। তবে এই এক বছর আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিল। আমাকে আমার পিতা তাঁর একটি বাড়ি বিক্রি করে যে টাকা পেয়েছিলেন, তা দিয়ে পাঠান বিলাতে। সেটা ১৯৫৪ সালের কথা। বিলাতে আমার আরো পড়বার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেটা হয়ে ওঠেনি অর্থের অভাবে। পাকিস্তান সরকার মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটায়। ছাত্র হিসাবে আমি মেধাবী ছিলাম না। মানুষ হিসাবেও ছিলাম না খুব করিতকর্মা। ফিরে আসি দেশে। ঢাকায় পাট গবেষণাগারে একটি চাকরি পায়। সেখানে চাকরি করি প্রায় চার বছর। ছেলেবেলা থেকে ফরাসী ভাষা শেখার প্রতি আমার একটা আগ্রহ ছিল। নিজের চেষ্টায় কিছু ফরাসী ভাষা শিখেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসী ভাষায় একটা সার্টিফিকেট কোর্স করেছিলাম। আমি ১৯৬০ সালে ফরাসী সরকারের দেওয়া একটা বৃত্তি নিয়ে ফ্রান্সে যাই আরো পড়াশুনা করতে। সেখানে যেয়ে অর্জন করেছিলাম পোয়াতিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জীবাণুতত্ত্বে ডক্টরেট। ফ্রান্স থেকে দেশে ফিরে চাকরি নিই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে; ১৯৬৪ সালে ১১ সেপ্টেম্বর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটানা অধ্যাপনা

www.pathagar.com

করেছি প্রায় বত্রিশ বছর। আমি উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ছাত্রদের পড়িয়েছি উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব। এক পর্যায়ে পড়িয়েছি জীবাণুতত্ত্ব। বর্তমান বইতে যে বিষয় নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তার সঙ্গে আমার অধ্যাপনার বিষয়ের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

রাজশাহী শহরের কাছে, শহর থেকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে ছিল সাঁওতালদের গ্রাম। সাঁওতালরা বন থেকে কাঠ কেটে খড়ি করে বেচতে শহরে আসতো। সাঁওতালদের সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা হয়। আমার হাতের কাছে যে সব বই পাই, সেগুলি পড়েফেলি। আমি নৃ-তত্ত্ব বিষয়ে অনেক বই পড়ি। শেষে নৃ-তত্ত্ব নিয়ে লিখে ফেলি একটি ছোট বই। বইটি বাজারে বেশ বিক্রি হয়েছিল। এসব কথা বলছি এই জন্যে যে, আমি যদিও ছিলাম কর্ম জীবনে উদ্ভিদবিদ্যার লোক, কিন্তু বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিলাম নৃ-তত্ত্বের প্রতি। আমার অবসর সময় কেটেছে নৃ-তত্ত্ব সম্পর্কে নানা জনের লেখা বই পড়ে। বর্তমান বইতে যা আলোচনা করেছি, তাতে আছে আমার এই অনানুষ্ঠানিক পড়াশুনা করে অর্জিত জ্ঞানের প্রভাব। আমি কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি নই। কিন্তু অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির দ্বারা আমি হয়েছি প্রভাবিত। যে সব কালজয়ী প্রতিভাবান ব্যক্তি আমাকে প্রভাবিত করেছেন তাদের মধ্যে একজন কার্ল ফন লিনে (১৭০৭-১৭৭৮)। ইনি ছিলেন সুইডিস। কিন্তু সুইডিস ভাষায় বই না লিখে, তার সময়ের পণ্ডিতদের মত বই লিখেছেন লাতিন ভাষায়। লিনে (Linne) নামটা লাতিন ভাষায় হয়েছে Linnaeus| আমরা বাংলাভাষায় নামটিকে ইংরেজি বর্ণে সাধারণত লিখি লিনিয়াস। লিনিয়াস চেয়েছেন সব কিছুকে তার বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করে আলোচনা করতে। তিনি গাছপালা ও জীবজন্তুকে শ্রেণীবদ্ধ করে আলোচনা করেছেন। শ্রেণীবদ্ধ করে আলোচনা করেছেন আকরিক বস্তুসমূহকে। আর এর জন্য তিনি হয়ে আছেন বিশেষভাবে খ্যাত। লিনিয়াস কখনো আসেননি বাংলাদেশে। কিন্তু বাংলাদেশের বটগাছের নাম তিনি দিয়েছেন Ficus bengalensis| তাঁর দেওয়া বট বৃক্ষের এই নামটি আজো বিজ্ঞানী সমাজে স্বীকৃত হয়ে আছে। তাঁর দেওয়া লাতিন ভাষায় Ficus মানে ডুমুর। লিনিয়াসের দেওয়া বটগাছের নামের বাংলা করলে দাঁড়ায় বাংলাদেশের ডুমুর গাছ। বটগাছের ফল আর ডুমুরগাছের ফল দেখতে প্রায় একই। যে ডুমুরগাছ দেখেছে কিন্তু বটগাছ দেখেনি, সে ডুমুরগাছের সঙ্গে বটগাছের তুলনা করে মনের মধ্যে বটগাছ সম্পর্কে কিছু ধারণা পেতে পারবে। মানুষ সব সময় চায় তার পরিচিত কিছুর সঙ্গে তুলনা করে অপরিচিতকে বুঝতে। লিনিয়াস পেশায় ছিলেন চিকিৎসক। চিকিৎসক হিসাবে তিনি ছিলেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ করে আলোচনা করবার চেষ্টা করেছেন উদ্ভিদ, প্রাণী ও আকরিক বস্তুদের। আর সে জন্যেই পেতে পেরেছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। লিনিয়াস তার বিখ্যাত Systema naturae (1758) নামক গ্রন্থে মানুষকে স্থাপন করেছেন প্রাইমেটস (Primates) বর্গে। আর মানুষের নাম রেখেছেন Homo sapiens। লাতিন ভাষায় 'হোম' মানে হল মানুষ। আর 'সেপিয়েন্স' মানে হলো জ্ঞানী। মানুষ এমন প্রাণী, যে

www.pathagar.com

জ্ঞান অর্জনের ক্ষমতা রাখে। জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। মানুষ প্রাণী। কিন্তু এদিক থেকে সে হলেন অন্য প্রাণীদের থেকে স্বতন্ত্র। লিনিয়াস মানুষকে চারটি বড় প্রকারে ভাগ করেন প্রধানত গাত্রবর্ণকে নির্ভর করে। এরা হল, ইউরোপের সাদা মানুষ, এশিয়ার পিতাভ মানুষ, আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষ আর আমেরিকার লালচে মানুষ। লিনিয়াসকে ধরতে হয় নৃতত্ত্বের জনক। লিনিয়াস কেবল মানব প্রকারের কথা বলেননি, লিনিয়াস লোক-সংস্কৃতি (Folklore) সম্বন্ধে করেছেন প্রথম আলোচনা। বিরাট প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন লিনিয়াস। নানা বিষয়ে কৌতুহল ছিল তার। আমি একজন অতি সাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু লিনিয়াসের সম্বন্ধে আমার ছিল নানা বিষয়ে কৌতুহল। সাধারণভাবে জানতে চেয়েছি অনেক কিছু। যা জেনেছি, তা নিয়ে লিখেছি জনপ্রিয় প্রবন্ধ; মূলত অনানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে। আমাকে কেউ শিক্ষাবিদ বললে আমি খুশি হই। কারণ, আমি চেয়েছি আমার দেশবাসীকে শিক্ষিত হতে সাহায্য করতে, আমার লেখার মাধ্যমে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করতে যেয়ে আমি বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপকদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েছি। তাঁদের কাছ থেকে আমি শিখবার সুযোগ পেয়েছি অনেক কিছু। বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি না করলে সে সুযোগ আমি পেতে পারতাম না। আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর পেয়েছি ১৯৯৫ সালে। যাদের সঙ্গে জন্মেছিলাম, তাদের অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই। আমি অনেক সময় বাল্য বন্ধুদের আমার লেখা পড়তে দিতাম। জানতে চাইতাম তাদের মতামত। কিন্তু এখন আর সেই সুযোগ নেই। কদিন পরে আমিও মিলিয়ে যাব পঞ্চভুতে। কোন বইতে পড়েছিলাম, Christen J. Darkenbug (1626-1772) নামে ডেনমার্কের একজন ব্যক্তি বেঁচে ছিলেন প্রায় ১৪৬ বছর। বিলাতের Henry gunkins (1501-1670) বেঁচে ছিলেন ১৬৯ বছর। এরকম দীর্ঘায়ু জীবন অতি বিরল ঘটনা। আমার বয়স এখন নব্বইয়ের কোঠায়। অসুস্থ আমি। বিছানায় শুয়ে আমার কাটছে দিন। বিলাতের কবি ব্রাউনিং লিখেছেন-

Grow old along with me
The best is yet to be
The last of life
For which the fast was made.

কবি বোঝাতে চেয়েছেন, বৃদ্ধ বয়সেরও আছে একটা বিশেষ অর্থ। যেটাকে খাটো করে দেখা উচিত নয়।

কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে বেঁচে থাকাটা আমার কাছে হয়ে উঠেছে কষ্টচিত। লিনিয়াস মানুষকে চিহ্নিত করেছেন বুদ্ধিমান প্রাণী হিসাবে। তবে বুদ্ধি থাকবার জন্যে মানুষ কতটা সুখী হতে পারে তা নিয়ে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে জাগছে প্রচুর সংশয়। মানুষ গড়েছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রে হচ্ছে যুদ্ধ। সব জাতি তাদের প্রতিরক্ষা খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে, অন্যকোন খাতে সে পরিমাণ নয়। অন্য প্রাণী যুদ্ধ করে না কিন্তু

www.pathagar.com

মানুষ যুদ্ধ করে। এক গাছে অনেক কাক বাস করে। যদি কোন কাক বৃদ্ধ বয়সে অক্ষম হয়ে পড়ে, বিশেষ করে অন্ধ হয়ে গেলে, সেই গাছের অন্য কাকরা তাকে খাদ্য এনে খাওয়ায়। কাকদের মধ্যে কোন রাষ্ট্র নেই। কিন্তু সহজাতভাবে কাজ করে চলেছে সমাজ কল্যাণের একটা ধারণা। আমাদের পত্রিকায় এখন প্রতিদিন খবর বের হচ্ছে নারী নির্যাতনের। কিন্তু অন্য প্রাণীদের মধ্যে নারী নির্যাতনের এরকম ঘটনা ঘটে না। মেয়ে মাকড়সারা যৌন মিলনের পর, পুরুষ মাকড়সাকে খেয়ে ফেলে। কিন্তু অধিকাংশ প্রাণীর মধ্যে এরকম ঘটনা ঘটে না। অন্য প্রাণীদের মধ্যে পুরুষ তাদের নারীদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে না। আসলে পাশবিক অত্যাচার কথাটা বলাই ভুল। পশুরা, তাদের স্ত্রী জাতির উপর পাশবিক অত্যাচার করবার কোন প্রয়োজন দেখে না। অধিকাংশ প্রাণীর বাচ্চা হয় বছরের বিশেষ সময়। আর তাদের পুরুষদের যৌন উত্তেজনার সূচনা হয় বিশেষ সময়ে। সারা বছর তারা থাকে যৌন প্রবণতাবিহীনভাবে। অনেক প্রাণী সমাজবদ্ধভাবে বাস করে। কিন্তু তাদের সমাজ বন্ধন গড়ে ওঠে তাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে নির্ভর করে। আমার মনে হয়, মানুষ পৃথিবীতে বিলুপ্ত হতে পারে কোন প্রাকৃতিক কারণে নয়, তার বুদ্ধির কারণেই। প্রাকৃতিক জগৎ নয়, মানুষের কাছে মানুষই হল সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিভাগে চাকরি করেছি। উদ্ভিদজগত প্রাণীজগত থেকে ভিন্ন। বৃক্ষের নেই প্রাণীদের মতো স্নায়ুমণ্ডলী। নেই প্রাণীদের মত কোন আনন্দ ও বেদনার অনুভব। লিনিয়াস বলেছেন, আকরিক বস্তুরা কেবলই আছে; তাদের মধ্যে নেই প্রাণের স্পন্দন। উদ্ভিদরা জীবন্ত। কিন্তু তাদের নেই কোন অনুভব ক্ষমতা। যেমন আছে প্রাণীদের। মানুষ হল একমাত্র প্রাণী, যে কেবল অনুভব করে না; যে ভাবনা চিন্তা করে। ভাবনা চিন্তা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করতে চায় তার জীবনকে। কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সে আমি হয়ে উঠেছি যথেষ্ট সংশয়বাদী। আমার মনে হয় মানুষের বুদ্ধি, মানুষের কার্যকলাপ মানুষের বিলুপ্তি এনে দিতে পারে।

লিনিয়াসের মত মেধার অধিকারী আমি নই। কিন্তু তাঁর দ্বারা প্রভুতভাবে ছাত্রজীবনে হয়েছি প্রভাবিত। আমার মনমানসিকতা গঠনে থেকেছে তাঁর প্রভাব। আমি বই লিখেছি চারুকলার ইতিহাস নিয়ে, বই লিখেছি নৃতত্ত্ব নিয়ে, বই লিখেছি গাছপালার ব্যাধি, জীবাণুতত্ত্ব ও উদ্ভিদ-রসায়ন নিয়ে। আমি চারুকলার ইতিহাস নিয়ে বই লিখেছি কারণ, ছেলেবেলায় আমার ইচ্ছা ছিল চিত্রকর হবার। কিন্তু পরে উপলব্ধি করি, আমি এর ওপর নির্ভর করে জীবন-যাপনে সক্ষম হব না। তাই ত্যাগ করি চিত্রকর হবার বাসনা। কিন্তু চারুকলার ওপর একটা আসক্তি থেকে যায়। বই লিখি চারুকলার ইতিহাস নিয়ে। মানুষ তার চারুতার সাধনায় ফুল, লতাপাতা দিয়ে নকশা রচনা করেছে। উদ্ভিদজগত মানুষের চিত্রকলায় জুড়েছে অনেক স্থান। হতে পারে এটাও আমাকে অনেক পরিমাণে উদ্ভিদজগতের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। মানুষকে

www.pathagar.com

স্থাপন করা হয় প্রাইমেটস বর্গে। এই বর্গের প্রাণীরা এখনও অধিকাংশই হলো বৃক্ষচারী, যারা হাত-পা দিয়ে জড়িয়ে গাছে উঠতে পারে।

অনেককিছু ঘটতে দেখলাম আমার এক জীবনে। বিরাট বৃটিশ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হলো। পাকিস্তান হবার সময় একটা হিসাব অনুসারে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা করে মারা যায় তিন লক্ষ মানুষ। আর কয়েক মাসের মধ্যে গৃহহীন উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে প্রায় এক কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষ। ১৯৭১ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ভারত তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান থেকে রিফিউজি হয়ে ভারত যায় প্রায় নব্বই লক্ষ মানুষ। এদের মধ্যে ৭০ লক্ষ ছিল বাংলাভাষী হিন্দু, আর ২০ লক্ষ ছিল বাংলাভাষী মুসলমান। এ সময় কত লোক মারা যায়, তা নিয়ে চলেছে বিতর্ক। আমি তার মধ্যে যেতে চাই না এখানে। আমি আমার আত্মপরিচয় দিতে যেয়ে এসব কথা বলছি। কারণ, এসব ঘটনা আমাকে প্রভাবিত করেছে বিপুলভাবে। আর আমার মনে এগুলো সৃষ্টি করেছে গভীর প্রতিক্রিয়া; যা আমি লিখে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছি পত্র-পত্রিকায়। কারণ আমি চাই না এরকম ভয়াবহ ঘটনার পৌনঃপুনিকতা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে যুদ্ধ হয় না। যুদ্ধ হয় না নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে। নরওয়ে এক সময় ছিল ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত। পরে সে যুক্ত হয় সুইডেনের সঙ্গে। নরওয়ে সুইডেন থেকে পৃথক হয়েছে ১৯০৫ সালে। কিন্তু নরওয়ে ও সুইডেনে কোন বিবাদ ঘটছে না। নরওয়ে আগে ছিল ডেনিস ভাষাভাষি কিন্তু পরে গড়েছে একটি পৃথক জাতীয় ভাষা, নিজেদের পৃথক করে তুলবারই লক্ষ্যে। ভৌগলিক এলাকা (Territory), জনসমাজ (Population), সরকার (Government) এই তিনে মিলে হল রাষ্ট্রের বাস্তবতা। যে কোন রাষ্ট্রের বিশেষতাকে বুঝতে হলে জানতে হয় তার উদ্ভবের ইতিহাস। উপলব্ধি করতে হয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত মানুষের মনোভাবকে। আমি সেটা চেষ্টা করেছি বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। আমার মনন কাঠামো অন্যের কাজে আসবে কি না, আম তা জানি না। তবে আমার ধারণা সকলের না হলেও, অনেকের তা কাজে লাগবে। আমি রাজনীতির লোক নই। কিন্তু আমি জন্মেছি একটা বিশেষ জনসমষ্টির মধ্যে। যাদের জাতিসত্তার সরূপ নিয়ে ভাবাটায় প্রাসঙ্গিক। কারণ, এর সঙ্গে জড়িত থেকেছে আমার নিজের আত্মপরিচয়েরও প্রশ্ন। নিজেকে জানতে আমার ইচ্ছা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমি না ভেবে পারিনি।

১৯৭১ সালে আমি কলকাতা ছিলাম কিন্তু কেবলমাত্র কলকাতার মধ্যেই আমার গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল না। আমি পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জেও কিছু ঘুরেছিলাম। মিশেছিলাম পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলমানদের সঙ্গে। উপলব্ধি করেছিলাম তাদের মন মানসিকতাকে। অনেকে এই উপমহাদেশের হিন্দু- মুসলীম বিরোধকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে। কিন্তু বিষয়টা অত সহজ নয়। হিন্দুরা

www.pathagar.com

ধনী। মুসলমানরা গরীব। তাই সৃষ্টি হতে পেরেছে হিন্দু-মুসলমান সংঘাত, এরকম সিদ্ধান্তে আসা আমার কাছে মনে হয়েছে খুবই সরল বুদ্ধিবাদীতা। এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের একজন খ্যাতনামা নৃ-তাত্ত্বিক লিখেছেন– 'এমন অনেক গ্রাম পশ্চিমবঙ্গে আজও আছে, সেখানকার বসতি বিন্যাসের মধ্যে বর্ণ প্রাধান্য স্পষ্টরূপে দেখা যায়। কিন্তু শ্রেণী প্রধান্য (যা শহরে দেখা যয়) বিশেষ দেখা যায় না। অন্তত শহরের মতো বসতি বিন্যাসের মধ্যে তা প্রতিফলিত নয়। একই বর্ণের ও জাতি-উপজাতির ধনী-মধ্যবিত্ত-দরিদ্রের বাস এক-অঞ্চলে। পরিস্কার বোঝা যায়, জাতি বর্ণ ও সম্প্রদায়ের (হিন্দু-মুসলমান) সামাজিক দূরত্ব আধুনিক শ্রেণী দূরত্বের চেয়ে অনেক বেশি দুস্তর.....।'(বিনয় ঘোষ; বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব। পৃষ্ঠা-৭১। বইটি প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে ১৯৭৯ খৃস্টাব্দে।) বিনয় ঘোষ তাঁর বইতে পশ্চিমবাংলার পটুয়া ও পটশিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। পটুয়াদের জীবিকার উপায় হল, পট আঁকা ও মানুষকে তা দেখিয়ে গান করে কাহিনী বলা। পটের ছবির সাথে তাদের গান ও কাহীনির থাকে যোগসূত্র। পটুয়ারা এক অদ্ভুত সম্প্রদায়। এরা নামাজ পড়ে আবার বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর পূজাও করে। এরা মৃত দেহ কবর দেয়। কিন্তু কবর দেবার আগে আবার তাদের মুখাগ্নীও করে। অর্থাৎ মুখে দেয় আগুনের ছোঁয়া। এরা পৃথক গ্রাম গড়ে বাস করে। এবং এদের ছেলে মেয়ের বিয়ে হয় কেবল নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন- পটুয়ারা এখন হিন্দু ধর্মের রীতিনীতি বাদ দিয়ে হতে চাচ্ছে খাঁটি মুসলমান। তিনি অনুসন্ধান করে জেনেছেন, পটুয়াদের এই মনোভাব পরিবর্তনের কারণ হল ইসলামী রীতিনীতি অনুসরণ করবার ফলে তারা প্রবিবেশী অন্য মুসলিম সমাজের কাছে থেকে পেতে পারে অনেক সদয় ব্যবহার। পটুয়ারা তাদের বলেছে হিন্দু হলে, তাদের বিবেচনা করা হয় অতি নিম্নবর্ণের হিন্দু হিসাবে। তাদের ধরা হয় অস্পৃশ্য। তারা হিন্দুদের কাছ থেকে পায় না কোন 'মানুষের মত' ব্যবহার। পক্ষান্তরে মুসলমান হলে তাদের মুসলমান সমাজে অচ্ছুত ভাবা হয় না। তারা পেতে পারে অনেক মানবিক ব্যবহার (দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষের বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব, পৃষ্ঠা-১১৮)। আমি পটুয়াদের কথা বিশেষভাবে বলছি, কারণ বাংলাদেশের শিল্পী কামরুল হাসান এদেশের চিত্রশিল্পীদের উপদেশ দিয়েছিলেন, পটুয়া হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে। তার মতে শিল্পীদের পটুয়া পরিচয় হবে অনেক বেশি বাঙালি। বাংলাদেশে এখন আর পটুয়া সম্প্রদায় নেই। কিন্তু এক সময় নিশ্চয় ছিল। ঢাকার পটুয়াটুলী এলাকা যার স্মৃতি বহন করছে। বাংলাভাষায় 'টুলি' শব্দটা এসেছে হিন্দি টোলি শব্দ থেকে। হিন্দিতে টোলি শব্দের অর্থ হল পল্লী। পটুয়াটলী মানে হল, পটুয়াদের পল্লী। পটুয়ারা এক সময় সারা বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলেই ছিল ছড়িয়ে ছিটিছে। বিনয় ঘোষের মতে পটুয়াদের চিত্রকলায় আছে মুসলিম ক্যালিওগ্রাফীর দৃঢ় ও বলবান তুলির রেখা বিস্তারের প্রভাব।

www.pathagar.com

কথায় কথায় অনেক কথা এসে পড়ছে। কামরুল হাসান সাহেব কেবল একজন শিল্পীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন, আওয়ামী লীগের বাঙালি জাতীয়তাবাদের একজন গোড়া ভক্ত। তিনি ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এঁকেছিলেন একটি কার্টুন। যা এখনো যথেষ্ট খ্যাত হয়ে আছে। আমি কামরুল হাসান সাহেবকে যথেষ্ট ভালভাবে চিনতাম। তার সঙ্গে আমার ছিল ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ঐ কার্টুনটিকে কার্টুন হিসাবে আমার কাছে খুব উন্নতমানের মনে হয়নি। তিনি চারুকলার চাইতে কারুকলার ক্ষেত্রে দিয়েছেন অনেক বেশি কৃতির পরিচয়। আমি তার দৃষ্টিতে ইয়াহিয়াকে বিচার করতে চাইনি। আমার কাছে মনে হয়েছে, ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন সাবেক পাকিস্তানের সৃষ্ট সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধান। তিনি সাবেক পাকিস্তানে চেয়েছিলেন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তাই তিনি করতে সক্ষম হয়েছিলেন ১৯৭০ সালে একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন।

আমি ঢাকা ছেড়েছি অনেকদিন। ঢাকার বুদ্ধিজীবী সমাজের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই। আমি পত্র পত্রিকায় লিখি একজন ফ্রি ল্যান্স (Free-lance) হিসাবে। কিন্তু ঢাকার একটি প্রকাশনী সংস্থা 'বুকমাস্টার' স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার বর্তমান বইটি ছাপিয়ে প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এদের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় ছিল না। আর এখনও যে আছে, তা নয়। এরা যে আমার মত একজন অপরিচিত ব্যক্তির বইটি ছাপাচ্ছেন, সে জন্যে আমি এদের জানায় আন্তরিক ধন্যবাদ। ভাল প্রকাশকরা বই প্রকাশ করে লেখকদের প্রকাশিত করেন। ভাল প্রকাশকরা সমৃদ্ধ করে তোলেন একটা দেশের লেখার জগতকে।

***

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ২

আমাদের জাতিসত্তার উৎস সন্ধানে

লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক নয়াদিগন্ত পত্রিকায় ২০১৫ সালের জুলাই মাসে। বর্তমানে লেখাটি এখানে সংযুক্ত করা হচ্ছে জাতি ও উপজাতি সমস্যাকে বুঝতে সহায়ক হবে, বিধায়। কারণ, এই প্রবন্ধে থাকছে আমাদের জাতিসত্তা সম্পর্কে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু আলোচনা।

৬০০ হিজরিতে মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খালজি বর্তমান বাংলাদেশের একটা বিস্তীর্ন অঞ্চল দখল করেন। ৬০০ হিজরিকে ধরা চলে ১২০৩ খৃস্টাব্দ। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস এখনও যথাযথভাবে পরিক্ষীত হয়নি। তবে নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তুপের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে খলিফা হারুন আর রশিদের মুদ্রা। ময়নামতি বৌদ্ধ বিহারের মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে পরবর্তীকালের আব্বাসী খলিফাদের মুদ্রা। এ থেকে অনুমান করা চলে আরব মুসলমান বনিকগণ এদেশে ব্যবসা করতে আসতেন। তবে তারা এদেশে ইসলাম প্রচারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ এখনো পাওয়া সম্ভব হয়নি। বাগেরহাট জেলায় রয়েছে বিখ্যাত ষাটগম্বুজ মসজিদ। ঐ অঞ্চলে নিশ্চয় এক সময় ছিল বেশকিছু মুসলমানের বসতি। না হলে অত বড় মসজিদ নির্মাণ সেখানে প্রয়োজন হত না। বাগের হাট সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলেরই অন্তর্গত। বাংলাদেশে বিশেষ করে তার উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে এক সময় ছিল মহাযান বৌদ্ধদের বাস। কিন্তু এখন বাংলাদেশে মহাযান বৌদ্ধরা আর নেই। অনেকে অনুমান করেন যে, এইসব বৌদ্ধরা ইসলাম গ্রহণ করে হয়ে পড়েন মুসলিম সমাজের অংশ। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেবল বাংলাদেশ নয়, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতেও দলে দলে মহাযান বৌদ্ধরা গ্রহণ করেন ইসলাম। বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এখন বাস করেন সর্বাধিক সংখ্যক মুসলমান ধর্মাবলম্বী মানুষ। বাংলাদেশে মধ্য এশিয়া থেকে এসেছিলেন বিন বখতিয়ার। কিন্তু মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়াতে বাইরে থেকে কোন মুসলিম শক্তি যেয়ে রাজত্ব বিস্তার করেননি। এখানে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে, কোন প্রকার তরবারির সাহায্য ছাড়ায়। ইসলামের এই বিস্তার যথেষ্ট বিস্ময়কর। ইসলাম ধর্মে এমন কিছু আছে যা এই অঞ্চলের মানুষকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। আমরা জানি, বাংলাভাষায় যতলোক কথা বলেন, তার মধ্যে প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ থাকেন বর্তমান বাংলাদেশে। আর বাকি শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ থাকেন ভারতে। ভাষা আমাদের জাতিসত্তায় একটি খুবই মূল্যবান

www.pathagar.com

উপাদান। কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়। যদি তা হত, তবে সম্ভব হত সব বাংলাভাষাভাষী মানুষের একটি মাত্র রাষ্ট্রিক পতাকা তলে আসা। তবে সেটা সম্ভব হয়নি। কেন না, বাঙালি হিন্দুরা সব সময়ই চেয়েছেন ভারতীয় মহাজাতির অংশ হয়ে বাঁচতে। কিন্তু বাংলাভাষী মুসলমান তা চাননি। চাননি বলেই তারা শেষ পর্যন্ত গড়তে পেরেছেন আজকের বাংলাদেশ রাষ্ট্র। আজকের রাষ্ট্র বাংলাদেশের ভিত্তি হল বাংলাভাষী মুসলমান। তারা না থাকলে কোন পৃথক স্বাধীন বাংলাদেশ হত না। বাংলাদেশে তারা একটি ধর্মসম্প্রদায় মাত্র নন; তারাই হলেন এদেশের রাষ্ট্রিক বুনিয়াদ। আমদের জাতিসত্তার বিশ্লেষণে ইসলামকে তাই বাদ দেয়া যায় না। যদিও সেটা করতে চাচ্ছেন অনেকে।

'বংগ' নামের উদ্ভব নিয়ে নৃতাত্ত্বিকরা গবেষণা করেছেন। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিকের মত হল, 'অংগ', 'বংগ', এবং 'কলিংগ' নামসমুহ আর্য ভাষার নয়। এসব নাম এসেছে চীনা পরিবারভুক্ত কোন ভাষা থেকে। সাধারণত 'য়ং' ধ্বনি চীনা পরিবারভুক্ত ভাষায় নদীর নামের সাথে যুক্ত থাকতে দেখা যায়। যেমন, ইয়ং সিকিয়ং, হুয়ংগো। এদের মতে গংগা নামটিও এসেছে কোন চীনা পরিবারভুক্ত ভাষা থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, নদীকে সাধারণ বাংলাভাষায় এখনও বলে 'গাং:"। বংগ বলতে সম্ভবত বুঝাতো একটি নদীকে, আর তার তীরবর্তী মানুষকে। বিষয়টি নিয়ে বেশকিছুটা আলোচনা করেছেন Irawati Karve নামে একজন ভারতীয় নৃতাত্ত্বিক তার লিখিত India as a Cultural Region নামক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ছাপা হয় ১৯৬২ সালে T N Madan এবং Gopal Sarana সম্পাদিত Indian Anthropology নামক বইতে। যা প্রকাশিত হয় Asia Publishing House, London থেকে। প্রবন্ধটি যথেষ্ট সুলিখিত।

এক সময় বংগ বলতে কেবল পূর্ববংগকেই বুঝাতো। খুব বেশি দিনের কথা নয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় লিখেছেন

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নহি সয়।

অর্থাৎ, মাইকেল মধুসূদনের সময়ও *বংগ* বলতে প্রধানত বুঝিয়েছে পূর্ববংগকেই। আর *রাঢ়* বলতে বুঝিয়েছে পশ্চিমবংগকে। বৃটিশ শাসনামলে পশ্চিমবংগ বলতে বোঝাত, ভাগিরথীর পশ্চিমে তখনকার বাংলা প্রদেশের যে অংশ ছিল, তাকে। মধ্যবংগ বলতে বোঝাত ভাগিরথী ও মধুমতি নদীর মধ্যে যে অংশ, তাকে। যমুনা ও মধুমতির পূর্বে তখনকার বাংলার যে অংশ অবস্থিত তাকে বলা হত পূর্ববংগ। এবং পদ্মানদীর উত্তরে ও যমুনা নদীর পশ্চিমে তখনকার বাংলা প্রদেশের যে অংশ ছিল, তাকে বলা হত উত্তরবংগ। এভাবে নদীগুলির সাহায্যে ভাগ করে বৃটিশ আমলে বাংলা প্রদেশের ভূগোলকে আলোচনা করা হত।

চর্যাপদ বলতে বোঝায় কিছু সংখ্যক বজ্রযান (মহাযান বৌদ্ধদের একটি শাখা) বৌদ্ধধর্মের গুরুদের লেখা কিছুসংখ্যক গানকে। এ পর্যন্ত ৪৭ টি চর্যাপদ বা গান

www.pathagar.com

পাওয়া গিয়েছে। এগুলিকে দাবি করা হয় প্রাচীন বাংলাভাষার নিদর্শন হিসাবে। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এদের রচনাকাল খৃস্টীয় নবম শতাব্দি। অন্যদিকে ভাষাতাত্ত্বিক মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন, এদের রচনাকাল খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দি। আমরা এই বিতর্কের মধ্যে যাব না। একটি চর্যাপদে বলা হয়েছে-

বাজণাব পাড়ী পঁউলা খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥

ভুসু হলেন একজন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য বা গুরু। এখানে বলা হচ্ছে ভুসু বাংগালী হিসাবে পরিচিত হতে পারলেন একজন চণ্ডালীকে বিবাহ করে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একটি জনসমষ্টি কম করে হাজার বছর আগেও ছিল; হঠাৎ করেই তার উদ্ভব হয়নি। সম্প্রতি আমরা পত্রপত্রিকায় পড়ছি, শেখ মুজিবুর রহমান হলেন বাংগালি জাতির জনক। কিন্তু বাংগালী বলে একটি জনসমষ্টি বহুকাল আগে থেকেই ছিল। শেখ মুজিব জন্মেছিলেন বাংগালি জনসমষ্টির মধ্যে বেশ কয়েক শতাব্দী পরে। আর হন তাদের রাজনৈতিক নেতা। এভাবে বললেই ইতিহাস অবিকৃত থাকে এবং সহজেই হতে পারে বোধগম্য। শেখ মুজিব তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে দুটো দিক আছে। একটা হল আমরা মুসলমান, আর একটা হল আমরা বাঙালি (অসমাপ্ত আত্মজীবনী। শেখ মুজিবুর রহমান, পৃষ্ঠা ৪৭। দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ২০১২)। অর্থাৎ শেখ মুজিব বাঙালি বলতে বুঝিয়েছেন প্রধানত বাংলাভাষী মুসলমানকে। তাঁর বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ধারণা হল তাই খুব কাছাকাছি। শেখ মুজিবের মধ্যে যেমন বাঙালিত্ববোধ ছিল, তেমনি আবার সংগুপ্ত ছিল একটি মুসলিম চেতনা। যেটাকে এখন অনেকে অস্বীকার করতে চাচ্ছে। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে যখন চলেছে পাল রাজাদের রাজত্ব, তখন ইসলাম এসে পৌছে গিয়েছে সিন্ধু প্রদেশে।

ভাষা আমাদের জাতিসত্তার একটি মূল্যবান উপাদান। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন এদেশে হতে পেরেছিল খুবই ব্যাপকভাবে। সাবেক পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে উর্দুর পাশে বাংলা পেতে পেরেছিল স্থান। এটা ছিল একটি বিরাট রাজনৈতিক ঘটনা। কিন্তু শেখ মুজিব এই আন্দোলনে কোন ভূমিকা রাখেননি। প্রথমত তিনি এ সময় ছিলেন জেলে। জেলে থেকে কোন আন্দোলন করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকবার হয়তো আর একটি কারণও ছিল। শেখ মুজিবের অসমাপ্ত আত্মজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এবং মান্য করতেন রাজনৈতিক নেতা

www.pathagar.com

হিসাবে। ১৯৫১ সালে ২৪ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দী সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'পাকিস্তান জিন্নাহ আওয়ামী লীগ'। ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সোহরাওয়ার্দী সাহেব সিন্ধু প্রদেশের হায়দ্রাবাদ শহর থেকে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। যাতে তিনি বলেন, যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তদানুসারে উর্দুই হতে হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সোহরাওয়ার্দী সাহেব প্রথমে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করবার পক্ষে ছিলেন না। অনেক পরে তিনি তার মত পরিবর্তন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কেবল সোহরাওয়ার্দী সাহেব নন, তদানীন্তন পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহিরও বলেন যে, উর্দুকে করতে হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কেননা, শ্রমিক মজুররা উর্দুভাষা বোঝে, বাংলাভাষা বোঝে না। শ্রমিক মজুর দিয়েই করতে হবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সাধারণভাবে যাদের বলা হয় বাংগালি, তাদের মাতৃভাষা বাংলা এবং তাদের চেহারার মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্যের মিল। যেমন এদের গায়ের রং কালো। কিন্তু ঘোর কালো নয়। এরা উচ্চতায় মাঝারি আকৃতির (১.৫৮ মিটার থেকে ১.৬৮ মিটারের মধ্যে)। এদের মাথার চুল মসৃণ, শক্ত খড়খড়ে নয়। এদের চোখ আয়ত। এবং চোখের তারার রং কালো। এদের মুখে দাড়ি গোঁফের প্রাচুর্য থাকতে দেখা যায়। এদের মাথার আকৃতি মাঝারি। মাথার আকৃতি মাঝারি বলতে বোঝায়, মাথার প্রস্থকে দৈর্ঘ্য দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুন করলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭০ থেকে আশির মধ্যে। এদের নাসিকাও হল মধ্যমাকৃতির। মধ্যমাকৃতির নাসিকা বলতে নাকের অগ্রভাগের প্রস্থকে কপাল থেকে নাকের অগ্রভাগের দৈর্ঘ্যকে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুন করলে তার অনুপাত দাঁড়ায় ৭১ থেকে ৮৫ এর মধ্যে। এসব কারণে সাধারণভাবে বাংগালি জনসমষ্টিকে এই উপমহাদেশের অন্য জনসমষ্টি থেকে পৃথক করা চলে। চিনে নেয়া যায়। বাংলাভাষী মানুষের জীবনরীতিতে আছে ঐক্য। ধানচাষ এদের জীবিকার প্রধান উপায়। ভাত ও মাছ এদের খাদ্য তালিকার প্রধান অংশ। বাংগালি হিন্দু ব্রাহ্মণরা মাছ খান বলে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যত্র তারা মেছোয়া ব্রাহ্মণ বলে নিন্দিত। কিন্তু বাংলাভাষী হিন্দুরা নন, বাংলাভাষী মুসলমানরাই সৃষ্টি করেছেন আজকের পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে। আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তি হিসাবে তাই তাদের কথাই পেতে বাধ্য বিশেষ বিবেচনা।

অনেক শব্দের এখন ভুল প্রয়োগ হচ্ছে। যেমন 'আদিবাসী' শব্দটি। নৃতত্ত্বে আদিবাসী বলতে বোঝায়, কোন দেশের আদিম নিবাসীকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বলতে বোঝায়, সে দেশের কালো মানুষকে। এরা পড়েছিল আদিম প্রস্তর যুগের সাংস্কৃতিক পর্যায়ে। অস্ট্রেলিয়ার সভ্যতা গড়ে তুলেছেন বৃটেন থেকে সাদা মানুষ যেয়ে, মাত্র কয়েকশ বছর আগে। বিখ্যাত বৃটিশ নাবিক ক্যাপটেন কুক অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে পদার্পন করেন ১৭৭০ খৃস্টাব্দে। বাংলাদেশে আমরাই হলাম প্রকৃত প্রস্তাবে

www.pathagar.com

আদিবাসী। কেননা, আমাদের পূর্বপুরুষ এখানে বন কেটে অথবা পুড়িয়ে পরিষ্কার করে প্রথম আরম্ভ করেন চাষাবাদ। গড়ে তোলেন সমৃদ্ধ জনপদ। যদি আমরা বিন বখতিয়ারকে ধরি আমাদের সভ্যতার সূচনাকারী, তবে সেটাও কম দিনের ঘটনা নয়। প্রায় ৮০০ বছর আগে ঘটনা। বাংলাদেশে এখন যাদের আদিবাসী বলা হচ্ছে, তাদের কেউ-ই আসেননি এতদিন আগে। আর গড়ে তোলেননি কোন সভ্য জনপদ, যেমন গড়ে তুলেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ। একদিন সব মানুষই বনে বাস করতো। বনে ফলমূল আহরণ করে পশুপাখি শিকার করে আহার্য জোগাড় করতো। মানুষের এই অবস্থাকে বলা হয় আহার্য আহরক অবস্থা। এর পরের অবস্থাকে বলা হয়, আহার্য উৎপাদক অবস্থা; যখন থেকে মানুষ আরম্ভ করেছে চাষাবাদ ও পশুপালন। সভ্যতার আরম্ভ ধরা হয় লিপির আবিষ্কার দিয়ে। বাংলাভাষা লেখা হচ্ছে কম করে ১৪০০ খৃস্টাব্দ থেকে। সাঁওতালদের ভাষা কোন লিখিত ভাষা ছিল না। উনবিংশ শতাব্দিতে নরওয়ে থেকে আগত খৃস্টান মিশনারী পি ও বোডিং (P. O. Bodding) প্রথম রোমান বর্ণমালায় সাঁওতালী ভাষা লিখবার ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রথম সংকলন করেন সাঁওতালী ভাষার অভিধান। কিন্তু বিদেশ থেকে খৃস্টান মিশনারী আসবার অনেক আগে থেকেই বাংলা পরিণত হয়েছিল একটি লিখিত ভাষায়। গড়ে উঠেছিল তার কাব্য সাহিত্য। এদেশ থেকে মানুষ দূর-দেশে বড় বড় নৌকায় করে বাণিজ্য করতে যেত। কেবল এদেশের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ। সাঁওতালরা বনে থাকতেন। পরে তারা শেখেন কৃষি কাজ। নীলকর সাহেবরা ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকে সাবেক মালদাহ জেলায় অনেক সাঁওতালকে নিয়ে আসেন নীল চাষ করবার জন্যে। সেখান থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সাঁওতালরা তখনকার মালদহ জেলা থেকে আসতে থাকেন রাজশাহী জেলায়। রাজশাহী জেলার তিনটি উপজেলায় (গোদাগাড়ী, তানোর ও পবা) এখন যথেষ্ট সাঁওতালের বাস। বর্তমান রাজশাহী জেলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ২ ভাগ নাকি হল সাঁওতাল। অবশ্য এই পরিসংখ্যানটা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু যদি বলা হয়, সাঁওতালরা হলেন এই অঞ্চলের আদিবাসী, তবে অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে ভুল করা হবে। আমাদের জাতিসত্তা গঠনে সাঁওতালরা কোন ভূমিকা পালন করেননি। তারা এখনও স্থানীয় জনসমষ্টি থেকে থাকেন পৃথক গ্রাম গড়ে।

নৃতত্ত্বে জাতি (Ethnie) বলতে বোঝায় একভাষায় কথা বলা জনসমষ্টি। ইংরেজ আমলে উপজাতি বলতে বুঝিয়েছে এমন জনসমষ্টিকে, যারা সংখ্যায় হল খুব কম। এবং বাস করে বনে বাদারে ও দুর্গম অঞ্চলে। উপজাতি আর জাতি সমার্থক নয়। জাতিদের আছে নিজস্ব সভ্যতা ও লিখিত ভাষা। তারা গড়ে তুলেছে জটিল অর্থনৈতিক জীবন। কিন্তু উপজাতিরা সেটা করেনি। অনেক উপজাতি এসে বাস করছে সভ্য জনপদের মধ্যে। কিন্তু তারা বজায় রেখেছে তাদেরই প্রাচীন জীবনধারা; অনেককিছুই। বাংলাদেশে এখন আর দুর্গম বনভূমি নেই। আগে যাদের বলা হত

www.pathagar.com

উপজাতি, তাদের আর ঠিক বলা যায় না উপজাতি। তাদের অনেকেই লেখাপড়া শিখছে বাংলা ও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। কিন্তু তবু উপজাতি ও আদিবাসী নিয়ে একদল বামপন্থী করতে চাচ্ছেন বিশেষ রাজনীতি। আর জাগিয়ে তুলতে চাচ্ছেন আমাদের জাতিসত্তা নিয়ে নানা বিভ্রান্তি। তাই আদিবাসী, জাতি ও উপজাতি সম্পর্কে আমাদের থাকতে হবে পরিষ্কার ধারণা। শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রাঙামাটি যান এবং তার বক্তৃতায় বলেন, দেশের সকল লোক বাংগালি বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার (সন্তু লারমা) সঙ্গে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর এমন এক চুক্তি করে, যার ফলে বাংলাদেশের দশভাগের একভাগ ভূমি বাংলাদেশে থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বন্দরবন) প্রায় ১৩ টি উপজাতির বাস। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: চাকমা, মারমা, ত্রিপুরী, তংচঞ্গা, কুকি, মিজো, রিয়াং, বনযোগী ও পাংখো। এখন চাকমাদের ভাষা হয়ে উঠেছে বাংলা। চাকমারা যে ভাষায় কথা বলেন, বৃটিশ ভাষাতাত্ত্বিক গ্রিয়ার্সন তার বিখ্যাত লিংগুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়াতে উল্লেখ করেছেন, চাকমা বাংলা বলে। যা চট্টগ্রামের বাংলা উপভাষার মত। কিন্তু অন্যান্য উপজাতির আছে নিজনিজ কথিত ভাষা। তারা একে অপরের ভাষা বোঝেন না। এক উপজাতির লোক আর এক উপজাতির লোকের সাথে কথা বলতে হলে, কথা বলেন বাংলাভাষায়। মারমারা আরাকানী ভাষায় কথা বলেন। মারমাদের সাথে চাকমাদের সদভাব নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমস্যা হয়ে উঠেছে খুবই জটিল। কয়েকদিন আগে পত্রিকার খবরে পড়লাম, বাংলাদেশের সেনা বাহিনীকে সেখানে চালাতে হয়েছে গুলিগোলা। কেবল পুলিশ দিয়ে শান্তি রক্ষা সম্ভব হয়নি। সন্তু লারমা ২০০১ সালে গঠন করেন *বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম*। বাংলাদেশের তথাকথিত আদিবাসীরা চাচ্ছেন সংবিধানে বিশেষ স্বীকৃতি। কিন্তু সব আদিবাসী এক জায়গায় থাকেন না। জনসংখ্যার দিক থেকে তারা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১ ভাগের কাছাকাছি। তাদের কথা তুলে আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপকে অস্পষ্ট করে তুলবার বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। যেটা হতে দেয়া যায় না। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, সাবেক পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদের মাধ্যমে। সেই থেকে তা বাংলাদেশের অংশ হতে পেরেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এদেশের (বাংলাদেশের) জনসমষ্টি গায়ের জোরে দখল করেনি। এদেশের বামপন্থীরা উপজাতিদের নিয়ে রাজনীতি অনেক দিন আগে থেকেই করছেন। ১৯৫০ সালে নাচোলে তারা ঘটান সাঁওতাল বিদ্রোহ। কিন্তু এই বিদ্রোহের মাধ্যমে সাঁওতালেরা পেতে পারেননি কিছুই। কেবল দিয়েছেন প্রাণ।

***

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ৩

শান্তি চুক্তি দেশের সংঘাত ডেকে আনছে

এই লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিল দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৯ তারিখ। তখন পার্বত্য শান্তিচুক্তি নিয়ে বাংলাদেশে উঠেছিল বিতর্কের ঝড়। সেই প্রেক্ষিতেই বক্তৃতাটি দেয়া হয়েছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত বিষয়ের উপর এক সেমিনারে। পার্বত্য শান্তিচুক্তি নামটাই গোলমেলে। কেননা, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাংলাদেশের অংশ। চুক্তি হতে পারে দুটি দেশের মধ্যে। একটি দেশের দুটি অংশের মধ্যে নয়। চুক্তির ভাষা এমন ছিল যে, মনে হতে পারছিল, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল একটি পৃথক দেশ। এই বিতর্কের বিষয়ে লেখাটি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্ববহ বলে এখানে সংযুক্ত করা হল।

সকলেই জানেন যে, ১৯৪৭ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস করা বিধিবদ্ধ আইনের বলে দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পড়ে পাকিস্তানের ভাগে কিন্তু এর জন্যে পাঞ্জাবের কিছু মুসলিম প্রধান অংশকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল ভারতকে। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানে বিনামুল্যে আসেনি। জিন্নাহ সাহেব মনে করেছেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর হয়ে পড়বে অচল। কারণ, চট্টগ্রাম বন্দর হল কর্ণফুলি নদীর মোহনায়। আর কর্ণফুলি নদী প্রবাহিত হয়ে আসছে পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে দিয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের ভাগে পড়া মানে চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে যাওয়া। আজকের বাংলাদেশ হয়েছে সাবেক পাকিস্তান ভেঙে। যা ছিল পূর্ব পাকিস্তান, আজ তা স্বাধীন বাংলাদেশ। বংলাদেশের সীমানা পাকিস্তান সৃষ্টির মাধ্যমে রচিত হয়েছিল। আজকে যাকে বলা হয় বৃহত্তর কুমিল্লা, ইংরেজ আমলে তাকে বলা হত ত্রিপুরা। ত্রিপুরার সঙ্গে লাগোয়া ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা। পার্বত্য ত্রিপুরা ছিল একটা করদরাজ্য। তা যোগ দিয়েছে ভারতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এরকম কোন করদরাজ্য ছিল না। তাহলে তা ভারতেরই অংশ হত, পাকিস্তানের অংশ হত না। যেমন আসেনি পার্বত্য ত্রিপুরা এবং কুচবিহার। ভারত জুনাগড়, মানভাদার জোর করে দখল করেছে। জোর করে দখল করেছে হায়দ্রাবাদ। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম এরকম জোর করে দখল করা ভূখণ্ড নয়। তা পাকিস্তানে এসেছিল আইনসম্মত পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, কোন প্রকার বল প্রয়োগের মধ্যদিয়ে নয়।

বাংলাদেশ একটি দেশ, দুটি দেশ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই দেশের সকল নাগরিকের সেখানে থাকা উচিত সমান অধিকার। কিন্তু বর্তমান চুক্তিকে কার্যকর করলে এই অধিকার আর থাকবে না। ফলে সংবিধান এদিক থেকে হারাবে তার মূল্য। আমাদের সংবিধান হলো এককেন্দ্রীক

www.pathagar.com

সংবিধান। এখানকার একটি অঞ্চলকে তাই পৃথক মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না। এখানে সর্বত্র থাকতে হবে একই আইন। কিন্তু বর্তমান এই চুক্তিকে কার্যকর করলে আমাদের সংবিধানের মূল চরিত্রই আর টিকে থাকবে না। পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য এই চুক্তি অনুসারে সৃষ্টি হবে একটা পৃথক বিচার ব্যবস্থা। যার উপর থাকবে না বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ভূমি-আইন পার্বত্য চট্টগ্রামে অচল হয়ে পড়বে। সারা দেশ থাকতে পারবে না একই ভূমি-আইনের আওতায়। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার বলছে, তারা সংবিধান বজায় রেখেই করেছে চুক্তি। কিন্তু চুক্তির ধারাগুলো বিশ্লেষণ করছে ধরা পড়ছে যে, এই চুক্তিটির একাধিক অংশ বর্তমান সংবিধানের পরিপন্থী। সংবিধানের পরিবর্তন সাধন না করে এরকম চুক্তি কোনভাবেই করা যুক্তিযুক্ত নয়। এটা বুঝবার জন্য সংবিধান বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন হয় না। মনে হয়, সাধারণ জ্ঞানেই এটা উপলব্ধি করতে পারা যায়। তবু বর্তমান সরকার বলছে সংবিধান লংঘন করা হয়নি। এই সরকার ভারতের সাথে চুক্তি করেছিল। ভারতের সাথে চুক্তি হল একটা বিরাট সাফল্য। কিন্তু কীরকম সাফল্য অর্জিত হতে পারছে তা কি আজ আর বলবার অপেক্ষা রাখে? বর্তমান সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে যা বলছে, বাস্তবের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তাই এই চুক্তির বাস্তব ফল নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তোলা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন হল ৫০৯০ বর্গমাইল। এ অঞ্চল ছিল এক সময় খুবই জনবিরল। যখন কুমিল্লা এবং নোয়াখালিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতিবর্গমাইলে ১০০০ জন, তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে জনবসতির ঘনত্ব ছিল প্রতিবর্গমাইলে মাত্র ৫৬ জন। পাকিস্তান হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে দ্রুত পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করে। কাজ ও জমির খোঁজে দেশের অন্য অঞ্চল থেকে মানুষ যেতে আরম্ভ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে। বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতিদের চাইতে অউপজাতীয় জনসংখ্যা কম হতে পারে না। বরং অনেকের মতে, এখন সেখানে অউপজাতীয় মানুষের সংখ্যাই হওয়া সম্ভব বেশি। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে মানুষ গিয়ে বসতি গড়েছে। এখন যদি তাদের এই স্থান ত্যাগ করতে বলা হয়, তবে তারা তা করতে যাবে কেন? দেশ সবার। দেশের মাটি কোন অঞ্চলের মানুষ দাবি করলেই তা যে মেনে নিতে বাধ্য, তাও নয়। বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা না করে আওয়ামী লীগ করছে এই চুক্তি। সে ভুলে যাচ্ছে এরকম চুক্তির ফলে তার পায়ের নিচ থেকে দ্রুত সরে যাচ্ছে মাটি। তাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে হলে পক্ষে রাখতে হবে জনসমর্থন। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি এমনই একটা চুক্তি, যার বাস্তবায়ন তাকে দ্রুত জনসমর্থনহীন করে তুলবে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে কম করে ১৩ টি উপজাতির বাস। এদের প্রত্যেকের আছে নিজ নিজ ভাষা। আছে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। চাকমারা এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও অন্যান্য উপজাতির মোট সংখ্যা তাদের চাইতে বেশি। চাকমারা সকলে মঙ্গলীয় বৃহৎ

www.pathagar.com

মানবধারাভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে আছে দৈহিক ও ঐতিহ্যগত পার্থক্য। তাদের মধ্যে আছে দৈহিক আকার আকৃতিগত পার্থক্য। আছে একের থেকে অপরের পৃথকভাবে টিকে থাকার ইচ্ছা। তারা সকলেই চাকমাদের নেতৃত্বে পরিচারিত হতে রাজি নয়। কিন্তু বর্তমান চুক্তিটি হয়েছে কেবলমাত্র শান্তিবাহিনীর নেতা সন্তু লারমার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে; আর কোন উপজাতির কোন নেতার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে নয়। চাকমাদের পরেই পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের মধ্যে মগ বা মারমারা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু কোন মগ প্রতিনিধির সঙ্গে কিছুমাত্র আলোচনা করা হয়নি। বর্তমান সরকারের এরকম বৈষম্যমূলক আচরণে তারা মোটেও সন্তুষ্ট নয়। ১৯৪৭-এর আগষ্ট মাসে চাকমারা রাঙামাটিতে উড়িয়েছিল ভারতের পতাকা। পাকিস্তানের বালুচ রেজিমেন্ট রাঙামাটি দখল করে ভারতের পতাকা নামিয়ে ফেলে। অর্থাৎ চাকমারা চান ভারতে যোগ দিতে। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমাদের পরেই মারমাদের স্থান। মারমারা সন্তু লারমাকে নেতা বলে মোটেও স্বীকার করে না। মারমারা শান্তি বাহিনীতে ছিল না। মনে হচ্ছে এই চুক্তি ভবিষ্যতে চাকমা-মারমা সংঘাতেরই পথ উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। চাকমারা হলেন হিন্দু ভাবাপন্ন। কিন্তু মারমারা হলেন বিশেষভাবেই থেরাবাদী বৌদ্ধ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক উপজাতির বাস। এদের অনেকের পূর্ব-পুরুষ চট্টগ্রাম অঞ্চলে পালিয়ে আসে বর্মীরা যখন অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ভাগে আরাকান জয় করে, তখন। এ সময় একটা হিসাব অনুসারে আরাকানের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিনভাগের দুইভাগ উদ্বাস্তু হয়ে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় চট্টগ্রাম অঞ্চলে। চাকমারা রাঙামাটির ভূমিজসন্তান নয়। তারা চিরকাল ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিল না। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত Encyclopaedia Britannica'র পঞ্চম ভলিউমে চাকমাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তারা এক সময় বাস করতো চট্টগ্রামের (বৃহত্তর চট্টগ্রামের) দক্ষিণ অঞ্চলে। সেখান থেকে তারা যেতে থাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙামাটি অঞ্চলে। এই তথ্য সত্য হলে বলতে হবে, চাকমারা পার্বত্য চট্টগ্রামের মোটেও আদি বাসিন্দা নন। চট্টগ্রাম থেকে তারা গিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রামে। খোঁজ নিলে দেখা যায়, চাকমারা যে কেবল রাঙামাটি অঞ্চলে গিয়ে বসতি করেছেন, তা নয়। তারা দলে দলে গিয়ে বসতি করেছেন পার্বত্য ত্রিপুরায়। ১৯২১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্টে বলা হয়েছে, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের মিলিত জনসংখ্যা হলো ৭৭৫৯০। তাদের জনসংখ্যা একত্র করে দেখানো হয়েছে। যা তখন ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, এখন তা হলো ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য। বিরাট সংখ্যাক চাকমা সেখানে আগে থেকেই ছিল। চাকমা উদ্বাস্তুরা এখন ত্রিপুরা থেকে দেশে ফিরছেন। এদের সঙ্গে ত্রিপুরা থেকে আগে বসতি করা চাকমারাও পার্বত্য চট্টগ্রামে আসতে উৎসাহিত হতে পারে। কারণ ত্রিপুরায় এখন চাকমাদের কেউ পছন্দ করে না। উপজাতি সমস্যা সেখানে খুবই প্রবল। উপজাতি ও বাংলাভাষীদের মধ্যে মারামারি লেগেই আছে। সংঘাত

www.pathagar.com

লেগে আছে ত্রিপুরা ও চাকমাদের সঙ্গে। এই চুক্তির ফলে চাকমার কর্তৃত্ব পেতে যাচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের। যে কর্তৃত্বের সুযোগ তাদের জন্য আর কোথাও হতে পারে না। ভারতের অরুণাচলে যেসব চাকমা গিয়েছিলেন, তাদের ঐ অঞ্চল থেকে এখন বহিষ্কারন করা হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে এভাবে চাকমা আগমন আরম্ভ হলে অন্যান্য উপজাতিরা নিশ্চই শঙ্কিত হবেন।

বাংলার সুলতান ফকরউদ্দিন আজম শাহ (১৩৩৮-১৩৪৪) চট্টগ্রাম দখল করেন। এর পরের শতকে চট্টগ্রাম দখল করেন আরাকানের এক রাজা। পরে রকুন-উদ-দীন বারবাক শাহ (১৪৫৯-১৪৭৪) আবার চট্টগ্রাম দখল করেন। আলাউদ্দীন হুসেন শাহ'র সময় আবার কিছুদিনের জন্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হয় আরাকান রাজের কাছে। পরে আকবরের সময় চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুঘল শাসক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল আমলে তখনকার সুবেবাংলা ছিল ২০ টি সরকার বা শাসক বিভাগে বিভক্ত। চট্টগ্রাম ছিল এর মধ্যে একটি। মুঘলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে কিছু ছিল না। প্রত্যেক সরকারের মত চট্টগ্রাম সরকারও ছিল চাকলায় বিভক্ত। পঞ্চদশ শতাব্দির মধ্যভাগে আরাকার রাজা চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। পরে নবাব শায়েস্তা খাঁ আরাকানের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ১৫৬৫ খৃস্টাব্দে আবার চট্টগ্রামকে মুঘল শাসনে আনেন। তিনি চট্টগ্রামের নতুন নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। চট্টগ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য একজন পৃথক ফৌজদার নিযুক্ত করা হয়। কথিত আছে যে, আরাকান রাজা এক সময় অনেক মুঘল সৈন্যকে বন্দি করে আরাকানে নিয়ে যান। তিনি সেখানে এসব সৈন্যদের আরাকানী রমণীদের বিবাহের অধিকার প্রদান করেন। এই মিশ্র বিবাহ থেকেই না-কি চাকমাদের উদ্ভব হয়। আরাকানী ভাষায় 'চাওক' মানে মিশ্র। চাওক শব্দ থেকেই না-কি শেষ পর্যন্ত উদ্ভব হয়েছে 'চাকমা' নামের। বৃটিশ I.C.S, J P Mills প্রথম এ কথা লিখিতভাবে বলেন ১৯২৬ সালে। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি সম্বন্ধে তার নোটটিকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে Census of India, 1931, Vol- V, Past I, Apendix- II তে। ঐ একই খণ্ডে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য দেয়া হয়েছে। সুলতানী এবং বাদশাহী শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বলে কোন অঞ্চল ছিল না। একটা বিস্তীর্ণ এলাকাকে বলা হত চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনে আসে ১৭৬০ সালে। পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটা পৃথক জেলা করা হয় ১৮৬০ সালে। কিন্তু ১৮৯১ সালে এই অঞ্চলকে একটা মহকুমাতে পরিণত করা হয় এবং পরে ১৯০০ সালে আবার উন্নিত করা হয় একটি জেলায়।

ইংরেজ আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তিনটি মহকুমায় বিভক্ত ছিল: রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবন। যা এখন পরিণত হয়েছে পৃথক তিনটি জেলায়। ইংরেজ আমলে এই একই অঞ্চল আবার তিনটি সার্কেলে বিভক্ত ছিল। এই তিন সার্কেলে ছিলেন তিনজন রাজা। এরা খাজনা ওঠাত এবং শান্তি বজায় রাখতে সাহায্য করতেন। এদের অধিকার ছিল ছোট-খাটো মামলা বিচারের। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল ৩৩৭ টি

www.pathagar.com

মৌজাতে বিভক্ত। এর প্রত্যেকটি মৌজার জন্য ছিল একজন 'হেডম্যান'। প্রত্যেকটি মৌজায় ছিল ১০ বা তার কছাকাছি সংখ্যক গ্রাম। প্রত্যেক গ্রামে থাকতো একজন করে 'কারবারী'। যাদের বলা হত কারবারী, তাদের কাজ ছিল 'জুম কর' (Jhum Tax) আদায় করে হেডম্যানকে দেয়া। হেডম্যান করের অংশ দিত রাজাকে। আর রাজা তা দিত সরকারকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের খাজনা প্রথা ছিল সে সময়ের বাংলার জন্য সব অঞ্চল থেকে ভিন্ন। মানুষ ঐ অঞ্চলে ছিল অধিকাংশই আধা যাযাবর। তারা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে জুমচাষ করে বেড়াত। বনে বেঁত, বাঁশ, কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রি করতো। এই অঞ্চলের জীবনযাত্রা ছিল অনেকটাই ভিন্ন। কেবল মানুষ নদীর ধারে সমভূমিতে চাষ করতো লাঙল দিয়ে। যারা লাঙল দিয়ে চাষ করতো, তারা বেশিরভাগ ছিল অউপজাতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজারা ছিলেন বড় জমিদারের অনুরূপ। তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা থাকলেও তা ছিল খুবই সীমিত। স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার কোন অধিকার তাদের ছিল না। আমাদের একশ্রেণির পত্রপত্রিকায় এখন ভুল তথ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট অনুসানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১ ভাগ হলো উপজাতি। উপজাতিরা বাংলাদেশের জন্য কোন বড় রকমের সমস্যা ছিল না। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি পরিষদকে যেভাবে ক্ষমতা দেয়া হচ্ছে, তাতে অন্য অঞ্চলের উপজাতিরাও দাবি করে বসতে পারে অনুরূপ ক্ষমতা। পার্বত্য চট্টগ্রামের পর সবচেয়ে অধিক সংখ্যাক উপজাতির বাস হলো বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলে। এখানে উপজাতীয় লোকসমষ্টির সংখ্যা ১৯৯১ সালের হিসাব অনুসারে হলো, ১৫৩৩৫১ জন। এরাও এখন দাবী তুলতে পারে পৃথকভাবে শাসিত অঞ্চলের। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে , বাংলাদেশের সংলগ্ন ভারতেও অনেক সাঁওতালের বাস। অনেক সাঁওতালের বাস বাংলাদেশের বৃহত্তর দিনাজপুরেও। এইসব সাঁওতালরা মিলে একটা বড় রকমের আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারে। সাঁওতাল ও অন্যান্য প্রটেস্টানেয়ও উপজাতিরা ভারতে অনেক আগে থেকেই আরম্ভ করেছে 'ঝাড়খণ্ড' আন্দোলন। বাংলাদেশের উপজাতিরা সংখ্যায় বেশি না হলেও বাস করে সীমান্ত অঞ্চলে এবং দলবদ্ধভাবে। ভারত ইচ্ছা করলেই তাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে।

শেখ মুজিব বাংলাদেশ হবার পর বলেছিলেন, উপজাতিদের বাঙালি হয়ে যেতে। কিন্তু তাঁর তনয়া উপজাতিদের স্বাতন্ত্রের স্বীকৃতি দিয়ে যেন একটা বড় রকমের জাতিসত্তার সংকট সৃষ্টি করতেই যাচ্ছেন। বর্তমান আওয়ামী লীগের নীতি শেখ মুজিবের জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হচ্ছে না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আওয়ামী লীগ সরকার এত তড়িঘড়ি করে তার নীতির পরিবর্তন করতে যাচ্ছে কেন? যে দল এক সময় ঘোষণা করেছে, 'এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'। সেই দল আজ নিজেই মুজিব বিরোধী হয়ে উঠছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এত কী অশান্তি ঘটছিল, যে কারণে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলনীতি পরিত্যাগ করা হলো। মনে

www.pathagar.com

হয়, বর্তমান চুক্তিটি বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া একটি চুক্তি। শেখ হাসিনা যা [illegible] না করে পারেনি। [illegible]
সন্তু লারমাকে ভারত আশ্রয় দিয়েছিল। ভারত তাকে অ[illegible]র যুগিয়েছিল রসদ। সেই সন্তু লারমা আজ ভারতের জোরে [illegible] পার্বত্য চট্টগ্রামে।

এটি একটি বক্তৃতার সারসংক্ষেপ। বক্তৃতাটি দেয়া হয়েছিল [illegible]১২-১৯৯৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সভায় অনেক ছাত্র এবং অধ্যাপক উপস্থিত ছিলেন। যা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে জানতে অনেকেই ইচ্ছুক। ঐ সভায় একজন ছাত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন, আমরা শান্তিচুক্তির বিরোধিতা করছি কেন? পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী না রাখলে দেশের অনেক খরচা কমবে। সে টাকা উন্নয়ন কর্মে ব্যয় করা যাবে। তাতে হবে গোটা জাতিরই মঙ্গল। ঐ সভায় কোন বিতর্ক আমরা চাইনি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্বন্ধে শ্রোতাদের কিছু মৌলিক তথ্য সরবরাহ করা, পরিস্থিতি বিশ্লেষণে সাহায্য করা। আমরা মনে করি, সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় অপব্যয় নয়। দেশের স্বাধীনতা, সার্বোভৌমত্ব এবং ভৌগলিক অখণ্ডতার জন্য সেনাবাহিনীর প্রয়োজন আছে।
গোটা দেশে যদি সেনাবাহিনী থাকতে পারে, তবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা অপসারণের প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন? শান্তির গালভরা যুক্তি দেখিয়ে আমরা আমাদের দেশের মাটি অন্যকে ছেড়ে দিতে পারি না। পার্বত্য চট্টগ্রাম হাতছাড়া হলে যে বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশ হারাবে, সে তুলনায় ঐ অঞ্চলে সেনাবাহিনী রাখা মোটেও বাহুল্য ব্যয় নয়। তাছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামের ওপর নির্ভর করছে চট্টগ্রাম বন্দরের ভবিষ্যৎ। শান্তির নামে দেশের প্রতিরক্ষার সমস্যাকে অত সরল করে দেখা যায় না।

***

www.pathagar.com

www.pathagar.com

Garo chakma, Santal
Garo living in Mymensingh
Karnaphuli River

Magha living
South of Karnaphuli

Dinajpur and Rajshai in
the north West
are inhabited by
Santal

বাংলাদেশের আদিবাসী এবং
জাতি ও উপজাতি
এবনে গোলাম সামাদ
প্রচ্ছদ : ইয়াহিয়া সেলিম

978-984-8867-49-5